নারীর ফাঁদ-৫
ঈমানদীপ্ত দাস্তান
আলতামাশ

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

নারীর ফাঁদ-৫

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৫
আলতামাস

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

পরশমণি প্রকাশনা-৫
ISBN-984-8925-02-1

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৭৭-১৭৮৮১৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ২০০৫

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার
মালিটোলা, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
কালার সিটি
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৭৮-৫৬৪১৪১

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে– বিশেষত মিশর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। ক্রুসেডাররা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয় তারা।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দু:সাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিলো, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দু:সাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হলো সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ কবুল করুন।

বিনীত

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা। মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সূচীপত্রঃ

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

হালবের বাইরে অনুষ্ঠিত তিন মুসলিম আমীরের বৈঠক সমাপ্ত হয়েছে। তারা সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছেন। খৃস্টান উপদেষ্টাদের পরামর্শ বেশী গ্রহণ করা হয়েছে। বাহিনীত্রয়ের বিন্যাস কিরূপ হবে, তারা তা-ও ঠিক করে নিয়েছে। গোমস্তগীনের বাহিনী অগ্রে থাকবে। তার উভয় পার্শ্বের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব হালবের বাহিনীর। প্রথম হামলার পর দ্বিতীয় হামলার দায়িত্ব– যা সুলতান আইউবীর জবাবী হামলাকে প্রতিহত করার জন্য পরিচালিত হবে– সাইফুদ্দীনের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। সাইফুদ্দীন তার বাহিনীর একটি অংশকে তার ভাই ইজ্জুদ্দীনের কমান্ডে রেখে এসেছেন। এটি সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে তার প্রতারণা। সম্মিলিত বাহিনীকে তিনি বুঝ দিয়েছেন যে, আমি তাদেরকে রিজার্ভ রেখে এসেছি এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদেরকে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু তিনি ভাইকে বলে গেছেন, তুমি হাররানের বাহিনীর অবস্থা বুঝে সম্মুখে অগ্রসর হবে। যুদ্ধের পরিস্থিতি যদি আমাদের প্রতিকূল হয়ে যায়, তাহলে রিজার্ভ বাহিনীকে মসুলের প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করা হবে। আর যদি জবাবী আক্রমণে অংশগ্রহণ করতেই হয়, তাহলে এই অংশগ্রহণ এমনভাবে করতে হবে যে, আমরা মসুল ও নিজেদের স্বার্থের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখবো।

রমযান মাস শুরু হয়ে গেছে। তিন বাহিনীর মাঝে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে, যুদ্ধের সময় রোযা রাখা ফরজ নয়। তিন-চারদিন পর বাহিনীগুলো আপন আপন শহর ত্যাগ করে রওনা হয়ে যায়। কথা আছে, তারা হামাতের নিকট এসে একত্রিত হবে এবং আক্রমণের বিন্যাসে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

এই তিন বাহিনীর রওনা হওয়ার দু'দিন আগের ঘটনা। সুলতান আইউবী তার মোর্চা পর্যবেক্ষণ করছেন। ইত্যবসরে তিনি সংবাদ পান, হাররান থেকে দু'জন সালার পালিয়ে চলে এসেছেন এবং তাদের সঙ্গে একটি লাশ আছে।

সুলতান আইউবী ঘোড়া হাঁকান। গন্তব্যে গিয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে অবরতণ করেন এবং সালারদ্বয়কে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তারপর সিপাহীদ্বয়ের সঙ্গেও আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। এরা দু'জন তার নামকরা গেরিলা গোয়েন্দা ছিলো।

কমান্ডারও তার গুপ্তচর ছিলো, যিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গোমস্তগীনের সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। সুলতান আইউবী লাশটির গালে চুমো খান এবং লাশটি দামেস্ক পৌঁছে দেয়ার এবং শহীদদের কবরস্তানে দাফন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

'আপনি এখানে বসে কী ভাবছেন?' সালার শামসুদ্দীন নিজের কাহিনী শুনানোর আগেই যুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দেন।

'আমি রিজার্ভ বাহিনীর এসে পৌঁছার অপেক্ষা করছি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'গত রাতে সংবাদ পেয়েছি, বাহিনী আজ রাতে পৌঁছে যাবে। তারা কায়রো থেকে আসবে। সে কারণেই এতোদিন লেগে গেছে।'

সুলতান আইউবী তাঁর সেনাসংখ্যা কত এবং তাদেরকে কিভাবে বিন্যস্ত করে রেখেছেন দু'ভাইকে তার বিবরণ দেন।

সুলতান তখনই তাঁর সকল ইউনিটের কমান্ডারদের ডেকে পাঠান এবং শামসুদ্দীন ও শাদবখত-এর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। পুরাতন অফিসারগণ তাদেরকে চেনেন।

সুলতান আইউবী বললেন–

যে শত্রুবাহিনী আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে, তাদের সামরিক অভিজ্ঞতা কিরূপ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা কেমন আমার কমান্ডারদের তার বিবরণ দিন। তারা বললেন–

সৈন্য সর্বাবস্থায় সৈন্যই হয়ে থাকে। দুশমনকে আনাড়ি ও দুর্বল মনে করা একটি সামরিক পদস্খলন হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, ওরা মুসলিম ফৌজ, যার সেনারা শত্রুকে পিঠ দেখাতে অভ্যস্ত নয়। সৈন্যদের মাঝে একটি সামরিক আত্মা বিরাজ করে থাকে। তারা পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করবে। তাদের মস্তিষ্কে এই বুঝ দেয়া হয়েছে, আপনারা হিংস্র, জংলী ও নারীলোলুপ এবং সুলতান আইউবী এসেছেন তার সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য। খৃস্টানরা তাদের অন্তরে আপনার বিরুদ্ধে ঘৃণা ভরে রেখেছে। তবে তাদের নেতৃত্ব প্রশংসাযোগ্য নয়। তাদের একজনও সুলতান আইউবী নয়। সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগীন যার যার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করতে আসছেন। তারা আপন আপন হেরেম ও মদের পিপা-পেয়ালা সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। আমাদের স্থলে গোমস্তগীন স্বয়ং তার বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন। তবে এই নেতৃত্ব বাহিনীকে সুশৃঙ্খলভাবে লড়াতে পারবে না। কিন্তু তারপরও আপনাকে সাবধানতার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তারা

আপনাকে পর্বতমালার অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করে ফেলতে চাচ্ছে। বাহিনীত্রয়ের কমান্ড থাকবে যৌথ; কিন্তু মনের দিক থেকে তারা ঐক্যবদ্ধ নয়।

সুলতান আইউবী সালার শামসুদ্দীন, শাদবখত ও অন্যান্য সালার-কমান্ডারদের সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় খতীব ইবনুল মাখদূম, সায়েকা, কারা কর্মকর্তা ও এক গুপ্তচর এসে উপস্থিত। তারা পথ ভুলে গিয়েছিলেন, তাই বিলম্ব হয়ে গেছে। সুলতান আইউবীর জানা আছে, খতীব তাঁর সমর্থক এবং মসুলে তাঁর গোয়েন্দাদের নেতৃত্ব প্রদান ও তত্ত্বাবধান করতেন। সুলতান তাঁকেও বৈঠকে যুক্ত করে নেন এবং বললেন, আপনি মসুলের ফৌজ সম্পর্কে কিছু বলুন।

'সেই নেতা কিভাবে যুদ্ধ করবে, যিনি মদ-নারীতে আসক্ত এবং কুরআন থেকে ফাল বের করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন?'– খতীব বললেন– 'যার বক্ষে ঈমান নেই, সে যুদ্ধের ময়দানে বেশী সময় টিকতে পারে না। তিনি আমাকে বলেছিলেন, কুরআন থেকে ফাল বের করে বলুন, আইউবীবিরোধী যুদ্ধে আমি জিতবো না হারবো। আমি তাকে বললাম, যেহেতু তার এই পদক্ষেপ কুরআনী বিধানের পরিপন্থী, তাই এই যুদ্ধে তার পরাজয় হবে। তিনি আমাকে কারাগারে বন্দী করলেন। তিনি কুরআনকে জাদুর বই মনে করে থাকেন। আমি আপনাকে কুরআনের কারামতের কথা শোনাতে চাই। কুরআনের বদৌলতেই আমার পালিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। সাইফুদ্দীন আমার কন্যাকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটা অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। আমি আপনাকে সুসংবাদ শোনাতে চাই যে, আপনি যদি কুরআনের অনুসারী হয়ে থাকেন এবং যুদ্ধটা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে করে থাকেন, তাহলে জয় আপনারই হবে। এই হলো যুদ্ধের ধর্মীয় দিক। আর কৌশলগত দিক সম্পর্কে আমি আপনাকে পরামর্শ দেবো, আপনি গেরিলা বাহিনীকে অধিকতর ব্যবহার করুন। এই মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে এ পদ্ধতিটা বেশী প্রয়োগ করুন। রাতেও যেন তারা শান্তিতে থাকতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করুন।'

যে জেল কর্মকর্তা খতীবকে পলায়নে সাহায্য করেছিলেন, তিনিও সঙ্গে আছেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে বাহিনীতে যুক্ত করে নেয়া হয়েছে। খতীবকে তার কন্যাসহ দামেস্কে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখতকে নিজের সঙ্গে রাখেন সুলতান আইউবী।

হালব, হাররান ও মসুলের বাহিনী এগিয়ে আসছে। এদিকে মিশর থেকে সুলতান আইউবীর জন্য যে রিজার্ভ বাহিনী রওনা হয়েছিলো, তারাও নিকটে চলে এসেছে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, সুলতান আইউবী পর্যন্ত দুশমনের ফৌজ আগে পৌঁছে, নাকি তাঁর রিজার্ভ বাহিনী। সুলতানের মনে অস্থিরতা। অবরোধকে ভয় পাচ্ছেন তিনি। রিজার্ভ বাহিনীর সাহায্য ব্যতীত অবরোধ ভাঙ্গাও সহজ নয়। যদি তিনি অবরোধের মধ্যে পড়েই যান, তাহলে এই সামান্য সৈন্য দ্বারা কিভাবে তিনি অবরোধ ভাঙ্গবেন? তার সবটুকু মেধা তিনি এ সমস্যার সমাধানে ব্যয় করে ফেলেন। তিনি এতোই অস্থির হয়ে পড়েন যে, উর্ধ্বতন কমান্ডারদের নিকট পর্যন্ত তাঁর এই উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করে ফেলেন। তিনি বললেন–

'কমান্ডো ইউনিটগুলোকে পরিপূর্ণরূপে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ও দৃষ্টিতে রাখবে। রিজার্ভ বাহিনীর এখনো কোনো পাত্তা নেই। অবরোধের আশংকা আছে। অবরোধ কেবল গেরিলারাই ভাঙ্গতে পারবে।'

'আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন, তা বাস্তবায়িত হবেই'– এক সালার বললেন– 'এটা দুর্গ নয় যে, অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে আমরা লড়াই করতে পারবো না। এই পার্বত্য এলাকায় আমরা ঘুরেফিরে লড়াই করবো।'

এ রাতেও সুলতান আইউবী ভালোভাবে ঘুমাতে পারেননি। তাঁর তাঁবুতে সারারাত প্রদীপ জ্বালানো থাকে। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার যে নকশা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেটি নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তার উপর দাগ দিতে থাকেন। সেই সময়ে কোন বেসামরিক লোক দেখলে সে নির্ঘাত মনে করতো, সুলতান শতরঞ্জ খেলার অনুশীলন করছেন।

সাহরীর সময় যখন নাকাড়া বেজে উঠে এবং সৈনিকরা সজাগ হয়ে যায়, তখন সুলতান আইউবীরও চোখ খুলে যায়। জাগ্রত হয়েই সুলতান একসঙ্গে দু'টি সংবাদ পান। এক. রিজার্ভ বাহিনী পৌঁছে গেছে। দুই. শত্রু বাহিনী আট থেকে দশ মাইল দূরত্বের মধ্যে এসে পড়েছে এবং সম্ভবত আগামীকালের মধ্যে আমাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। সংবাদদাতা কোন এক তত্ত্বাবধায়ক গ্রুপের কমান্ডার। তিনি জানান, দুশমনের অগ্রযাত্রা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এক অংশ সম্মুখে, অপর অংশ পেছনে, তৃতীয় অংশ তারও পেছনে।

সুলতান আইউবীর যেসব তথ্য নেয়া আবশ্যক ছিলো, নিয়ে নিয়েছেন। সংবাদদাতা কমান্ডারকে বিদায় করে দিয়ে তিনি দারোয়ানকে বললেন, তুমি এক্ষুণি গেরিলা ও রিজার্ভ বাহিনীর উর্ধ্বতন কমান্ডারদের ডেকে আনো।

তাদেরকে বলো, তারা যেনো সাহরী আমার সঙ্গে খায়। সুলতান চট জলদি ওজু করে নেন। রিজার্ভ বাহিনী এসে পৌঁছায় কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সকলে নামায আদায় করেন এবং আল্লাহর সমীপে বিজয়ের জন্য দু'আ করেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার এসে উপস্থিত হন এবং পরক্ষণই রিজার্ভ বাহিনীরও চারজন কমান্ডার এসে হাজির হন। সাহরীর খাবারও এসে পড়ে। রিজার্ভ সৈন্য সুলতান আইউবীর আশার তুলনায় কম। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এ-ই যথেষ্ট। আল-আদেল যে পরিমাণ অস্ত্র প্রেরণ করেছেন, তাতে সুলতান আইউবী নিশ্চিন্ত। অস্ত্রগুলোর মধ্যে ছোট-বড় মিনজানিক বেশী। দাহ্য পদার্থও প্রচুর। সেনা সংখ্যার দিক থেকে সাহায্যটা সামান্য হলেও বাহিনীটা যেহেতু অভিজ্ঞ, তাই হতাশার কিছু নেই। তবে সমস্যা হলো, এই ফৌজ আর অশ্বপাল পাহাড়ী যুদ্ধে অভিজ্ঞ নয়।

ইতিমধ্যে ইন্টেলিজেন্স প্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহও এসে পড়েন। তিনি জানান, হাল্‌ব থেকে আমার এক গোয়েন্দা সংবাদ নিয়ে এসেছে যে, খৃষ্টানরা এই যৌথ বাহিনীকে বিপুল পরিমাণ তীর-ধনুক, মটকা ভর্তি দাহ্য পদার্থ এবং পাঁচশত ঘোড়া প্রেরণ করেছে। গোয়েন্দা আরো জানায়, সে তাদের রওনা হওয়ার পর এসেছে। এই কাফেলাটি বাহিনীর সঙ্গে মিশে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের সঙ্গে মিনজানিকও রয়েছে। তাতে বুঝা যাচ্ছে যে, দুশমন মিনজানীকের সাহায্যে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করবে এবং সলিতাওয়ালা তীর ছুঁড়বে।

সুলতান আইউবী গেরিলা বাহিনীর প্রধানকে বললেন, তোমাকে সবকিছুই অবগত করা হয়েছে। তোমার দায়িত্ব কী, তা তোমার জানা। এবার পরিকল্পনায় এটাও যোগ করে নাও যে, দুশমন আক্রমণ না করা পর্যন্ত কোথাও তাদের উপর গেরিলা হামলা করা হবে না। প্রাপ্ত সংবাদ মোতাবেক শত্রু বাহিনী সোজা হামাত-এর দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের উপর গেরিলা আক্রমণ চালানো হলে তাদের অগ্রযাত্রার গতি শ্লথ হয়ে যাবে। আর তোমার তো জানা আছে, তাদের আক্রমণের পর আমি জবাবী আক্রমণ করবো না। দুশমন আমার আক্রমণের আশংকা করে থাকবে, যা আমি সম্মুখ থেকে নয়, পেছন দিক থেকে পরিচালনা করবো। তোমার কাজ তখন থেকে শুরু হবে, যখন পেছনের আক্রমণে ভীত হয়ে দুশমন এদিক-ওদিক পালাবার চেষ্টা শুরু করবে। এই পার্বত্য এলাকা থেকে একজন শত্রুসেনাও যেনো বেরিয়ে যেতে না পারে। যতো সম্ভব বেশী বেশী শত্রু বন্দী করো। তারা মুসলমান সৈনিক। তোমাদের হাতে বন্দী হলে পরে তাদের সত্য-মিথ্যার বুঝ এসে যাবে। লক্ষ্যও

এই। তবে আমাদের মোকাবেলায় এসে আমাদের তীর-তরবারীর আঘাতে যারা মৃত্যুবরণ করে, আমি তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারি না।'

'আমাদের নিকট তথ্য আছে, দুশমন মটকায় ভরে দাহ্য পদার্থ নিয়ে আসছে। এগুলো আমাদের হস্তগত হলে ভালো হতো। কিন্তু তা সম্ভব হবে না বলেই ধরে নেয়া যায়। তার চেয়ে বরং তুমি একটা কাজ করো, তোমার কোনো একটি ইউনিটের দশ-বারজন গেরিলাকে দায়িত্ব দাও, তারা আক্রমণের সময় অতর্কিত গেরিলা হামলা চালিয়ে মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেলুক এবং দাহ্য পদার্থগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিক। দিনের বেলা দেখে নিতে হবে, মটকা বহনকারী কাফেলার অবস্থান কোথায়। সবচেয়ে জরুরী কথা হলো, দুশমন এখনো নদী পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তোমরা ঘোড়াগুলোকে পানি পান করাও এবং মশকে পানি ভরে নাও। মওসুম ঠাণ্ডা। এটা মরুভূমি নয়। পিপাসায় কেউ মরবে না। তারপরও এটা যুদ্ধ। পিপাসা তোমাদেরকে অস্থির তো করবেই।'

গেরিলা বাহিনীর কমান্ডারকে বিদায় দিয়ে সুলতান আইউবী রিজার্ভ বাহিনীর কমান্ডারদের বললেন—

'একটা বিষয় তোমরা সবসময় মাথায় রাখবে যে, এটা মিশরের মরু এলাকা নয়। এটা পাহাড়ী এলাকা এবং শীতল। খরতাপের মধ্যে ছুটাছুটি করলে শীত দূর হয়ে যাবে। এখানে 'আঘাত করো আর একদিকে পালিয়ে যাও'— এর সুযোগ অবশ্যই পাবে। তোমাদেরকে এর প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। কিন্তু তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এখানকার মাটি তোমাদের জন্য বিস্তৃত নয়। খোলা ময়দানে তো কয়েক ক্রোশ পথ ঘুরে আবার দুশমনের উপর চড়াও হতে পারো এবং যুদ্ধের কৌশল প্রয়োগ করার জন্য অসীম ভূমি খুঁজে পাও। কিন্তু এখানে আমি দুশমনকে যে স্থানটিতে টেনে আনার বন্দোবস্ত করেছি, সেটি ময়দান বটে, তবে সীমিত। তোমাদেরকে টিলা-পর্বতের সঙ্গে পরিচিত করানোর মতো সময় হাতে নেই। তাই জ্ঞান খরচ করে কাজ করতে হবে। তীরান্দাজদেরকে পর্বতের উপর রাখবে। ঘোড়া নিয়ে পাথুরে এলাকায় ঢুকবে না। তবে ঘোড়া অল্পতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আমাদের ঘোড়াগুলো তো কিছুটা হলেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

মিশর থেকে আসা সাহায্যকারী বাহিনীকে সুলতান আইউবী রিজার্ভ রেখে দেন এবং কমান্ডারদেরকে তাদের ঊর্ধ্বতন সালারদের হাতে তুলে দেন। সালারদেরকে যুদ্ধের পরিকল্পনা পূর্বেই দিয়ে রাখা হয়েছে।

ফজরের আযান হয়ে গেছে। সুলতান আইউবী গোসল করেন। খাপ থেকে বের করে তরবারীটা হাতে নেন। তরবারীর ঝলক ও ধার পরখ করেন। তারপর অকস্মাৎ তাঁর আবেগ উথলে ওঠে। তিনি তরবারীটা উভয় হাতের উপর রেখে কেবলার দিকে মুখ করে হস্তদ্বয় উপরে তুলে ধরেন। তারপর চক্ষু বন্ধ করে দু'আ করতে শুরু করেন–

'মহান আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি যদি এতে নিহিত থাকে যে, তুমি আমাকে পরাজিত করবে, তাহলে আমি এই লাঞ্ছনা মাথা পেতে বরণ করে নিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি তুমি আমাকে বিজয় দান করো, তাহলে আমি তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করবো। আজ আমি তোমার রাসূলের নাম উচ্চরণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এটা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তুমি আমাকে ইঙ্গিত দাও, আমি নিজের তরবারীটা আমার পেটের ভেতর সেঁধিয়ে দেই। আমি সেই কিশোরীদের ডাকে সাড়া দিতে এসেছি, যাদের সম্ভ্রম শুধু এই জন্য লুণ্ঠিত হয়েছে যে, তারা তোমার রাসূলের উম্মত। আমি তোমার সেই অসহায় বান্দাদের আহ্বানে এসেছি, যারা একমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে কাফিরদের নির্মম অত্যাচারের শিকার। আমি তোমার মহান ধর্মের মর্যাদা সংরক্ষণ করার জন্য পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল-মরু ভূমিতে ঘুরে ফিরছি। আমি তোমার রাসূলের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে দখলমুক্ত করার জন্য রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু তোমার রাসূলের একদল উম্মত আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তুমি আমাকে ইশারা দাও, তাদের রক্ত ঝরানো আমার জন্য হালাল না হারাম। আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাইনি তো? আমাকে তুমি তোমার নূরের চমক দেখাও। আমি যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, তাহলে তুমি আমাকে সাহস ও দৃঢ়তা দান করো।'

সুলতান আইউবী মাথাটা অবনত করে ফেলেন। এই অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর হঠাৎ তরবারীটা কোষবদ্ধ করে বাইরে বেরিয়ে নামাযের স্থানে চলে যান।

জামাত দাঁড়িয়ে গেছে। সুলতান পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে যান। একদিকে বাবুর্চি, অপরদিকে তাঁর এক কমান্ডারের আরদালী দণ্ডায়মান।

❖ ❖ ❖

নামায আদায় করে সুলতান আইউবী হামাতের দিকে রওনা হয়ে যান। পথে পরপর চারজন দূতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা তাঁকে মৌখিকভাবে রিপোর্ট প্রদান করে। এরা তথ্যানুসন্ধানকারী দলের দূত, যারা হাররান, হাল্ব ও মসুলের সম্মিলিত বাহিনীর গতিবিধি ও তৎপরতার সংবাদ নিয়ে এসেছিলো।

এই ধারা দিন-রাত চলতে থাকে। সুলতান আইউবী দূতদেরকে বিদায় করে দেন। সালার শামসুদ্দীন তার সঙ্গে আছেন। শামসুদ্দীনের ভাই শাদবখতকে তিনি অন্য এক স্থানে মোতায়েন করে রেখেছেন।

'শত্রু সম্পর্কে যেসব খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে, সে ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?'– শামসুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন– 'এই সামান্য ফৌজ দিয়ে আমরা এতো বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করতে পারবো কি?'

'দুশমন কতজন সৈন্য নিয়ে এসেছে আর আমার ক'জন সৈন্য আছে, আমার কাছে এটা কোনো বিষয় নয়'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি অস্থির এই জন্য যে, দুশমন আক্রমণ করছে না কেন? আমার সেই মুসলমান ভাইদের নিকট খৃষ্টান গোয়েন্দা আছে, তারা কি এতোই আনাড়ি হয়ে গেলো যে, তারা জানতেই পারলো না, মিশর থেকে আমার সাহায্য আসছে এবং আমি সাহায্য ছাড়া লড়াই করতে পারবো না! দুশমন যদি তৎপর হতো, তাহলে আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। দুশমনের এ পর্যন্ত এসে থেমে যাওয়া এবং আমাকে এতোটুকু সময় দেয়া যে, সাহায্য পেয়ে যাবো, তাদেরকে বিন্যস্ত করে ফেলবো, সকল সৈন্যের সবগুলো ঘোড়াকে পানি পান করাবো এবং পানি রিজার্ভ করে নেবো; আমার জন্য অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার আশংকা হচ্ছে, দুশমন এমন কোনো কৌশল প্রয়োগ করবে, যা কখনো আমার মাথায় আসেনি।ওরা তো তামাশা করতে আসেনি।'

'আমি তাদেরকে যতোটুকু জানি'– শামসুদ্দীন বললেন– 'তাদের হাতে এমন কোনো কৌশল নেই। আল্লাহর উপর আমার ভরসা আছে। আল্লাহ তাদের বিবেকের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন। কেননা, তারা বাতিলের পরিকল্পনা ও সাহায্য নিয়ে সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছে। তাদের চোখের উপর পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে। আমি গভীর কোনো কৌশল-ষড়যন্ত্রের আশংকা করছি না।'

'শামসুদ্দীন ভাই!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমারও আল্লাহর উপর ভরসা আছে। তবে আমি আবেগ ও তত্ত্বের চেয়ে বাস্তবকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। বাতিল হকের উপর একাধিকবার জয়লাভ করেছে। তখন সত্যের অনুসারীরা আল্লাহ ভরসা বলে হাত গুটিয়ে বসেছিলো। সত্য খুন ও কুরবানীর দাবি করে। আমরা যদি সেই কুরবানী দিতে প্রস্তুত থাকি, তাহলেই সত্যের জয় হবে। বাতিলের মধ্যে যে শক্তি আছে, আমাদেরকে তার মোকাবেলা ময়দানে করতে হবে। আমাদেরকে বাস্তবতার উপর চোখ রাখতে হবে। নিজের পূর্ণ যোগ্যতা

ও সর্বশক্তি কাজে লাগাতে হবে। তারপর ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের আত্ম প্রবঞ্চনায় লিপ্ত হওয়া চলবে না।'

সুলতান আইউবী ঘোড়ার পিঠ থেকে অবতরণ করেন। সালার শামসুদ্দীনের দু'উপদেষ্টা এবং রক্ষীসেনারাও ঘোড়া থেকে নেমে যান। সুলতান আইউবী শামসুদ্দীন এবং উপদেষ্টাদ্বয়কে একটি উঁচু টিলার উপর নিয়ে যান। তাদের সম্মুখে পর্বতবেষ্টিত বিশাল এক মাঠ, যেটি শিং-এর ন্যায় টিলাগুলো অতিক্রম করে বিস্তৃত হয়ে সামনের দিকে চলে গেছে। সুলতান আইউবী যে দিকটায় দাঁড়িয়ে আছেন, সেদিকে দু'টি টিলা একটির পেছনে অপরটি দণ্ডায়মান। সেই টিলা দুটোর মধ্যদিয়ে একটি গলি ময়দানের দিকে এগিয়ে গেছে। মাঠে পর্বতগুলোর কোল ঘেঁষে ছোট-বড় শত শত তাঁবু দাঁড়িয়ে আছে। একধারে তাঁবুতে অবস্থানরত সৈনিকদের ঘোড়াগুলো বাঁধা। সৈন্যরা এদিক-সেদিক ঘুরাফেরা করছে। কিছু সৈন্যকে রোদের মধ্যে শুয়ে এবং ঘুমিয়ে থাকতেও দেখা গেলো। তাদের ভাব-গতি দেখে মনে হলো, বিশাল এক শত্রুবাহিনী আক্রমণ করার জন্য তাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা তারা জানেই না। তারা যদি যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকতো, তাহলে তাদের তাঁবুগুলো দঁড়িয়ে থাকতো না এবং তাদের ঘোড়াগুলোর পিঠে জিন কষা থাকতো।

'আমার ইউনিটগুলোর সালার ও কমান্ডারদেরকে আমি যেসব নির্দেশনা প্রদান করেছি, তা তোমরাও একবার শুনে নাও'– সুলতান আইউবী বললেন– 'হতে পারে, আমি তোমাদের আগে মৃত্যুবরণ করবো এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্রই মারা যাবো। আমার পরে রণাঙ্গনের দায়িত্ব তোমাদেরকেই পালন করতে হবে। আমি তাদেরকে বলেছি, তাঁবুগুলো খাটানো অবস্থায় থাকতে দাও। ঘোড়াগুলোকে জিন ছাড়া বেঁধে রাখো। ভাবনাহীন ভাব প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো এবং এদিক-ওদিক বসে ও শুয়ে থাকো। তবে তাঁবুতে তাঁবুতে অস্ত্র ও জিন প্রস্তুত রাখো। দুশমনের গোয়েন্দারা তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছে। তাদেরকে এই ধারণা দাও যে, দুশমন সম্পর্কে তোমাদের কোনই খবর নেই। দুশমনের বাহিনী এসে পড়লে নিজেদেরকে ভীত বলে প্রকাশ করবে এবং অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। কিন্তু তারপরও তাঁবুগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকবে দেবে। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মোকাবেলা করবে না। দুশমন উপরে উঠে এলে লড়াই করতে করতে এতোটুকু দ্রুত পেছনে সরে যাবে, যেনো দুশমনের আক্রমণকারী বাহিনী তোমাদেরই সঙ্গে এই পার্বত্য এলাকায়

তোমাদের বেষ্টনীতে এসে পড়ে। দুশমনকে বুঝাবে, তোমরা পিছপা হয়ে যাচ্ছ।'

সুলতান আইউবী দুই টিলার মধ্যবর্তী গলিটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন–

'আমি এই বাহিনীগুলোকে বলে দিয়েছি, তোমরা এই গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। তারপর তাদেরকে কোথায় গিয়ে একত্রিত হতে হবে, তাও তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে।'

সুলতান তাঁর বন্ধুদেরকে জায়গাটার কথা উল্লেখ করে বললেন–

'এই বাহিনীগুলোকে দুমশনের পেছনে চলে যেতে হবে। এই পার্বত্য অঞ্চলটিতে আমি দুশমনকে স্বাগত জানোনোর যে ব্যবস্থা করে রেখেছি, তা তোমাদের জানা আছে। স্মরণ রেখো আমার বন্ধুগণ! আমরা এখানে কোনো অঞ্চল বা কোনো দুর্গ জয় করবো না। আমাদের কাজ হলো দুশমনকে অসহায় ও নিষ্ক্রিয় করে তোলা, যাতে তারা আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। আমার মুসলমান ভাইদেরকে দুশমন বলতে আমার লজ্জা হয় কিন্তু কী করবো, পরিস্থিতি আমাকে তা বলতে বাধ্য করছে। আমি তাদেরকে ধ্বংস করতে চাই না। আমি নির্দেশ জারি করে দিয়েছি, যতো বেশী সম্ভব শত্রুসেনাদের জীবিত গ্রেফতার করো আর যুদ্ধবন্দী বানাও। আমি তাদেরকে তরবারী দ্বারা পদানত করে চরিত্র দ্বারা বুঝাবো যে, তোমরা মুসলিম সৈনিক এবং তোমাদের রাজা তোমাদের ধর্মের শত্রুদের হাতে খেলছে।'

'কোনো জাতিকে যদি হত্যা করতে হয়, তাহলে তাদের মাঝে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দাও'– সালার শামসুদ্দীন বললেন– 'খৃস্টানরা সাফল্যের সঙ্গে এই অস্ত্রটা ব্যবহার করেছে।'

'মুসলিম জাতির দৃষ্টান্ত বারুদের ন্যায়'– সুলতান আইউবী বললেন– 'বারুদের এই স্তূপের উপর যদি কোনো দিক থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার এসে পতিত হয়, তাহলে সেটি বিস্ফোরণে ফেটে যায়। জাতির এই দুর্বলতা যদি শিকড় গেড়ে বসে, তাহলে আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। দুশমন তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে পরস্পরে যুদ্ধ করায় এবং জাতির কর্ণধারগণ ক্ষমতার লোভে পরস্পর লড়াই করতে থাকে। এই যে তিনটি গোষ্ঠী স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে, তাদের নেতারা ঐক্যবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের শত্রু। তারা প্রত্যেকে একে অপরকে ধোঁকা দিয়ে সালতানাতে ইসলামিয়ার রাজা হতে চায়। আমি তাদের দেমাগ থেকে রাজত্বের পোকা বের করে জাতিকে সঠিক পথে তুলে আনার চেষ্টা করছি। আমার লক্ষ্য ইসলামের সুরক্ষা ও প্রসার।'

❖ ❖ ❖

হামাত থেকে সামান্য দূরে হাররানের দুর্গপতি গোমস্তগীন– যিনি স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা দিয়েছিলেন– নিজ সালার ও ছোট-বড় কমান্ডারদেরকে একত্রিত করে বলছিলেন–

'সালাহুদ্দীন আইউবী খৃস্টানদেরকে পরাজিত করতে পারে। কিন্তু যখন সে তোমাদের সামনে আসবে, সব কৌশল ভুলে যাবে। সে আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত নয়– সে কুর্দি। তোমরা পাক্কা মুসলমান, দ্বীনদার ও পরহেজগার। আর সে শুধু নামের মুসলমান। সালাহুদ্দীন প্রতারক ও বদকার মানুষ। এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সে তার রাজা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। আমি তোমাদেরকে তার সামরিক অবস্থাও জানিয়ে দিচ্ছি। তার সৈন্যসংখ্যা অনেক কম এবং সে পাহাড়বেষ্টিত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে বসে আছে। এই একটু আগে গোয়েন্দারা আমাকে সংবাদ দিয়ে গেলো যে, সালাহুদ্দীনের ফৌজ তাঁবুর অভ্যন্তরে আরামে সময় কাটাচ্ছে এবং তার ঘোড়াও অলস দাঁড়িয়ে আছে। তার কারণ দু'টি হতে পারে। প্রথমত, সে নিশ্চিত, আমরা তাকে পরাজিত করতে পারবো না। দ্বিতীয়ত, সে এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত থাকবে পারে যে, আমরা তার উপর হামলা করবো না। এমনও হতে পারে, সে সন্ধির জন্য আমাদের নিকট দূত পাঠাবে। কিন্তু এখন আর আমরা তার সঙ্গে কোনো সন্ধি বা সমঝোতা করবো না। সে এখন আমাদের কয়েদী। যদি সে জীবিত অবস্থায় আমাদের হাতে ধরা না দেয়, তাহলে আমি তোমাদেরকে তার লাশ দেখাবো। তোমরা তোমাদের সৈনিকদেরকে বলে দাও, সালাহুদ্দীন আইউবী মাহদী বা নবী-রাসূল নয় এবং তার সৈন্যদের মাঝেও কোনো জিন-ভূত নেই। আমরা তার বাহিনীকে তাদের অজ্ঞাতেই ঝাপটে ধরবো।'

শ্রোতাদেরকে উত্তেজিত করে এবং তাদের সাহস বৃদ্ধি করে গোমস্তগীন তাদেরকে বিদায় করে দিয়ে নিজে তাঁবুতে চলে যান। তাঁবু তো নয় যেন জঙ্গলের মঙ্গল। বিশাল এক তাঁবু, যার ভেতরে জাজিম ও মূল্যবান পালঙ্ক সাজানো। আছে মদের সোরাহী ও কারুকার্য খচিত মদের পেয়ালা। ভেতর থেকে তাঁবুটাকে প্রাসাদের সুসজ্জিত কক্ষ বলে মনে হয়। তার আশপাশে আরো কতগুলো তাঁবু খাটানো, যেগুলো সামরিক তাঁবুগুলো থেকে ভিন্ন ধরনের ও আকর্ষণীয়। এ তাঁবুগুলোতে বাস করছে হেরেমের মেয়েরা এবং গায়িকা-নর্তকীরা। তাঁবুগুলো থেকে দূরে দূরে পাহারাদাররা দাঁড়িয়ে আছে। গোমস্তগীনের তাঁবুর বাইরে এক ব্যক্তি তার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। তাদের

দেখেই গোমস্তগীন দ্রুত হাঁটা দেন এবং নিকটে গিয়ে তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে বলেন। তারা ভেতরে প্রবেশ করামাত্র একদল মেয়ে তশতরি হাতে তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে খাবার এসে হাজির হয়। এসে পড়ে মদের সোরাহীও। গোমস্তগীন এই নয় ব্যক্তির সঙ্গে আহারে যোগ দেন।

নয় ব্যক্তি খাবারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তারা ভুনা গোশতের বড় বড় টুকরো হাতে নিয়ে রাক্ষসের মতো গিলতে শুরু করে। পাশাপাশি মদপান করছে পানির মতো। তাদের চোখগুলো রক্তজবার ন্যায় টকটকে লাল, যেনো তারা জংলী ও রক্তখোর হায়েনা। তিন-চারটি সুন্দরী মেয়ে তাদের পেয়ালায় মদ ভরে দিয়ে চলেছে আর তারা মেয়েগুলোর সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করছে। কখনো কোনো মেয়ের এলো চুলে বিলি কাটছে। কখনো বা বিবস্ত্র বাহু ধরে কাছে টেনে এনে সোহাগ করছে। এক কথায় গোমস্তগীনের তাঁবুতে একসঙ্গে ভুঁড়িভোজন, মদপান আর নারীভোগ করে চলেছে নয় অতিথি। গোমস্তগীন তাদের আচার-আচরণ ও খাওয়ার ধরন দেখে মুচকি হাসছেন। কিন্তু তার হাসিই প্রমাণ করছে, তিনি হাসছেন জোরপূর্বক। এই লোকগুলো তার বিলকুল অপছন্দ।

আহার শেষ হলে গোমস্তগীন মেয়েগুলোকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে মেহমানদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ গল্প-গুজব করার পর গোমস্তগীন বললেন– 'তোমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর উদ্দেশ্যে বিদায় করে দেয়ার সময় হয়ে গেছে। এবারকার আক্রমণ যেনো ব্যর্থ না হয়।'

'আপনি যদি আমাদেরকে থামিয়ে না রাখতেন, তাহলে এতোক্ষণে সুসংবাদ পেয়ে যেতেন যে, অজ্ঞাত ঘাতকের হাতে সালাহুদ্দীন আইউবী খুন হয়েছেন।' এক ব্যক্তি বললো।

এরা হাসান ইবনে সাব্বাহ'র নয় ফেদায়ী, যাদেরকে শেখ সান্নান সুলতান আইউবীকে হত্যা করার জন্য ত্রিপোলী থেকে প্রেরণ করেছিলো। আকার-গঠনে মানুষ হলেও এরা চরিত্রে হায়েনা। তারা নিজ নিজ ডান হাতে মধ্যমা আঙ্গুল থেকে দশ দশ ফোঁটা করে রক্ত বের করে পাত্রে রাখে। তার মধ্যে মদ ও হাশীশ মিশিয়ে শরবত তৈরি করে প্রত্যেকে এক এক চুমুক পান করে বিশেষ শব্দে শপথ নিয়েছিলো যে, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করবোই। শেখ সান্নান তাদেরকে দুনিয়াত্যাগী সুফীর পোশাক পরিয়ে হাতে তাসবীহ ও গলায় কুরআন ঝুলিয়ে এই নির্দেশনা দিয়ে প্রেরণ করেছিলো, তোমরা সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছে যাও এবং তার সম্মুখে আলোচনা

উত্থাপন করো যে, মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই না করা উচিত। তারপর বলবে, আমরা মধ্যস্থতা করে এই আত্মকলহ মিটিয়ে দিতে চাই। এ ব্যাপারে আমরা অন্যান্য মুসলিম আমীরদের সঙ্গে কথা বলেছি। এখন আপনার নিকট আসলাম। এভাবে সুযোগ মতো তোমরা সুলতান আইউবীকে হত্যা করে ফেলবে।

শেখ সান্নান কৌশলটা ঠিক করেছে ভালোই। সুলতান আইউবী আলিম-উলামা ও ধর্মীয় নেতাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কাছে বসাতেন এবং মনোযোগ সহকারে তাদের বক্তব্য শুনতেন। তাঁর আরো একটি দুর্বলতা এই ছিলো যে, তিনি চাচ্ছিলেন, কেউ মাঝে পড়ে বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে তাকে একটা সমঝোতা করিয়ে দিতে, যাতে মুসলমানে-মুসলমানে খুনাখুনি বন্ধ হয়ে যায়। অন্যথায় খৃস্টানরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার এবং হামলা করে সাফল্য অর্জনের সুযোগ পেয়ে যাবে। তিনি হাল্‌ব প্রভৃতি এলাকায় দূতও প্রেরণ করেছিলেন, যারা অপমানজনক উত্তর নিয়ে ফিরে এসেছে। এবার তাঁর সেই দুর্বলতাকে পুঁজি করে তাকে খুন করার পরিকল্পনা নিয়ে আসছে সূফীবেশী নয় সদস্যের একদল ঘাতক। তাঁর সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ করার নামে চোগার ভেতরে খঞ্জর আর তরবারী লুকিয়ে আনছে তারা। এটা সুলতান আইউবীকে হত্যা করার এক সহজ পন্থা। তারা ত্রিপোলী থেকে রওনা হয়ে হাররান এসে পৌঁছেছিলো। খৃস্টান উপদেষ্টারা গোমস্তগীনকে বলেছিলো, এরা সুলতান আইউবীকে হত্যা করতে যাচ্ছে। তিনি তাদের নিকট হত্যা প্রক্রিয়ার কথা শুনে তা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদা দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেন এবং খৃস্টান উপদেষ্টাদের বলে দেন, আমি সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছি। আপনাদের এই নয় ঘাতককে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো এবং সুযোগ মতো অন্য কোনো পন্থায় সুলতান আইউবীকে খুন করাবো। সে মতে গোমস্তগীন তাদেরকে সঙ্গে করে ময়দানে নিয়ে এসেছেন।

রণাঙ্গনে গোমস্তগীন তাদের জন্য সুযোগও সৃষ্টি করে নিয়েছেন এবং তাদের ছদ্মবেশও প্রস্তুত করে ফেলেছেন। আহার শেষে তিনি তাদেরকে বললেন— 'এবার আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার কী পন্থা আমি ঠিক করে রেখেছি। তোমরা যে সূফীবেশ ধারণ করেছো, তা সন্দেহ জন্ম দিতে পারে। আইউবীর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও গভীর। তার উপর ইতিপূর্বে চারবার সংহারী আক্রমণ হয়েছিলো। ফলে তিনি অধিক সতর্ক হয়ে গেছেন। তাঁর উচ্চ পর্যায়ের অভিজ্ঞ দু'জন গোয়েন্দাও আছে। একজন আলী বিন

সুফিয়ান, অপরজন হাসান বিন আবদুল্লাহ। তারা এক দৃষ্টিতেই মানুষকে আন্দাজ করে ফেলতে পারে। আমাদের গোয়েন্দাদের সংবাদ মোতাবেক এ সময় হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর সঙ্গে আছে। আর আলী বিন সুফিয়ান আছে কায়রো। কোনো অপরিচিত লোক সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গেলে দু'তিনজন সালার এবং হাসান বিন আবদুল্লাহ তাকে গভীরভাবে যাচাই-বাছাই করে নেয়। সন্দেহ হলে তল্লাশিও নিয়ে থাকে। আইউবী কিংবা হাসান ইবনে আবদুল্লাহ প্রশ্ন করতে পারেন যে, এই সংঘাত-আত্মকলহ তো কয়েক মাস ধরেই চলে আসছে। তা তোমাদের সন্ধি-সমঝোতার চিন্তাটা আজ আসলো কিভাবে? আইউবী এ-ও জিজ্ঞেস করতে পারেন, তোমরা কোথাকার ধর্মীয় নেতা? কিংবা তিনি এমন কোনো প্রশ্ন করতে পারেন, তোমরা যার উত্তর দিতে পারবে না অথবা এমন উত্তর দেবে, যার ফলে তোমাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাবে। তিনি নিজে আলিম। ধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান রয়েছে। তাছাড়া তোমাদের চেহারায় দাড়ি ব্যতীত সুফীদের আর কোনো লক্ষণ চোখে পড়ছে না। তোমাদের চারজনের দাড়ি এখনো ছোট, যা প্রমাণ করছে, মাসখানেক ধরে তোমরা দাড়ি রেখেছো। তোমাদের চোখে হাশীশ ও মদের ক্রিয়া পরিস্ফুট। এই চেহারাগুলোতে পবিত্রতার লেশও চোখে পড়ছে না।'

নয়জনের একজনও গোমিস্তগীনের বক্তব্যে অসন্তুষ্ট হলো না। তার বক্তব্য ও পরিকল্পনার সঙ্গে বরং একমত পোষণ করলো। দলনেতা বললো– 'আমি আপনার প্রতিটি কথার সঙ্গে একমত। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি আমাদেরকে সুফী কিংবা ইমাম মনে করে সম্মানের সাথে তার তাঁবুতে বসতে দেন আর আমাদের আপ্যায়নের জন্য খাবারের আয়োজন করেন, তাহলে আমার এই বন্ধুরা খাদ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই। একজন ইমাম ও খতীব কিভাবে আহার করেন, আমরা একজনও তা জানি না। তা আপনি কী বুদ্ধি ঠিক করেছেন?'

'অত্যন্ত সহজ ও নিরাপদ'– গোমস্তগীন বললেন– 'আমি তোমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর স্বেচ্ছাসেবী রক্ষীসেনা দলে ঢুকিয়ে দেবো। তবে তার জন্য খুব যাচাই-বাছাই করে রক্ষী নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তাদের পরিবার-পরিজনেরও খবরাখবর নেয় হয়। তাই যাওয়া মাত্রই তোমরা তার রক্ষী বাহিনীতে ঢুকে যেতে পারবে, এমনটা সম্ভব নয়। আমি যে পন্থাটা ভেবে রেখেছি, আশা করি তোমরা তাতে সফল হবে। তাহলো, গোয়েন্দারা

জানিয়েছে, দামেস্কের লোকদের মাঝে আমাদের বিরুদ্ধে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর পক্ষে এতো বেশী আবেগ ও উদ্দীপনা বিরাজ করছে যে, তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে রণাঙ্গনে ছুটে আসছে। আমি জানতে পেরেছি, আইউবী তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনীতেও ভর্তি করে নিচ্ছেন এবং অন্য কাজেও ব্যবহার করছেন। এই পরিস্থিতি থেকে আমি ফায়দা হাসিল করতে চাই।'

গোমস্তগীন আলাদাভাবে রাখা একটি কাঠের বাক্স টেনে হাতে নেন। তিনি বাক্সটা খুলেন। তার ভেতরে কতগুলো পোশাক। তিনি ঘাতকদের উদ্দেশ করে বললেন–

'তোমরা প্রত্যেকে এই পোশাক পরিধান করে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট যাবে। এটা তাঁর রক্ষী সেনাদের ইউনিফর্ম। তোমাদের একজনের হাতে আইউবীর ঝাণ্ডা থাকবে। অবশিষ্ট আটজনের বর্শার আগায় আইউবীর সৈন্যদের পতাকা থাকবে। তোমরা সোজা আইউবীর নিকট চলে যাবে। এক স্থানে তোমাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। তোমাদেরকে আইউবীর নিকট যেতে দেয়া হবে না। তোমরা আপ্লুত কণ্ঠে বলবে, আমরা স্বেচ্ছাসেবী। আমরা দামেস্ক থেকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হেফাজতের জন্য এসেছি। আরো বলবে, আমরা অত্যন্ত মমতার সঙ্গে রক্ষী বাহিনীর পোশাক প্রস্তুত করে এনেছি এবং অন্তরে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভক্তি নিয়ে এসেছি। আমাদেরকে সুলতানের আশপাশে প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত করুন কিংবা কোনো জানবাজ বাহিনীতে যুক্ত করে দিন। আমরা ফেরত যাবো না।'

গোমস্তগীন বললেন– 'তোমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট যেতে দেয়া হবে না। তোমরা জিদ ধরবে এবং বলবে, আমরা বহুদূর থেকে ভক্তি ও আবেগ নিয়ে এসেছি। সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে আমরা যাবো না। আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আইউবী জযবার খুব মূল্যায়ন করে থাকেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে সাক্ষাৎ দেবেন। বর্শাগুলো তোমাদের হাতে থাকবে। যদি তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন, তাহলে তোমরা ঘোড়া থেকে নামবে না। নিকটে গিয়েই ঘোড়া হাঁকাবে আর তার দেহটা বর্শার আঘাতে ঝাঝরা করে দিয়ে পালিয়ে আসার চেষ্টা করবে। তোমরা প্রত্যেকে জীবনের বাজি লাগানোর শপথ করেছো। তবে আমার আশা, তোমরা প্রত্যেকে নিরাপদে পালিয়ে আসতে সক্ষম হবে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, সুলতানকে আহত অবস্থায় দেখামাত্র রক্ষীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে। ঘটনাটা কী ঘটলো বুঝবার আগেই তোমরা তাদের তীরের আওতা

থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। আমি তোমাদেরকে আরবের এমন উন্নত জাতের ঘোড়া প্রদান করবো, বাতাসও যাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠে না।'

'পন্থাটা অত্যন্ত ভালো'– ফেদায়ী ঘাতকচক্রের প্রধান বললো– 'আমাদের সেই সহকর্মীরা আনাড়ি ও কাপুরুষ ছিলো, যারা আইউবীকে ঘুমন্ত অবস্থায়ও হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং উল্টো তার হাতে প্রাণ হারিয়েছে ও জীবন্ত গ্রেফতার হয়েছে। এবার আমরা যাচ্ছি। আমরা যদি আইউবীর মাথাটা কেটে নাও আসতে পারি, আপনি এ সংবাদ অবশ্যই শুনতে পাবেন যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিহত হয়েছেন।'

'আর যদি আমরা তাকে হত্যা করে ফিরে আসতে পারি, তাহলে?' এক ফেদায়ী হেরেমের মেয়েদের তাঁবুগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে এবং শয়তানী হাসি হাসে।

গোমস্তগীন শয়তানী হাসির সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত। তিনিও ঠোঁটে অনুরূপ হাসি টেনে বললেন– 'তোমাদের যারা জীবিত ফিরে আসবে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করে আসবে, তাদেরকে আমি এক একটি তাঁবুতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। খৃষ্টানরা তোমাদেরকে যে পুরস্কার প্রদান করবে, তার চেয়ে আমি তোমাদেরকে এতো বেশী সোনা-দানা প্রদান করবো, যা তোমরা কখনো স্বপ্নেও দেখোনি। আর যে ব্যক্তি সালাহুদ্দীন আইউবীর মাথা কেটে নিয়ে আসবে, তাকে তার পছন্দ অনুসারে দু'টি মেয়ে আজীবনের জন্য দিয়ে দেবো।'

ফেদায়ীরা পশুর ন্যায় চিৎকার করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। গোমস্তগীন বড় কষ্টে তাদেরকে থামিয়ে বললেন– 'এসো, আমি তোমাদেরকে হামাতের দিকে যাওয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। তবে সাবধান! পথে যদি কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা এবং কোথা থেকে এসেছো, তাহলে শুধু এটুকু বলবে যে, আমরা দামেস্ক থেকে এসেছি এবং রণাঙ্গনে যাচ্ছি। পথে সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা ও গেরিলা সৈন্যদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে। আজ রাতই তোমাদের রওনা হতে হবে।'

'আজ রাতেই?'– এক ফেদায়ী বললো– 'আগামীকাল দিনে গেলে হয় না?'

'অতো সময় নেই'– গোমস্তগীন বললেন– 'তোমাদের পথ অনেক দীর্ঘ। গন্তব্যে পৌঁছতে দু'দিন সময় লাগবে। ঘোড়াগুলোকে আরাম দিতে দিতে যাবে। দ্রুত চলার দরুন ঘোড়া পথেই ক্লান্ত হয়ে পড়লে পরে গন্তব্যে পৌঁছা কঠিন হবে।'

গোমস্তগীন বাক্স থেকে পোশাকগুলো বের করে তাদের হাতে দিয়ে বললেন– এগুলো এখানেই পরে নাও। তিনি দারোয়ানকে বললেন, সেই নয়টি

ঘোড়া নিয়ে আসো, যেগুলো আমি আলাদা করে রেখেছিলাম।

মধ্যরাতের পর। নয়জন অশ্বারোহী গোমস্তগীনের তাঁবু ত্যাগ করে হামাতের দিকে রওনা হয়ে যায়। সর্বসম্মুখের অশ্বারোহীর হাতে সুলতান আইউবীর ঝাণ্ডা। অপর আটজনের বর্শার আগায় বাঁধা ছোট ছোট পতাকা।

সেদিনের যে সময়টিতে গোমস্তগীন তার সালার ও কমান্ডারদেরকে জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে উৎসাহিত-উদ্দীপ্ত করছিলেন, সেদিন একই সময়ে সাইফুদ্দীন এবং হালবের সৈন্যরাও অনুরূপ উত্তেজনাকর ভাষণ শুনছিলো। হালবের এক সালার নিজ ঘোড়ার পিঠে চড়া অবস্থায় তার সৈনিকদেরকে বলছিলো–

'ইনি সেই সালাহুদ্দীন, যিনি হাল্ব অবরোধ করেছিলেন। তোমরা সালাহুদ্দীনকেই এবং তার এই ফৌজকেই হাল্ব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আমি কা'বার প্রভুর শপথ করে বলছি, সালাহুদ্দীন কোনো দুর্গ বা শহর অবরোধ করলে তাকে জয় না করে ক্ষান্ত হন না, এ কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি হালবের অবরোধে কেন সফল হননি? তিনি কেন অবরোধ তুলে নিয়েছিলেন? শুধু এ কারণে যে, তোমরা হলে সিংহ। তোমরা জানবাজ মুজাহিদ। তোমরা শহর থেকে বের হয়ে তার উপর যে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলে, তিনি তা সামাল দিতে পারেননি। জয় তারই ভাগ্যে জুটে, যার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন। মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। সালাহউদ্দীন আইউবীর উপর আল্লাহ কেনো খুশী হবেন? তিনি তো লুটেরা। তিনি দামেস্ক দখল করেছেন। পদানত করার পর সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে তিনি কিরূপ আচরণ করেছেন, সেখানে গিয়ে দেখে আসো। সেখানকার একজন নারীর ইজ্জতও অক্ষত নেই। আমরা দামেস্ক ত্যাগ করে হাল্ব চলে এসেছি। কিন্তু আমাদের দামেস্ক ফিরে যেতে হবে। সালাহুদ্দীন আইউবী থেকে আমাদেরকে প্রতিশোধ নিতে হবে। আল্লাহর সৈনিকগণ! তোমরা একথা চিন্তা করো না যে, মুসলমান হয়ে তোমরা মুসলমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছো। সেই মুসলমান কাফিরের চেয়েও নিকৃষ্ট, যে মুসলমানদের শহর-নগর দখল করে বেড়ায়। এমন মুসলমানকে হত্যা করা তোমাদের উপর আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন।

খেলাফতের মোহাফেজগণ! তোমাদের শত্রু খৃস্টানরা নয়– সালাহুদ্দীন আইউবী ও তার বাহিনী। তিনিই খৃস্টানদেরকে আমাদের শত্রুতে পরিণত করেছেন। নূরুদ্দীন জঙ্গী জাতির উপর সবচেয়ে বড় অবিচার এই করেছেন যে,

তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে মিশরের শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন। অন্যথায় লোকটা ক্ষুদ্র একটি সেনাদলের কমান্ড করারও যোগ্য ছিলেন না। আমি তো তাকে আমার বাহিনীতে সাধারণ সৈনিক হিসেবেও নিয়োগ দেবো না। এবার মৃত্যু তাকে এই পার্বত্য এলাকায় টেনে নিয়ে এসেছে। এখন তার সম্মুখে থাকবে তোমাদের তরবারী, বর্শা আর ঘোড়া। পেছনে থাকবে টিলা আর পাহাড়। তোমরা তাকে ও তার সৈনিকদেরকে পিষে মেরে ফেলতে পারবে। হালবের অপমান আর ধ্বংসের প্রতিশোধ তোমাদের নিতেই হবে। তোমরা যদি সালাহুদ্দীন আইউবীকে এখানে এই পার্বত্য অঞ্চলে খতম করতে না পারো, তাহলে তিনি সোজা হাল্ব চলে আসবেন। তার দৃষ্টি হালবের উপর নিবিষ্ট। তিনি তোমাদেরকে তার গোলাম বানাতে চাচ্ছেন। তোমাদের বোন-কন্যারা তার সালারদের হেরেমের সৌভায় পরিণত হবে। আমি মিথ্যুক হতে পারি, নূরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র মিথ্যুক নন। গোমস্তগীন তো মিথ্যা বলছেন না। এতোগুলো আমীর যদি মিথ্যুক না হয়ে থাকেন, তাহলে এক সালাহুদ্দীন অবশ্যই মিথ্যুক। আর এ কারণেই ইসলামের তিনটি বাহিনী তাকে পিষে মারতে এসেছে। তোমরা সকলে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তোমরা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমান। আজ প্রমাণ করতে হবে, ইসলাম ও আত্মমর্যাদার খাতিরে তোমরা আপন ভাইয়েরও রক্ত ঝরাতে পারো।'

বাহিনী বাহ্যত নীরবে সালারের বক্তব্য শুনছিলো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা চরমভাবে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত। সালার সত্য ও বাস্তবকে মাটিচাপা দিয়ে ফৌজের চেতনাকে উত্তেজিত করে তুলেছে। সৈন্যরা ধ্বনি দিতে শুরু করে– 'আমরা কারো গোলামী বরণ করে নেবো না, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে বেঁচে থাকতে দেবো না।' তারা স্লোগানে স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে।

সাইফুদ্দীনের ক্যাম্পের অবস্থাও উত্তেজনাকর। তিনিও তার বাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলছিলেন। তিনি তার সৈনিকদের জন্য একটি সুযোগ এই করে দেন যে, তিনি দু'জন আলিম থেকে ফতোয়া নিয়ে এসেছেন, যুদ্ধের ময়দানে রোযা রাখা ফরজ নয়। এ ঘোষণায় তার সৈন্যরা সবাই খুশী। সাইফুদ্দীন বললেন, আমরা তখন আক্রমণ করবো, যখন আইউবীর রোযাদার সৈনিকদের দম নাকের আগায় এসে যাবে। তারপর আমাদের গন্তব্য হবে দামেস্ক। দামেস্কের অঢেল সম্পদ হবে তোমাদের।

সুলতান আইউবী তার সৈনিকদের উদ্দেশে ভাষণ দেননি। তাঁর দৃষ্টি সেই ভূখণ্ডটির উপর নিবদ্ধ, যেখানে তাঁকে লড়াই করতে হবে। এই যুদ্ধে কিভাবে অধিকতর সামরিক স্বার্থ উদ্ধার করা যায়, তা-ই তার ভাবনা। তিনি কথাবার্তা যা বলেছেন, বলেছেন সিনিয়র ও জুনিয়র কমান্ডারদের সঙ্গে। তাও বাস্তবভিত্তিক– কোনো উত্তেজনাকর বক্তৃতা নয়। একটা বিষয় মনে পড়লেই কেবল মাঝে-মধ্যে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতেন যে, মুসলমান বন্ধুরাই তার ফিলিস্তিনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে আর মুসলমানরা মুসলমানের হাতে খুন হচ্ছে! তাঁর কাছে এর কোনো প্রতিকারও ছিলো না। সন্ধি ও শান্তির জন্য প্রতিপক্ষের নিকট দূত প্রেরণ করে তিনি নিজেকেই অপমানিত করেছেন। এখন সংঘাত-সংঘর্ষে তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি মিশর থেকে আসা বাহিনীকে পরিকল্পনা মোতাবেক বিভক্ত করে দিয়ে এখন দুশমনের অপেক্ষায় অস্থিরচিত্তে সময় অতিবাহিত করছেন। তিনি তাঁর উপদেষ্টাদের নিকট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সম্ভবত শত্রু বাহিনী চাচ্ছে, আমরা পাহাড়ি এলাকা থেকে বের হয়ে তাদের উপর আক্রমণ করি। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত, তিনি এ স্থান ত্যাগ করবেন না। তিনি দুশমনকে বিভ্রান্ত করার ফন্দি এঁটে বসে আছেন। তিনি ইচ্ছা করলে কমান্ডো সেনাদের দ্বারা দুশমনের ক্যাম্পে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা-ও করলেন না। তিনি দুশমনের চাল-কৌশল পর্যবেক্ষণ করছেন।

দামেস্কে নূরুদ্দীন জঙ্গী মরহুমের বিধবা স্ত্রী অপর এক রণাঙ্গন চালু করে রেখেছেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যখন দামেস্ক ত্যাগ করে চলে যান, তখন থেকেই এই মহিয়সী নারী মেয়েদের একটি স্বেচ্ছাসেবক ফৌজ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। মেয়েদেরকে যুদ্ধাহত সৈনিকদেরকে রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে আনা, ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ প্রদান করার নিয়ম প্রচলিত ছিলো। কিন্তু নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী তাঁর বাহিনীর মেয়েদেরকে তরবারী চালনা, বোমাবাজি এবং তীরান্দাজীর প্রশিক্ষণও প্রদান করছেন। এ কাজের জন্য তিনি কয়েকজন অভিজ্ঞ পুরুষকেও দলে রেখেছেন। তিনি জানতেন, সুলতান আইউবী যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের উপস্থিতি পছন্দ করেন না। এমতাবস্থায় তিনি মেয়েদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করবেন, সে কথা তো ভাবাই যায় না। তথাপি তিনি মেয়েদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। তাছাড়া তখনকার পরিস্থিতিটাই এমন ছিলো যে, মানুষ নিজ নিজ মেয়েদেরকে

সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করাকে গর্বের বিষয় মনে করতো। দশ-বার বছরের কিশোরীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাঠের তরবারী তৈরি করে তরবারী চালনার অনুশীলন করতো।

সম্প্রতি জঙ্গীর স্ত্রীর বাহিনীর সদস্য সংখ্যা চারজন বৃদ্ধি পেয়েছে। তন্মধ্যে একজন হলো ফাতেমা, যাকে সুলতান আইউবীর এক গুপ্তচর গোমস্তগীনের হেরেম থেকে বের করে এনেছে। একজন মসুলের খতীব ইবনুল মাখদূমের কন্যা মানসূরা। অপর দু'জন সেই দুই মেয়ে, যাদেরকে হাল্ব থেকে গোমস্তগীনের নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিলো এবং সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখত হাররানের কাজীকে হত্যা করে সেখান থেকে উদ্ধার করে এনেছিলো। তারা হলো হুমায়রা এবং সাহার। এরা সুলতান আইউবীর নিকট রণাঙ্গনে গিয়েছিলো। সেখান থেকে সুলতান তাদেরকে দামেস্ক পাঠিয়ে দেন। এ ধরনের অসহায় মেয়েদেরকে নূরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করা হতো। এই চারজন মেয়েও তার নিকট পৌঁছার পর তিনি তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণে ভর্তি করে দেন। তাদের স্বপ্নও এটিই ছিলো, যা পূরণ হয়েছে।

তারা জঙ্গীর স্ত্রীকে নিজ নিজ কাহিনী শোনায়। তিনি তাদেরকে তার সংগঠনের মেয়েদের নিকট নিয়ে যান এবং বলেন, তোমরা এদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তোমাদের কাহিনী শোনাও, চার মেয়ে নিজ নিজ কাহিনী শোনায়। খতীব কন্যা মানসূরা অত্যন্ত জ্ঞানী ও সচেতন। সে মেয়েদের উদ্দেশ করে বললো–

'নারী হলো জাতির ইজ্জত। দুশমন যখন কোনো জনবসতি দখল করে, তখন তাদের সৈন্যরা সর্বপ্রথম নারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তোমরা এই মেয়ে দুটোর মুখ থেকে শুনেছ যে, খৃস্টান কবলিত এলাকাগুলোতে খৃস্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে কত ভয়ংকর ও নির্মম আচরণ করে চলেছে। সেখানে একটি মুসলিম মেয়েরও ইজ্জত অক্ষত নেই। আল্লাহ না করুন, দামেস্কও যদি তাদের দখলে চলে যায়, তাহলে তোমাদেরকেও একই পরিণতি বরণ করতে হবে। আমরা যদি রক্তের কুরবানী দিতে অসম্মত হই, তাহলে খৃস্টানরা আমাদের প্রভুতে পরিণত হবে। তারা আমাদের বহু আমীরকে ক্রয় করে নিয়েছে। এখন খৃস্টানরাও আমাদের শত্রু, মুসলিম আমীরগণও আমাদের শত্রু। আমরা যদি বিজয় অর্জন করতে চাই, তাহলে প্রতিশোধের স্পৃহা জীবিত ও শাণিত রাখতে হবে। আমার আব্বাজান বলে থাকেন, যে জাতি কাফিরদের বর্বরতার শিকার ভাইদের কথা ভুলে যায়, সে জাতি বেশিদিন টিকে থাকে না।'

'আমার বোনেরা! আমি মোহতারাম সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভক্ত। আমি আইউবীর নামে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁর একটা নীতি আমি পছন্দ করি না, তিনি নারীকে রণাঙ্গনে যেতে দেন না। তিনি যা চিন্তা করেছেন, হয়ত ঠিকই করেছেন। যুবতী ও সুন্দরী মেয়েদেরকে হেরেমের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। আমাদেরকে পুরুষের বিনোদনের উপকরণ বানানো হয়েছে। এভাবে জাতির অর্ধেক শক্তি বেকারই রয়ে গেছে। দুশমন সৈন্য নিয়ে আসে। তার মোকাবেলায় আমাদের সৈন্যসংখ্যা তাদের অর্ধেকও হয় না। তাই আমরা নারীদের পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধ করে সৈন্যের অভাব পূরণ করবো। আমি মসুলে গোয়েন্দা দলে ছিলাম। এই ময়দানে আমি লড়াই করে এসেছি। আমার পিতার ভুলটা ছিলো, তিনি আবেগতাড়িত হয়ে তাঁর মনের কথা বলে ফেলেছেন। ধরা না খেলে সেখানে আমাদের পরিকল্পনা অন্যকিছু ছিলো। আমরা সেখানে ধ্বংসলীলা চালাতে পারিনি এবং সেখান থেকে আমাদের পালিয়ে আসতে হলো।'

চার মেয়ের জ্বালাময়ী বক্তব্য নূরুদ্দীন জঙ্গীর বাহিনীর মেয়েদের স্পৃহাকে আরো শাণিত করে তুলেছে। এখন তারা পূর্বের তুলনায় অনেক উজ্জীবিত। তাদের চারশত মেয়ে ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে প্রস্তুত হয়ে আছে। জঙ্গীর স্ত্রী তাদেরকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করার সব আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছেন। তারা রওনা হবে বলে। নবাগত চার মেয়েও কয়েকদিনের মধ্যে কিছু প্রশিক্ষণ অর্জন করে ফেলেছে। কিন্তু এখনও পূর্ণ দক্ষ হয়ে ওঠেনি বলে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো না। কিন্তু তাদের হৃদয়ে প্রতিশোধস্পৃহা এতোই বেশি যে, তারা এই বাহিনীর সঙ্গে ময়দানে যেতে জিদ ধরে। ফাতেমা, হুমায়রা তো রীতিমতো কেঁদে ফেলে। অগত্যা জঙ্গীর স্ত্রী তাদেরকেও বাহিনীতে যুক্ত করে নেন। একশত পুরুষ যোদ্ধাও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। তাদের কমান্ডার হলেন হাজ্জাজ আবূ ওয়াক্কাস।

নূরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী হাজ্জাজ আবূ ওয়াক্কাসকে একটি লিখিত বার্তা দিয়ে বললেন, এটি সালাহুদ্দীন আইউবীকে দেবে। আমার যা বলার সব লিখে দিয়েছি। তাকে বলবে, এই মেয়েগুলোকে আহতদের সেবা-শশ্রুষার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তুমি ভালোভাবে শুনে নাও, এই মেয়েগুলোকে এবং স্বেচ্ছাসেবী মোহাফেজদেরকে তোমার সঙ্গে রাখবে। এরা প্রত্যেকে গেরিলা হামলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। মেয়েরাও যুদ্ধ করতে জানে। আহতদের সেবার বাহানা দেখিয়ে তোমরা লড়াই করবে। সুযোগ পেলেই দুশমনকে দুর্বল করে ফেলবে।

আমি মেয়েদেরকে বলে দিয়েছি, তারা যেন দুশমনের হাতে ধরা না পড়ে। তারা নিজেরাই বলছে, ধরা পড়ার আশংকা দেখা দিলে নিজের তরবারী দ্বারাই নিজেকে শেষ করে ফেলবে।

চারশত মেয়ে ও একশত স্বেচ্ছাসেবী পুরুষ যোদ্ধার এই বাহিনীটি ঘোড়ায় আরোহন করে যখন রওনা হয়, তখন সমগ্র শহর যেনো হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। জনতা ইসলামের এই সৈনিকদেরকে ফুল ছিটিয়ে স্বাগত জানায়। 'নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার', 'ইসলাম জিন্দাবাদ', 'সালাহুদ্দীন আইউবী জিন্দাবাদ' স্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। জনতা তাদেরকে এই বলে উৎসাহিত করে যে, তোমরা ফিরে এসো না, সম্মুখপানে এগিয়ে যাও। সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলবে, দামেস্কের সকল নারী আসবে। আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করুন। ইসলামের একজন শত্রুও বেঁচে থাকতে পারবে না। শহরের বহু মানুষ উট-ঘোড়ায় আরোহন করে বহু দূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গিয়ে বিদায় জানায়।

রমযান মাস। পথে এক রাত অবস্থান করতে হবে। ইফতারের খানিক আগে কাফেলা এক স্থানে যাত্রাবিরতি দেয়। মেয়েরা খাবার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাতে শীত পড়ছে। কাফেলায় ঘোড়ার পাশাপাশি উটও আছে। উটগুলোর পিঠে তাঁবু বোঝাই করা। তাঁবুগুলোর ভেতরে লুকিয়ে রাখা আছে বর্শা, তরবারী ও তীর-ধনুক। সূর্যাস্তের আগ মুহূর্তে কোথা থেকে যেন আটজন অশ্বারোহী এসে হাজির হয়। এরা সুলতান আইউবীর গেরিলা সৈনিক- দামেস্ক থেকে রণাঙ্গনগামী পথের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা কাফেলা দেখে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য এসেছে।

অশ্বারোহীদেরকে কাফেলার দিকে আসতে দেখে কমান্ডার হাজ্জাজ আবূ ওয়াক্কাস এগিয়ে যান। গেরিলাদের কমান্ডার হলেন আনতানূন। তিনি আবূ ওয়াক্কাসকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কারা এবং কোথায় যাচ্ছেন? আবূ ওয়াক্কাস তাকে ঘটনাটা বিস্তারিত অবহিত করেন। আনতানূন নিশ্চিত হয়ে যান।

গেরিলাদের দেখে অনেকগুলো মেয়ে ছুটে এসে তাদের চারপাশে জড়ো হয়। সকলের একই প্রশ্ন, ময়দানের খবর কী? আনতানূন তাকে জানান, যুদ্ধ এখনো শুরু হয়নি এবং কখন শুরু হবে তাও বলা যায় না।

আনতানূন বলতে বলতে থেমে যান। তার দৃষ্টি একটি মেয়ের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। এক সময় বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, ফাতেমা! তুমি কিভাবে এসেছো?

ফাতেমা অস্থিরচিত্তে এগিয়ে এসে আনতানূনের ডান হাতটা ধরে ফেলে। আনতানূন ফাতেমাকে গোমস্তগীনের হেরেম থেকে বের করে এনেছিলো। আবূ ওয়াক্কাস আনতানূনকে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে ইফতার করবেন এবং খানা খাবেন।

সবাই যার যার কাজে চলে যায়। ফাতেমা আনতানূনকে জয় করে ফেলে। আনতানূন তাকে রাতে একত্র হওয়ার জন্য একটা জায়গা ঠিক করে দেয়।

দামেস্ক থেকে দূরবর্তী এই বিজন অঞ্চলে মাগরিবের আযানের সুললিত সুর ভেসে ওঠে। সবাই ইফতার করে নামায আদায় করে। পরে আহারপর্বও সমাপ্ত করে। সারাদিনের ক্লান্ত সবাই। অনেকে শুয়ে পড়ে। আনতানূন ডিউটি করার নাম বলে সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে একদিকে চলে যায়।

মেয়েদের ভেতর থেকে ফাতেমা চুপি চুপি বের হয়ে আসে। তাঁবু এলাকা থেকে দূরে এক স্থানে দাঁড়িয়ে আনতানূনের অপেক্ষা করছে সে। আনতানূন এসে গেছেন। ফাতেমার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল হাররানে। সে সময় আনতানূন সুলতান আইউবীর গুপ্তচর ছিলেন। হাররানের শাসনকর্তা ও সুলতান আইউবীর দুশমন গোমস্তগীনের হেরেমের মেয়ে বলে তাকে হাত করেছিলো আনতানূন। তাকে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু ঘটনাক্রমে ফাতেমা এক খৃস্টান উপদেষ্টাকে খুন করে ফেলে এবং আনতানূন গ্রেফতার হয়ে পরে ফাতেমাকে নিয়ে পালিয়ে আসেন। সুলতান আইউবী ফাতেমাকে দামেস্ক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং আনতানূন তার আবেদন মোতাবেক গেরিলা বাহিনীতে ভর্তি করে নেন। দীর্ঘদিন পর আজ অনাকাঙ্খিতভাবে ফাতেমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেলে তার মনে তীব্র অনুভূতি জাগে যে, ফাতেমাকে ছাড়া তার জীবন অচল এবং মেয়েটা তার হৃদয়ে গেঁথে গেছে। অপরদিকে ফাতেমার অবস্থাও অনুরূপ।

ফাতেমা ও আনতানূন দু'জনই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। কেউই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কিন্তু এক সময় নিজেকে সামলে নিয়ে আনতানূন বললো– 'ফাতেমা! আমাদের কর্তব্য এখনো পালিত হয়নি। আমি হাররানে আমার দায়িত্ব শেষ করে আসতে পারিনি। তোমাকে সেখান থেকে বের করে আনা আমার কোনো কৃতিত্ব ছিলো না। এটা আমার কর্তব্যও ছিলো না। আমি সুলতান আইউবীর সম্মুখে লজ্জিত। জাতির কাছেও আমার মুখ দেখানোর সুযোগ নেই। দায়িত্ব পালন করতে না পারার কাফফারা স্বরূপ আমি গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছি। সুলতান আইউবী এই সাতজন কমান্ডোর নেতৃত্ব

আমার উপর সোপর্দ করেছেন। তোমাকে আমি অনুরোধ করি, তুমি এরপর পুনরায় আমার গতিরোধ করো না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমাকে কর্তব্য পালনের সুযোগ দাও।'

'আমিও কর্তব্য পালন করতে এসেছি'– ফাতেমা বললো– 'আমি গোমস্তগীনকে হত্যা করতে এসেছি।'

'অসম্ভব'– আনতানূন বললেন– 'মহামান্য সুলতান নারীদেরকে রণাঙ্গন থেকে অনেক দূরে রাখেন। তিনি সম্ভবত তোমাদের প্রত্যেককে ফিরিয়ে দেবেন।'

'আমি ফিরে যাবো না'– ফাতেমা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– 'আমি প্রমাণ করবো, নারী হেরেমের জন্য নয়– জিহাদের জন্য জন্মেছে। আনতানূন! আমাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও। আমার আকাঙ্খাটা তুমি পূর্ণ করো। আমাকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে দাও।'

'এ হতে পারে না'– আনতানূন বললেন– 'আমি যদি তোমাকে সঙ্গে রাখি, তাহলে আমার মনোযোগ তোমার উপর আটকে থাকবে। আমি কর্তব্য পালন করতে ব্যর্থ হবো। আর যদি ধরা খেয়ে যাই, তাহলে একটি মেয়েকে সঙ্গে রাখার অপরাধে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। আমাদের উদ্দেশ্য যতোই পবিত্র ও সৎ হোক না কেন, এই অন্যায় সামান্য নয়। ফাতেমা! যুদ্ধ আবেগ দ্বারা লড়া যায় না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। তুমি যেদিকে যাওয়ার জন্য এসেছো, চলে যাও। হতে পারে, সুলতান তোমাদেরকে জখমীদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন।'

'তারপর আবার কবে কোথায় দেখা হবে?' ফাতেমা জিজ্ঞেস করে।

'যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে হতে পারে; জীবিত কিংবা মৃত'– আনতানূন জবাব দেয়– 'একজন গেরিলা সৈনিক আগাম বলতে পারে না কখন কোথায় থাকবে এবং তার লাশ কোথা থেকে উদ্ধার করা হবে। তাছাড়া গেরিলাদের লাশ পাওয়া যায় না। তারা দুশমনের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তারপরও যদি আমি বেঁচে থাকি, সোজা তোমার নিকট এসে যাবো।'

'এমনও তো হতে পারে যে, তুমি যুদ্ধে আহত হবে আর আমি তোমার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করবো।' ফাতেমা বললো।

'গেরিলা সৈনিকদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা করে শক্ররা'– আনতানূন জবাব দেয়– 'তুমি আবেগপ্রবণ হয়ো না ফাতেমা! আমাদেরকে আবেগ ত্যাগ করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে ভালবাসাও। তুমি যদি এই কামনা করো যে, তুমি কোনো মুসলমানের হেরেমেও যাবে না, দুশমনের হিংস্রতা থেকেও বেঁচে

থাকবে, তাহলে আমার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলো। যুদ্ধের ময়দানে তোমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, তা-ই শুধু পালন করবে। আর তুমি গোমস্তগীনকে হত্যা করতে পারবে না। এই ভাবনাটাও মাথা থেকে ফেলে দাও।'

আনতানূনের কোনো কথাই ফাতেমাকে প্রভাবিত করলো না। না তার অন্তর থেকে গোমস্তগীন হত্যার চিন্তা দূর হলো, না আনতানূনের ভালবাসা।

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবীর তৎপরতা দু'টি। হয় তিনি রণাঙ্গনের মানচিত্র দেখে তাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন, নয়তো ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিজ বাহিনীর মোর্চাগুলো পরিদর্শন করবেন। তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। আসল যুদ্ধটা তিনি হামাতের অভ্যন্তরে লড়তে চাচ্ছেন, যার পরিকল্পনা তাঁর ঠিক করা আছে। কিন্তু একটা সমস্যা হলো, ডান পার্শ্বে টিলার সংখ্যা বেশি নয়। তার পিছনে খোলা মাঠ। দুশমন সেই পথে বেরিয়ে যেতে কিংবা সেদিক থেকে এসে ক্ষতিসাধন করতে পারে। আর তাতে সুলতান আইউবীর সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার আশংকা বিদ্যমান। তাঁর কাছে এতো সৈনিকও নেই যে, তিনি এই ময়দানে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর দেয়াল তৈরি করে ফেলতে পারবেন। পার্শ্ববর্তী টিলার উপর তিনি তীরান্দাজ বসিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এতোটুকু আয়োজন যথেষ্ট নয়। ময়দানের জন্য তিনি দুই ইউনিট আরোহী ও পদাতিক বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছেন। কিন্তু তাদেরকে এখনো লুকিয়ে রেখেছেন। এই ময়দানই সুলতান আইউবীকে বেশি অস্থির করে তুলছে। তাছাড়া আরো একটা বিশেষ বাহিনী তিনি তৈরি করে নিজের কাছে রেখেছেন।

সুলতান আইউবী একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক পর্যবেক্ষণ করছেন। এমন সময় দূরদিগন্তে তিনি ধূলি উড়তে দেখতে পান। একজন সৈনিক এই ধূলির তাৎপর্য ভালোভাবেই বুঝে। সুলতান বুঝে ফেললেন, কোনো অশ্বারোহী বাহিনী এগিয়ে আসছে। ধূলির বিস্তৃতি দেখে বুঝা যাচ্ছে ঘোড়াগুলো এক সারিতে নয়– চার কিংবা ছয় সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে সুবিন্যস্তরূপে অগ্রসর হচ্ছে। এই বাহিনী দুশমন ছাড়া আর কারো হতে পারে না। সুলতান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'এই পথে কি আমাদের একজন লোকও ছিলো না। প্রস্তুতির নির্দেশ দাও।'

প্রস্তুতির ঘণ্টা বেজে ওঠে। প্রতিরক্ষার জন্য যে পদ্ধতিতে প্রস্তুত হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো, তারা সে পদ্ধতিতেই প্রস্তুত হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর ঘোড়া চোখে পড়তে শুরু করে। কিন্তু তাদের চলন শত্রু কিংবা আক্রমণকারীসুলভ নয়। সুলতান আদেশ করেন, দু'-চারজন অশ্বারোহী এগিয়ে গিয়ে জেনে আস, তারা কারা? কয়েকজন অশ্বারোহী ছুটে যায়। ফিরে এসে তারা দূর থেকেই চিৎকার করে বলতে শুরু করে– 'দামেস্ক থেকে স্বেচ্ছাসেবী এসেছে। সঙ্গে নারী ফৌজও আছে।'

'নারী ফৌজ?'– কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে যায় সুলতান আইউবীর। কণ্ঠে বিস্ময়– 'নারী ফৌজ!' কিছুক্ষণ নীরব থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'এই বাহিনী আমার বিধবা বোনটি গঠন করে পাঠিয়ে থাকবেন। জঙ্গী মরহুমের বিধবাই এ কাজ করতে পারেন।'

সুলতান আইউবী হাসতে শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, সুলতান অতীতে কখনো এতো হাসেননি। হাসতে হাসতে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি উৎফুল্লচিত্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মান সালারদের বলতে শুরু করলেন– 'আমার জাতির মেয়েরা তোমাদেরকে সফলকাম না করে নিঃশ্বাস ফেলবে না। এই কিশোরীগুলোর ইজ্জতের জন্য আমরা কেনো জীবন বিলিয়ে দিচ্ছি না। কিন্তু... কিন্তু আমি তাদেরকে ফিরিয়ে দেবো। একটি মেয়েও যদি শত্রুর হাতে চলে যায়, তাহলে আমি মরেও শান্তি পাবো না।'

টিলার উপর থেকে নেমে সুলতান আইউবী সামনের দিকে এগিয়ে যান। নারীফৌজ ও পুরুষ স্বেচ্ছাসেবীদের কাফেলাটি নিকটে চলে আসে। কমান্ডার আবু ওয়াক্কাস ঘোড়া থেকে নেমে সুলতান আইউবীর নিকট চলে যান। তিনি সালাম দিয়ে নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর পত্রখানা সুলতানের হাতে তুলে দেন। সুলতান পত্র পাঠ করতে শুরু করেন–

'আমার ভাই! আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন। আমার স্বামী জীবিত থাকলে আজ আপনাকে এতোগুলো দুশমনের সম্মুখে একা থাকতে হতো না। আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারছি না। যা সম্ভব ছিলো, আপনার সমীপে পেশ করলাম। এই মেয়েগুলোকে আমি আহতদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছি। বিপুল পরিমাণ ঔষধপত্রও পাঠিয়ে দিলাম। সঙ্গে একশত পুরুষ স্বেচ্ছাসেবী প্রেরণ করলাম। প্রবীণ যোদ্ধারা এদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রত্যেককে কমান্ডো আক্রমণের অনুশীলনও প্রদান করেছে। সবাই উদ্দীপ্ত-উজ্জীবিত। আমি জানি, আমার মেয়েগুলোকে ময়দানে প্রেরণ করা আপনি পছন্দ করবেন না। আমি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত আছি। কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে, যদি আপনি এদেরকে ফেরত

পাঠিয়ে দেন, তাহলে দামেস্কবাসীর মন ভেঙ্গে যাবে। এই নগরীর লোকদের মাঝে কিরূপ চেতনা বিরাজ করছে, আপনি তা জনেন না। পুরুষরা ময়দানে যেতে প্রস্তুত। নারীরা আপনার নেতৃত্বে লড়াই করতে অস্থির। এই বাহিনীকে সকল নগরবাসী পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে বিদায় করেছে। এখানকার শিশু-কিশোররাও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। আপনার সৈন্যের অভাব থাকবে না।'

সুলতান আইউবী পত্রখানা পাঠ করেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি মেয়েগুলোর প্রতি চোখ তুলে তাকান। ওরা মেয়ে বটে; কিন্তু ঘোড়ার পিঠে তাদেরকে সৈনিক বলেই মনে হচ্ছে। সুলতান আইউবী তাদের সবাইকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নিজের সম্মুখে দাঁড় করান। তিনি বললেন–

'আমি তোমাদের প্রত্যেককে যুদ্ধের ময়দানে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমাদের জযবার মূল্য আমি পরিশোধ করতে পারবো না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপযুক্ত বিনিময় দান করবেন। মেয়েদের যুদ্ধের ময়দানে ডেকে আনবো আমি কখনো ভাবিনি। আমার ভয় হচ্ছে, ইতিহাস বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবী নারীদের দিয়ে যুদ্ধ করিয়েছেন। তবে আমি তোমাদের চেতনাকে বিক্ষতও করতে পারি না। তোমাদের মধ্যে যদি কোনো মেয়ে এমন থাকে যে স্বেচ্ছায় আসেনি, সে আলাদা সরে দাঁড়াও। আর তারাও আলাদা হয়ে যাও, যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ কিংবা ভীতি আছে?'

কিন্তু মেয়েদের কেউই সরে দাঁড়ালো না।

সুলতান আইউবী বললেন–

'আমি তোমাদেরকে নিরাপদ স্থানে রাখবো। যুদ্ধের সময় আমি তোমাদেরকে সামনে যেতে দেবো না। তারপরও ভূখণ্ডটা এমন যে, তোমরা দুশমনের নাগালে এসে যেতে পারো। কেউ বর্শার আঘাতে মারাও যেতে পারো। এমনও হতে পারে, তোমাদের কেউ দুশমনের হাতে ধরা পড়ে যাবে। এ কথাও শুনে রাখো যে, তীর-তরবারী ও বর্শার জখম খুবই গভীর ও গুরুতর হয়ে থাকে।'

এক মেয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো– 'আপনি ইতিহাসকে ভয় করছেন আর আমরাও ইতিহাসকে ভয় করছি। আমরা যদি ফিরে চলে যাই, তাহলে ইতিহাস বলবে, জাতির মেয়েরা সুলতান আইউবীকে একাকী ময়দানে ফেলে ঘরে বসেছিলো।'

অপর এক মেয়ে বললো, 'আল্লাহ্ সালাহুদ্দীন আইউবীর তরবারীতে আরো

শক্তি দান করুন। আমরা হেরেমের জন্য জন্মাইনি।'

আরেক মেয়ে বললো– 'তিন চাঁদ আগে আমার বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। আপনি যদি আমাকে ফেরত দেন, তাহলে আমি আমার স্বামীকে নিজের জন্য হারাম মনে করবো।'

'তোমার স্বামী নিজে কেন আসেনি?' সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন– 'সে তার স্ত্রীকে কেনো পাঠিয়ে দিয়েছে?'

'তিনি আপনার ফৌজেই আছেন।' মেয়েটি জবাব দেয়।

এবার সবগুলো মেয়ে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। তারা তাদের জোশ ও জযবার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। হৈ-চৈ কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসলে এক মেয়ে বলে উঠলো– 'মহামান্য সুলতান! আপনি আমাদেরকে যুদ্ধ করার সুযোগ দিন; আমরা আপনাকে নিরাশ করবো না।'

'আমি তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেবো, এ কথা তোমরা ভুলে যাও'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি তোমাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করবো।'

সুলতান আইউবী সেদিনই মেয়েদেরকে চার-চারজনের দলে বিভক্ত করে দেন। প্রতিটি দলের সঙ্গে একজন করে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োজিত করেন। স্বেচ্ছাসেবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছিলো, তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সুলতান আইউবী তাদের সেবা-শশ্রুষার কাজে নিয়োজিত করেন। কেননা, তারা নিয়মিত সৈনিক নয়। ফৌজের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। সুলতান আইউবী তাদেরকে সেই সৈনিকদের হাতে তুলে দেন, যারা শহীদদের লাশ ও আহত সৈনিকদের তুলে আনা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা মেয়ে এবং স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ শুরু করে দেয়।

ফাতেমা, মানসূরা, হুমাইরা ও সাহার পড়ে একদলে। তাদের একদলে একত্রিক হওয়া একটি অলৌকিক ব্যাপার। কেননা, তারা দামেস্কও এসেছিলো একসঙ্গে। হৃদয়ের বাসনা, জ্বলন এবং চেতনাও তাদের অভিন্ন। তাদের দলের স্বেচ্ছাসেবীর নাম আযর ইবনে আব্বাস। আযরের ক্ষুদ্র তাঁবুটি আলাদা। তার সন্নিকটেই স্থাপন করা হয়েছে চার মেয়ের বড় তাঁবু। এই চার মেয়ের মধ্যে খতীবের কন্যা অন্যদের তুলনায় সবল, বুদ্ধিমতি ও চতুর। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মানসূরা দেখতে পেলো, আযর একটি টিলার

উপর উঠে এদিকে-ওদিক তাকাতে শুরু করেছে। দেখে সেও উপরে চলে যায় এবং ইতিউতি তাকায়। উপত্যকা ও পাহাড়ের ঢালুতে সৈনিক দেখা যাচ্ছে। আযর মানসূরাকে বললো, এসো আমরা আরো একটু সম্মুখে যাই। মানসূরা আযরের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। আযর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং পাহাড়ী এলাকার প্রশংসা করতে শুরু করে।

আযর সুদর্শন যুবক। কথাবার্তা বেশ আকর্ষণীয়। মানসূরার সঙ্গে রসালাপ করতে শুরু করে সে। মানসূরাও তাতে স্বাদ নিতে আরম্ভ করে। তারা সূর্যাস্তের আগে আগেই ফিরে আসে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আযর মানসূরার অন্তরে বাসা বেঁধে ফেলে।

ইফতারের পর মেয়েরা তাদের তাঁবুতে বসে আহার করছে। ফৌজের এক কমান্ডার তাঁবুর ভেতর উঁকি দিয়ে তাকায় এবং মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করে– 'কোন অসুবিধা নেই তো?' মেয়েরা জানায়– না, আমাদের কোন সমস্যা নেই। কমান্ডার ফিরে যায়।

সে সময় আযর বাইরে দাঁড়ানো ছিলো। সে কমান্ডারের সাথে কথা বলতে থাকে। মানসূরা তাদের কথোপকথন শুনছিলো। আযর কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করে, 'এই সামান্য ফৌজ দ্বারা সুলতান তিনটি বাহিনীর মোকাবেলা কিভাবে করবেন?'

'দুশমনের জন্য ফাঁদ বসানো আছে। যুদ্ধ সেই ময়দানে হবে না, যে ময়দানে হবে বলে দুশমন মনে করছে। আমরা তাদেরকে টেনে সেই জায়গায় নিয়ে যাবো, যেখানে তাদের জন্য আমরা ফাঁদ প্রস্তুত করে রেখেছি।' কমান্ডার আযরের আবেগে প্রভাবিত হয়ে বলে দেয়, সুলতান আইউবী তার ফৌজকে কোথায় কিভাবে বণ্টন করেছেন এবং তিনি কী করবেন। মিশরের রিজার্ভ বাহিনীর কথাও বলে ফেলে কমান্ডার।

সে রাতের ঘটনা। মধ্যরাতে মানসূরার চোখ খুলে যায়। আযর ইবনে আব্বাসের তাঁবু থেকে কথার শব্দ শুনতে পায়– 'তোমরা এখনই বেরিয়ে যাও। কিছু বিষয় তোমরা নিজেরা জেনে নিয়েছো। বাকি তথ্য আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছি। আমার পক্ষে এখান থেকে বের হওয়া সম্ভব ছিলো না। ভালোই হলো যে, তোমরা এসে গেছো। এবার রাস্তা চিনে নাও।'

আযর পথের বিবরণ দিয়ে বললো– 'তুমি পায়ে হেঁটে যাচ্ছো। পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। ফাঁদ প্রস্তুত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে ঢোকা যাবে না। আল্লাহ হাফেজ।'

মানসূরা এক ব্যক্তির পায়ের শব্দ শুনতে পায়। লোকটি চলে গেছে। মেয়েটি তাঁবুর দরজা সামান্য ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকায়। আযর তার তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে একদিকে চলে যায়। মানসূরা তার তাঁবুর কাউকে না জাগিয়েই সামান থেকে খঞ্জরটা বের করে বেরিয়ে পড়ে।

আকাশে হালকা মেঘ। ফলে জোৎস্না রাত হওয়া সত্ত্বেও কিছুটা অন্ধকার দেখাচ্ছে। আযরকে ছায়ার মতো দেখতে পাচ্ছে মানসূরা। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আড়ালে আড়ালে আযরকে অনুসরণ করছে সে। আযর একটি টিলার কোল ধরে সম্মুখপানে হাঁটতে শুরু করে। মানসূরাও একই পথ ধরে এগুতে থাকে। পথে কোনো সান্ত্রী কিংবা অন্য কোনো সৈনিক চোখে পড়ছে না। তাতে মানসূরা বুঝে ফেলে, নারী সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবীদের তাঁবু সম্মুখের মোর্চাগুলো থেকে অনেক পেছনে স্থাপন করা হয়েছে এবং তার পেছনে আর কোনো ফৌজ নেই। কিন্তু সেখানে কয়েকটি স্থানে যে ফৌজ বিদ্যমান, মানসূরার তা অজানা। কিন্তু আযর আগন্তুককে এমন পথ বলে দিয়েছে, যে পথে কোনো ফৌজ তাকে দেখতে পাবে না। আযর দু'টি টিলার মধ্যকার সরু একটি গলির অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। মানসূরা প্রথমে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। সেও তাতে প্রবেশ করে।

সম্মুখে গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ সমতল ভূমি। আযর কোনো একটি গাছের আড়ালে গিয়ে থেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার হাঁটছে। মানসূরাও একই ধারায় অগ্রসর হচ্ছে।

বেশকিছু পথ অতিক্রম করার পর এখন আবার পাহাড়ের পাদদেশ। আযর এগিয়ে চলছে। মানসূরাও তাকে অনুসরণ করছে। পাহাড়টির অভ্যন্তরে একটি গিরিপথ। আযর তাতে ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়ে মানসূরাও।

গিরিপথে ঢোকামাত্র হিমশীতল বাতাসের ঝাপটায় মানসূরার পা উপড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তার দেহ নির্জীব হতে শুরু করে। আযরের মনে কী যেন সংশয় জাগে। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পেছন দিকে ফিরে তাকায়। তৎক্ষণাৎ মানসূরা বিশাল একটি পাথরের আড়ালে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আযর আবার সম্মুখপানে এগুতে শুরু করে। মানসূরা উঠে দাঁড়ায় এবং পাহাড়ের ছায়াটা যেদিকে গিয়ে পড়েছে, মানসূরা সেদিকে এগিয়ে যায়।

গিরিপথ থেকে বের হওয়ার পর এখন খোলা মাঠ। আযর দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। মানসূরাও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সে তো মহিলা। তদুপরি এতোক্ষণ বহু পথ অতিক্রম করেছে সে। একদিকে প্রচণ্ড শীত, অপরদিকে

পায়ের তলে কংকর। মানসূরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

এটা একটা আবেগ, যা মানসূরাকে আযরের পশ্চাতে হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছে। এবার তার মনে ভাবনা জাগে, এই পশ্চাদ্ধাবনের ফল কী দাঁড়াবে। আযর যদি দৌড় দেয়, তাহলে মানসূরা তার সঙ্গে পেরে উঠবে না। কিন্তু আযরের প্রতি মানসূরার সন্দেহ বাস্তব। আযর দুশমনের দিকেই যাচ্ছে। মানসূরা তাকে ধাওয়া করছে ঠিক; কিন্তু তাকে কিভাবে ধরবে বা ধরাবে, ভেবে দেখেনি। এখন তো আযর হাঁটছে খুব দ্রুত। এই পরিস্থিতিতে তাকে ধরতে গেলে মুখোমুখি মোকাবেলা করতে হবে। মানসূরার কাছে খঞ্জর আছে। আছে খঞ্জর ব্যবহারের প্রশিক্ষণও। কিন্তু দুশমনের মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা তার নেই। এই দুশমন স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী। মানসূরা কি পারবে পরাস্ত করে তাকে ধরে ফেলতে!

মানসূরা ভাবছে আর দ্রুত হাঁটছে। হঠাৎ আযর থেমে যায়। সে পেছনে ফিরে তাকায়। মানসূরার নিকটে একটি গাছ ছিলো। সে দ্রুত গাছটির আড়ালে চলে যায়। গাছের স্থানটা সামান্য উঁচু। আশপাশটা পাথরে পরিপূর্ণ। মানসূরা পাথরের পেছনে নেমে পড়ে। রাতের নীরবতায় পাথরের শব্দ কানে আসে আযরের। আযর পেছন দিকে ফিরে আসে। মানসূরা তার আগমন দেখে ফেলে। সে উঠে না দাঁড়িয়ে গাছটির পিছনে শক্ত করে ধারণ করে। আযর গাছটির একেবারে নিকটে চলে আসে। মানসূরা দেখতে পায় তার হাতে খাপখোলা তরবারী। গাছটি অতিক্রম করে আযর সামান্য এগিয়ে গেলে মানসূরা পেছন দিকে থেকে খপ করে তার দু'পায়ের গোড়ালী ধরে ফেলে পূর্ণ শক্তিতে পেছন দিকে ঝটকা টান দেয়। আযর উপুড় হয়ে সম্মুখ দিকে পড়ে যায়। পরক্ষণেই মানসূরা তার পিঠের উপর কনুই চাপা দিয়ে ডান হাতে খঞ্জরের আগাটা তার ঘাড়ে স্থাপন করে। ঘটনাটা দু' থেকে তিন সেকেন্ডের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যায়।

কনুই আর দেহের সমস্ত ওজন দিয়েও তাগড়া একটা যুবককে কাবু করা একটা মেয়ের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু ঘাড়ের উপর খঞ্জরের আগা আযরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। তার তরবারীটা হাত থেকে ছুটে পড়ে যায়।

'তুমি কে?' উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অসহায় অবস্থায় জিজ্ঞেস করে আযর।

'যার হাত থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না।' মানসূরা বললো।

'তুমি কি নারী?'

'হ্যাঁ'– মানসূরা জবাব দেয়– 'আমি নারী, তোমার পরিচিত এক নারী।

আমার নাম মানসূরা।'

'উহ্, পাগলী মেয়ে!' –আযর হেসে বললো– 'তুমি ঠাট্টা করছো? আমি তো ভয় পেয়ে গেছি। ঘাড় থেকে খঞ্জর সরাও। ওটা চামড়ায় ঢুকে যাচ্ছে।'

'এটা ঠাট্টা নয় আযর। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

'আল্লাহর কসম! আমি অন্য কোনো মেয়ের পেছনে যাচ্ছিলাম না'– আযর বন্ধুসুলভ কণ্ঠে জবাব দেয়– 'তোমার চেয়ে ভালো মেয়ে আছে বলে আমি মনে করি না। আমি তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছি না।'

'আমাকে নয়, তুমি আমার জাতিকে ধোঁকা দিচ্ছো'– মানসূরা বললো– 'তুমি আমাকে সবচেয়ে ভালো মেয়ে মনে করছো। আর আমি তোমাকে সবচেয়ে ভালো পুরুষ মনে করতাম। কিন্তু এখন না তুমি আমার কাছে ভালো, না আমি তোমার কাছে ভালো। কর্তব্যের কাছে আবেগ পরাজিত হয়েছে। তুমি তোমার দায়িত্ব পালনে যাচ্ছো আর আমি আমার কর্তব্য পালন করছি। তুমি যদি আমার স্বামী, আমার দেহ ও আত্মার মালিক কিংবা আমার সন্তানদের পিতা হতে, তবুও আমার খঞ্জর তোমার ঘাড় স্পর্শ করতো।'

'আচ্ছা, তুমি আমাকে কী মনে করে ফেলে দিয়েছ?' আযর জিজ্ঞেস করে।

'নামের মুসলমান আর খৃস্টানদের চর মনে করে'– মানসূরা জবাব দেয়– 'তুমি খৃস্টান বন্ধুদের বলতে যাচ্ছো যে, সাবধানে আক্রমণ চালাবে এবং পর্বতমালার অভ্যন্তরে ঢুকবে না।'

'তুমি আসলে জানোই না চর কাকে বলে'– আযর বললো– 'আমি দুশমনকে পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছিলাম।'

'আমি জানি, গুপ্তচর কেমন হয়ে থাকে'– মানসূরা বললো– 'আমি অনেক বড় এক গোয়েন্দার কন্যা। ইব্‌নুল মাখদূম কাকবূরীর নাম কখনো শুনেছো? তিনি মসুলের খতীব ছিলেন। আমি তাঁরই দলের গোয়েন্দা। আমি আমার পিতাকে মসুলের কারাগারের পাতাল কক্ষ থেকে বের করে এনেছি এবং নিজে তাঁর সঙ্গে মসুল থেকে পালিয়ে এসেছি। তুমি আনাড়ী গুপ্তচর। অভিজ্ঞ গুপ্তচররা দূরে গিয়ে কথা বলে। কারো তাঁবুর নিকট দাঁড়িয়ে গোপন কথা বলে না। তুমি স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এসেছিলে। এখন এখানে কী করছো?'

'আমার উপর থেকে সরে যাও'– আযর বললো– 'খঞ্জর সরাও। আমি একটি জরুরী কথা বলতে চাই।'

'তোমার যবান মুক্ত'– মানসূরা বললো– 'বলো, জরুরী কথা বলো। আমি শুনছি।'

আযর চুপ হয়ে যায়। তার দেহটা নির্জীব হয়ে গেছে। নিজের মাথাটা মাটির সঙ্গে লাগিয়ে দেয়। মানসূরার সম্মুখে এখন প্রশ্ন– তাকে বাঁধবে কিভাবে এবং কিভাবেই এখান থেকে তাকে নিয়ে যাবে। আযরকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে তা কঠিন ছিলো না। কিন্তু মানসূরা তাকে জীবিত সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে যেতে চায়। গুপ্তচরদের জীবিত গ্রেফতার করাই নিয়ম মানসূরার তা জানা আছে। হঠাৎ তার মাথায় ভাবনা আসে যে, আশপাশে কোথাও তাদের সৈনিক থাকতে পারে। তাই মানসূরা সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চস্বরে একটা চিৎকার দেয়– 'কেউ থাকলে এদিকে আসো। আসো, আসো, আসো।'

নির্জীব পড়ে থাকা আযর হঠাৎ এতো জোরে নড়ে উঠে যে, তার পিঠের উপর কনুই চাপা দিয়ে বসে থাকা মানসূরা একদিকে পড়ে যায়। আযর তরবারীর প্রতি হাত বাড়ায়। মানসূরা বিদ্যুৎগতিতে উঠে পেছন দিক থেকে আযরকে এমনভাবে ধাক্কা দেয় যে, সে সামনের দিকে পড়ে যায়। মানসূরা তারবারীটা তুলে নেয়। আযর উঠে দৌড় দেয়। তার পক্ষে এই পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার চেয়ে জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়া বেশী আবশ্যক। মানসূরা চিৎকার করতে করতে তার পেছনে দৌড়াতে শুরু করে। তার পায়ে বিড়ালের শক্তি এসে গেছে। দূরে কোথাও পেট্রোল সেনারা টহল দিচ্ছিলো। তারা মানসূরার চিৎকার শুনতে পেয়ে ছুটে আসে।

সামনে নদী। আযরকে থেমে যেতে হলো। মানসূরা পৌঁছে যায়। দু'জন সান্ত্রীও এসে পড়ে। আযর নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানসূরা চিৎকার করে ওঠে– 'ওকে যেতে দিও না, গুপ্তচর। জীবিত ধরে ফেলো।'

সান্ত্রীরাও নদীতে ঝাপ দেয়। তারা আযরকে ধরে ফেলে। কিন্তু একটি মেয়েকে দেখে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা ভাবে এটা অন্য কোন ব্যাপার হবে। তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে মানসূরা নিজের পরিচয় প্রদান করে এবং রণাঙ্গনে কিভাবে এসেছে তার বিবরণ দেয়। মানসূরা জানায়, এই লোকটি স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এসেছিলো। কিন্তু লোকটি সন্দেহভাজন। একে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট নিয়ে চলো।

'শোনো বন্ধুগণ!'– আযর সান্ত্রীদের বললো– 'এখানে তোমরা কী পাও? ক'টা টাকা আর দু'বেলার রুটির জন্য এখানে তোমরা মরতে এসেছো। আমার সঙ্গে চলো, তোমাদেরকে রাজপুত্র বানিয়ে দেব। এর মতো মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দেবো। সম্পদ দ্বারা লাল করে দেবো।'

'যাবো'– এক সান্ত্রী বললো– 'তবে তার আগে তুমি আমাদের সঙ্গে চলো।

তুমিও চলো মেয়ে! ওখানে নিয়ে দেখবো, এই লোক গোয়েন্দা, নাকি তুমি। নাকি দু'জন এখানে ফস্টিনস্টি করতে এসেছিলে।'

সুলতান আইউবীর তাঁবুর সামান্য দূরে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর তাঁবু। সান্ত্রীরা আযর ও মানসূরাকে তাদের কমান্ডারের নিকট নিয়ে যায়। কমান্ডার তাদেরকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর নিকট নিয়ে যান। হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে ঘুম থেকে তুলে আযরকে তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়। মানসূরা হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে সমস্ত কাহিনী শোনায়। পশ্চাদ্ধাবনের ঘটনাও সবিস্তারে বিবৃত করে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ মানসূরাকে নিরীক্ষার সাথে দেখে বললেন– 'তোমার চেহারাটা আমার কাছে অপরিচিত নয়। তুমি সম্ভবত মসুল থেকে পালিয়ে এসেছিলে। তোমার সঙ্গে মসুলের খতীব ইবনুল মাখদূমও ছিলেন?'

'আমি তাঁর মেয়ে।' মানসূরা বললো।

'তুমি আমার বিস্ময় দূর করে দিয়েছ'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'আমাদের মেয়েরা তোমার চেয়ে সাহসী হতে পারে; কিন্তু এরকম বুদ্ধিমত্তা কমই পাওয়া যায়, যার প্রমাণ তুমি দিয়েছো।'

'আমাকে আমার আব্বাজান প্রশিক্ষণ দিয়েছেন'– মানসূরা বললো– 'আমার কানে মাত্র দু'টি বাক্য প্রবেশ করে আর আমি বুঝে ফেলি ব্যাপারটা কী ঘটছে।'

আযরের পোশাক তল্লাশি করা হয়। ভেতর থেকে এক খণ্ড কাগজ বেরিয়ে আসে, যাতে এই যুদ্ধে সুলতান আইউবীর বাহিনীর বিন্যাস-পজিশনের নক্শা অংকিত আছে। আঁকা-বাঁকা দাগ টেনে হামাত শিং-এর চিত্র আঁকা আছে এই কাগজে। অস্পষ্ট বুঝা গেলো। সুলতান আইউবীর পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা দুশমনের কাছে যাচ্ছিলো।

'আযর ভাই!'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আযরকে কাগজগুলো দেখাতে দেখাতে বললেন– 'এরপরও যদি সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে, তাহলে বলো, আমি তোমাকে মুক্ত করে দেবো। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাকো, তবে বলো, আমাকে নিশ্চয়তা দাও। আচ্ছা, তুমি কি মুসলমান?

'মহান আল্লাহর কসম।'

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আযরের মুখের উপর সজোরে একটা ঘুষি মারেন। আযর কয়েক পা পেছনে চিৎ হয়ে পড়ে যায়। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ধীর

অথচ রোষ কষায়িত কণ্ঠে বললেন– 'চরবৃত্তি করছো কাফেরদের, আর কসম করছো আমাদের মহান আল্লাহর নামে। আমি তোমাকে একথা জিজ্ঞেস করছি না যে, তুমি গুপ্তচর কিনা। আমি জানতে চাচ্ছি, এখানে তোমার সহকর্মী কারা। তাদের নাম বলো, আস্তানার ঠিকানা বলো।'

'আমি মুসলমান'– আযর অনুনয়ের স্বরে বললো– 'আমি আপনাকে সব বলে দেবো। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবো।'

'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'এ মুহূর্তে আমার উপর কোনো শর্ত আরোপ করার অধিকার তোমার নেই।'

'আমি একা, এখানে আমার কোন সহকর্মী নেই।' আযর হঠকারী উত্তর দেয়।

'এই মেয়েটি তোমার তাঁবুতে যে লোকটিকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিলো, সে কে?' হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করে।

'আমি তাকে চিনতে পারিনি'– আযর জবাব দেয়– 'সে অন্ধকারে এসে অন্ধকারেই ফিরে গিয়েছিলো।'

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর দু'জন লোককে ডেকে বললেন– 'একে নিয়ে যাও। এর সহকর্মী কারা, তারা কোথায় অবস্থান করছে জিজ্ঞেস করো।' মানসূরাকে বললেন– 'তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো। ফজরের পর তোমাকে তলব করবো।'

❖ ❖ ❖

ফজর নামাযের পর সুলতান আইউবী এসে উপস্থিত হন। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর সঙ্গে। হাসান সুলতানকে জানান, খতীব ইবনুল খামদূমের কন্যা রাতে একজন গুপ্তচর ধরে নিয়ে এসেছে। তিনি পুরো ঘটনা বিবৃত করলে সুলতান বললেন– 'ইসলামের কন্যাদের কাজ এমনই হয়ে থাকে। আমরা যদি আমাদের কালেমাপড়া দুশমনকে রক্তে লেখা পাঠ না পড়াই, তাহলে তারা জাতির কন্যাদের প্রতিভা নিঃশেষ করে দেবে। আচ্ছা, গুপ্তচর কোথায়?'

'আপনি এখনই তাকে দেখতে পাবেন না'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'তার কক্ষটা শূন্য করার পর আমি তাকে আপনার নিকট নিয়ে আসবো। সুদর্শন এক যুবক। দামেস্কের অধিবাসী বলে দাবি করছে। এখানে স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এসেছিলো।'

আযর একটি বৃক্ষের সঙ্গে ঝুলে আছে। মাথাটা নীচের দিকে আর পা দু'টো উপর দিকে। মাটি থেকে মাথা এক-দেড় গজ উপরে। নীচে অঙ্গার জ্বলছে।

এক সৈনিক কিছুক্ষণ পরপর আগুনের মধ্যে কি যেন নিক্ষেপ করছে, যার ধোঁয়ায় আযর ছটফট করছে ও কাঁশছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে আনেন। চোখ দু'টো ফুলে গেছে। শরীরের সমস্ত রক্ত মুখমণ্ডলে নেমে এসেছে। বাঁধন খুলে দেয়ার পর আযর দাঁড়াতে পারলো না। কিছুক্ষণ অচেতন অবস্থায় মাটিতে পড়ে রইলো। মুখে পানির ছিটা দেয়া হলো। খানিক পর চোখ খুললে হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'মাত্র শুরু। না বলো যদি, তাহলে এক এক করে দেহের প্রতিটি জোড়া আলাদা করে ফেলবো।'

আযর পানি প্রার্থনা করে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'পানি নয়, দুধ পান করাবো। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।' এক সৈনিককে বললেন– 'এক গ্লাস দুধ আর একটি ঘোড়া ও একখানা রশি নিয়ে আসো। রশির এক মাথা তার পায়ের সঙ্গে, অপর মাথা ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধো।'

আযর দু'ব্যক্তির নাম বলে। দু'জনই স্বেচ্ছাসেবী। এর মধ্যে রাতের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট লোকটিও আছে। সে দামেস্কের আস্তানার ঠিকানাও বলে দেয়। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তৎক্ষণাৎ উভয় স্বেচ্ছাসেবীকে ধরে আনার নির্দেশ দেন এবং আযরকে সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে যান।

'বাড়ী কোথায়?'

'দামেস্ক।'

'কার ছেলে?'

আযর এক জাগিরদারের নাম বলে।

'আমি সম্ভবত তাকে চিনি?' সুলতান আইউবী বললেন– 'তিনি কি দামেস্কে আছেন?'

'আল-মালিকুস সালিহ যখন দামেস্ক থেকে পলায়ন করেন, তখন তিনিও হাল্ব চলে গেছেন।' আযর জবাব দেয়।

'আর তোমাকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য রেখে গেছেন।' সুলতান আইউবী বললেন।

'না, আমি নিজেই দামেস্ক থেকে গেছি'– আযর বললো– 'পরে আব্বাজান হাল্ব থেকে এক লোকের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করেন, আমি যেন গুপ্তচরবৃত্তি করি। আমি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা এবং দিক-নির্দেশনাও পেয়েছিলাম।' হাতজোড় করে আযর সুলতান আইউবীকে অনুনয়ের সঙ্গে বললো– 'আমি মুসলমান। আমার পিতা আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন। এখন আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখুন। আমি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।'

'আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি

আল্লাহর বিধানে হাত দিতে পারি না। আমি শুধু এটুকু দেখতে চেয়েছিলাম, সেই লোকটা কেমন মুসলমান, একটি নারী যার হাত থেকে ছিনিয়ে তরবারী নিয়ে তাকে ধরে ফেললো। আচ্ছা, তুমি এখানে কী কী দেখেছো?'

'এখানে আমি বহু কিছু দেখেছি'– আযর জবাব দেয়– 'অবশিষ্ট তথ্য আমার সেই দুই সঙ্গী দিয়েছে, যারা পূর্ব থেকেই এখানে অবস্থান করছিলো। আমাকে মিনজানীক এবং তীরান্দাজদের অবস্থান জানবার জন্য বলা হয়েছিলো। আমি তা দেখে নিয়েছি।'

'তোমার আগে তোমার কোনো সঙ্গী কি এখান থেকে তথ্য নিয়ে গেছে?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞাসা করেন।

'না'– আযর জবাব দেয়– 'আমরা তিনজন ছাড়া এখানে আমাদের আর কোনো সঙ্গী নেই।'

'তোমার কি জানা আছে, তুমি কত সুদর্শন ও সুঠাম দেহের অধিকারী?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞাসা করেন– 'আর তুমি কি জানো, মেয়ে হয়েও কিভাবে ও তোমাকে ফেলে দিয়েছিলো?'

'সে যদি পেছন দিক থেকে আমার উভয় পায়ের গোড়ালি ধরে না ফেলতো, তাহলে আমি পড়তাম না।' আযর জবাব দেয়।

'তারপরও তুমি পড়ে যেতে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যাদের ঈমান বিক্রি হয়ে যায়, তারা অনায়াসেই পড়ে যায়। আর তারা তোমার মতো উপুড় হয়েই পড়ে থাকে। তুমি যদি সত্য ও ঈমানওয়ালাদের সঙ্গে থাকতে, তাহলে দশজন কাফির মিলেও তোমাকে ফেলতে পারতো না। আসল শক্তি বাহু আর তরবারীর নয়; আসল শক্তি ঈমানের।'

'আপনি আমাকে একটিবার সুযোগ দিন।' আযর বললো।

'সেই সিদ্ধান্ত দামেস্কের বিচারপতি নেবেন'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি তোমার সঙ্গে এসব কথা এ জন্য বলছি যে, তুমি মুসলমান। তোমাকে আমাদের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু তুমি ওদিকে চলে গেছো। আমি জানি, দামেস্কের দু'-চারটা মেয়ে তোমার ভালোভাসায় বিভোর। চেহারা-শরীরে তুমি এর উপযুক্ত যে, মেয়েরা তোমাকে ভালোবাসবে। কিন্তু এখন সেসব মেয়ে তোমার মুখে থু থু নিক্ষেপ করবে। আল্লাহও তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। দামেস্কের কাজী তোমাকে কী শাস্তি দেবেন, আমি তা বলতে পারবো না। তিনি যদি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন, তাহলে সে পর্যন্ত যে ক'দিন বেঁচে থাকবে, আল্লাহর নিকট পাপের জন্য প্রার্থনা করতে থাকো।

অন্ততপক্ষে মৃত্যুর আগে মুসলমান হয়ে যাও।'

'আমার পিতাকে শাস্তি দেবেন?' আযর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– 'এই পাপের উৎসাহ তো আমাকে তিনিই দিয়েছিলেন। তিনিই আমার অন্তরে প্রলোভন ঢুকিয়েছেন। তিনিই আমার হৃদয় থেকে ঈমান বের করে ফেলেছিলেন।'

'আল্লাহর বিধান তাকে ক্ষমা করবে না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'দৌলতের নেশা অস্থায়ী হয়ে থাকে। ঈমানের শক্তি মৃত্যুর পরও নিঃশেষ হয় না।'

'আমার পিতা সম্পদশালী লোক ছিলেন না'– আযর বললো– 'তিনি সম্পদের পূজারী ছিলেন। আমার দু'টি বোন ছিলো। যৌবনে উপনীত হওয়ার পর তিনি তাদেরকে দু'জন আমীরের হাতে তুলে দিয়ে দরবারে স্থান করে নেন। তিনি তার কন্যাদের বিপুল মূল্য উসুল করেন। তারপর চরবৃত্তি করতে শুরু করেন। আমাকেও তিনি এ কাজে লাগিয়ে দেন এবং আমার অন্তরে সম্পদের মোহ সৃষ্টি করে দেন। নূরুদ্দীন জঙ্গীর ওফাতের পর তিনি দরবারে আরো উচ্চ মর্যাদা পেয়ে যান। এক পর্যায়ে তিনি একজন বিজ্ঞ কুচক্রী ও ভাঙ্গা-গড়ার সুদক্ষ কারিগরে পরিণত হন। এক পর্যায়ে তিনি বিপুল পরিমাণ জায়গীরের মালিক হয়ে যান। আপনার বাহিনী এসে পড়ার পর যখন আল-মালিকুস সালিহ, তার দরবারী আমীর ও জাগিরদারগণ দামেস্ক থেকে পালিয়ে যায়, তখন তাদের সঙ্গে আমার পিতাও ছিলেন। আমি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই দামেস্ক থেকে যাই। কিছুদিন পর হাল্‌ব থেকে এক ব্যক্তি দামেস্ক আসে। সে আমার পিতার একটি বার্তা নিয়ে আসে, আমি যেন গুপ্তচরবৃত্তির কাজ শুরু করে দেই। সেই লোকটিই আমাকে সেই আস্তানায় নিয়ে যায়, আমি যার ঠিকানা আপনাদেরকে দিয়েছি। সেখানে আমাকে প্রচুর অর্থ দেয়া হয় এবং দু'-তিন দিনের মধ্যেই আমাকে জানিয়ে দেয়া হলো আমাকে কী করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে। আমি তাদের দলে ঢুকে পড়ি। একদিন আমাদের দলনেতা বললেন, স্বেচ্ছাসেবীরা রণাঙ্গনে যাচ্ছে। তোমরা তিন থেকে চারজন লোক তাদের দলে ঢুকে পড়ো। আমরা তিনজন ঢুকে পড়লাম। দু'জন আগেই এখানে এসে পৌঁছেছে। আমিও গেলাম। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়, যেনো আমিও এখানে চলে আসি এবং আপনার বাহিনীর পূর্ণ অবস্থা জেনে সকল তথ্য যৌথ বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেই। আমি এসে পড়লাম। আমার সঙ্গীরা এখানকার নক্‌শা প্রস্তুত করে রেখেছিলো। তারা এও জেনে নিয়েছিলো যে, আপনি শত্রু বাহিনীকে সেই স্থানটিতে নিয়ে এসে লড়াতে চাচ্ছেন, যা চারদিকের পর্বত ও টিলা-বেষ্টিত। আমি টিলার আড়ালে লুকিয়ে

লুকিয়ে আপনার তীরান্দাজ এবং মিনজানীকের অবস্থান দেখে নিয়েছিলাম।'

আযরের চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে শুরু করে। সে বললো– 'ধরা পড়ার পর এখন আমি অনুভব করছি, আমি অপরাধ করছিলাম। আপনার বক্তব্য আমার ভেতরে ঈমানের উত্তাপ জাগ্রত করে দিয়েছে। আমার পিতা যদি তার কন্যাদের বিক্রি করে সম্পদশালী না হতেন, তাহলে আমার ঈমান অটুটই থাকতো। অপরাধ আমার পিতার। মহামান্য সুলতান! আপনার মর্যাদা বুলন্দ হোক। আপনি দয়া করে আমাকে এই পাপের কাফফারা আদায় করার সুযোগ দিন।'

সুলতান আইউবী হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে ইঙ্গিত করেন। হাসান আযরকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে যান।

সেদিনই আযরকে দামেস্ক পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার সঙ্গে দু'জন মোহাফেজ দেয়া হয়। তিনজনই অশ্বারোহী। আযরের হাত রশি দ্বারা বাঁধা। সূর্যাস্তের খানিক আগে তারা অর্ধেক পথ অতিক্রম করে ফেলে। রাতে কোথাও যাত্রাবিরতি দিতে হবে। পথে মোহাফেজগণ আযরের অপরাধের বিবরণ শুনতে থাকে। আযর আবেগপ্রবণ কথা বলে বলে তাদেরকে প্রভাবিত করে ফেলে। সন্ধ্যার সময় সে মোহাফেজদের বললো, সামান্য সময়ের জন্য তোমরা আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও। মোহাফেজরা এই ভেবে তার হাত খুলে দেয় যে, নিরস্ত্র পালিয়ে যাবে কোথায়। তারা তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে দেয়। বাঁধনমুক্ত হয়ে আযর মাটিতে বসে পড়ে। মোহাফেজরা তাকে নিয়ে খেতে শুরু করে।

আযর পূর্ব থেকেই ফন্দি এঁটে রাখে। আহাররত অবস্থায় হঠাৎ সে উঠে দৌড়ে গিয়ে দ্রুত ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। মোহাফেজরা উঠে ঘোড়ার পিঠে চড়তে চড়তে আযর বেশ দূরে চলে যায়। তারা পলায়নপর আযরকে ধাওয়া করে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সন্ধ্যা গাঢ় হতে শুরু করে। উঁচু-নীচু ভূমি। মাঝে-মধ্যে টিলা এবং বড় বড় পাথর আছে। মোহাফেজরা তাকে বহুদূর পর্যন্ত ধাওয়া করে। কিন্তু আযর চলে গেছে দৃষ্টিসীমার বাইরে।

পরদিন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মোহাফেজদ্বয় পরাজিতের ন্যায় অবনত মস্তকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর নিকট এসে হাজির হয়। একজন বললো– 'আমাদের গ্রেফতার করুন; বন্দী পালিয়ে গেছে!' তারা জানালো, বন্দীর দাবিতে তারা

তার হাতের বন্ধন খুলে দিয়েছিলো। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাদেরকে হেফাজতে নিয়ে নেন। কিন্তু ভয়ে-শংকায় তার ঘাম বেরিয়ে আসে। কেননা, আযর সাধারণ কোন বন্দী ছিলো না। সে সুলতান আইউবীর সমস্ত পরিকল্পনা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো। জয়-পরাজয় ঐ পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল ছিলো। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ সুলতান আইউবীকে জানাতে চাচ্ছিলেন না যে, ধৃত গোয়েন্দা হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং আপনার সব পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেছে। তবে সুলতানকে বিষয়টা না জানিয়েও উপায় নেই।

সংবাদটা শোনার পর সুলতানের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখ থেকে কোন কথাই বের হলো না। তিনি বসা থেকে উঠে তাঁবুর ভেতরে পায়চারি করতে শুরু করলেন। তৎকালের ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদী লিখেছেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবী চরম বিপদের সময়ও বিচলিত হতেন না। কিন্তু গুপ্তচরের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ শোনার পর তার চেহারার রক্ত উধাও হয়ে যায় এবং চোখ জ্যোতিহীন হয়ে পড়ে। তিনি তাঁবুর ভেতরে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থেমে যান এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মহান আল্লাহ! এটা কি ইঙ্গিত যে, আমি এখান থেকে ফিরে যাবো? আপনার মহান সত্ত্বা কি আমার পাপ ক্ষমা করেনি? আমি তো কখনো অস্ত্র ত্যাগ করিনি। আমি কখনো পিছপা হইনি।'

তারপর তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। সম্ভবত তিনি অদৃশ্যের কোনো ইশারা লাভ করতেন, যা সেদিন এই পরিস্থিতিতেও পেয়েছিলেন। তিনি হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে বললেন– 'ঐ মোহাফেজদ্বয়কে বেশী শাস্তি দিও না। শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা পালাতে পারতো। কিন্তু তারা আমাদের নিকট চলে এসেছে। তাদেরকে শুধু ভুলের শাস্তি দেবে। সত্য বলা এবং সরলতার পুরস্কারও প্রদান করবে। সালারদেরকে ডাকো।' তার চেহারায় রওনক এবং চোখে চমক ফিরে আসে।

তিন সালার এসে হাজির হন। সুলতান আইউবী তাদেরকে বললেন– 'সেই গুপ্তচর পালিয়ে গেছে, যার কাছে আমাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ছিলো। সে যে মানচিত্রটা প্রস্তুত করেছিলো, সেটি আমাদের নিকট রয়ে গেছে বটে; কিন্তু সে বহু কিছু চোখে দেখে গেছে এবং আমরা দুশমনকে কোথায় নিয়ে লড়াতে চাই, সেই তথ্যও সে জেনে গেছে। ফলে দুশমনের জন্য আমরা যে ফাঁদ প্রস্তুত করেছিলাম, তা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তারা এখন পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। হয়তো তারা আমাদেরকে

অবরোধ করে ফেলবে এবং আমাদের রসদের পথ বন্ধ করে দেবে। আপনারা পরামর্শ দিন এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী। আমরা কি পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলবো, নাকি বহাল রাখবো।'

তিন সালার ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ব্যক্তি করেন। তারা সকলে একটি ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলা হোক। সুলতান আইউবী তাদের সঙ্গে একমত হলেন। তিনি বললেন– 'পরিকল্পনা পরিবর্তন করার জন্য সময় দরকার। আমাদের হাতে সময় নেই। আশংকা থাকে, এই রদবদলের মধ্যে যদি দুশমন হামলা করে বসে, তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে। মুক্ত মাঠে মুখোমুখি লড়াই করার জন্য সৈন্যও অপ্রতুল।'

সিদ্ধান্ত হলো, পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থাকবে। গেরিলা বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হলো, যেন তারা ব্যাপকহারে অতর্কিত হামলা চালায় এবং দুশমনের সম্মিলিত কমান্ড ও তিন বাহিনীর কেন্দ্রের উপর গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করে। রসদের পথকে আরো বেশি নিরাপদ করা হবে। তিনি গেরিলা বাহিনীর সালারকে বললেন, আপনি সেই দলটিকে ফিরিয়ে আনুন, যাদেরকে মটকা ভাঙ্গার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিলো।

নতুন আদেশ নিয়ে সালার চলে যান। সুলতান আইউবী এই সিদ্ধান্ত আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রদান করেন বটে; কিন্তু মনটা তার অস্থির। তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, পালিয়ে যাওয়া গোয়েন্দা তার সমস্ত পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছে। এখন জানা নেই, কী হবে?

কিছুক্ষণ পর বারোজন গেরিলার একটি বাহিনী সুলতানের সামনে হাজির হলো। খৃষ্টানরা হালবের বাহিনীকে দাহ্য পদার্থ ভর্তি যে মটকাগুলো প্রেরণ করেছিলো, সেগুলো রণাঙ্গনে নিয়ে আসা হয়েছে। সুলতান আইউবীর গুপ্তচররা সেগুলোর অবস্থান জেনে নিয়েছে। সুলতান আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন, দুশমন যখন হামলা করবে, তখন মটকাগুলো ধ্বংস করে দেবে। তার জন্য বারোজন জানবাজ এবং উন্মাদ প্রকৃতির কমান্ডো নির্বাচন করা হয়েছিলো। এখন তাদেরকেই সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। সুলতান তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এক গেরিলাকে দেখে তিনি মুচকি হেসে বললেন– 'আনতানূন! তুমি এই বাহিনীতে এসে পড়েছো?'

'আমাকে এই বাহিনীতেই আসা প্রয়োজন ছিলো'– আনতানূন বললো– 'আপনাকে বলেছিলাম, আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।'

'আমার প্রিয় বন্ধুগণ!'– সুলতান আইউবী গেরিলাদের উদ্দেশে বললেন–

'তোমরা এ যাবত বহু কুরবানী দিয়েছো। কিন্তু এখন দ্বীন ও জাতির ইজ্জত তোমাদের থেকে আরো বেশী ত্যাগ দাবি করছে। তোমরা যুদ্ধের গতি পাল্টে দিতে পারো। তোমাদেরকে টার্গেট বলে দেয়া হয়েছে। তোমরা যদি এগুলো ধ্বংস করে দিতে পারো, তাহলে অনাগত প্রজন্ম তোমাদেরকে স্মরণ করবে। তোমরা জানো, আমাদের সেনাসংখ্যা কম। দুশমনের বাহিনী তিনটি। তাদের থেকে নিজেদের বাহিনীকে তোমরা রক্ষা করতে পারো।'

'আমরা দ্বীন ও জাতিকে নিরাশ করবো না।' গেরিলাদের কমান্ডার বললো।

সুলতান আইউবী আরো কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়ে তাদেরকে বিদায় জানালেন।

পরদিন ভোর বেলা। এক ব্যক্তি ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে এসে উপস্থিত হয়। সুলতান আইউবী এখনো তাঁবুতে অবস্থান করছেন। অশ্বারোহী সংবাদ দেয়, শত্রুবাহিনী এগিয়ে আসছে। এখন তারা এখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে। তাদের গতি হামাতের দিকে। ইত্যবসরে আরো এক আরোহী এসে পৌঁছে। তার সংবাদ হলো, ডানদিক থেকেও দুশমন আসছে। এই বাহিনীর গতি থেকে সুলতান আইউবী অনুমান করলেন, এরা ডান পার্শ্ব অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। এই দিকটা নিয়ে সুলতানের পেরেশানী ছিলো। এবার তিনি আরো বেশি অস্থির হয়ে ওঠেন। এই বাহিনীর সম্মুখ ভাগে অবস্থান করছে আযর, যে কিনা এখান থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে পালিয়েছিলো। সুলতান আইউবী বললেন— 'আযর গত রাতেই পৌঁছে গিয়েছিলো এবং তার তথ্য মোতাবেক দুশমন হামলা করে বসেছে।'

সুলতান আইউবী প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তাঁর দূত চারদিকে ছুটে চলে। হামাতের মধ্যস্থানে তাঁবু খাটানো আছে। সৈন্যরা তাঁবুতে অবস্থান করছে কিংবা এদিকে-ওদিক ঘোরাফেরা করছে, যেন দুশমন মনে করে, তারা প্রস্তুত নয়। তীরান্দাজ সৈনিকরা টিলার উপর প্রস্তুত হয়ে যায়।

তীব্রগতিতে এগিয়ে আসছে শত্রুবাহিনী। তাদের অগ্রগামী বাহিনী দেখতে পেলো, সুলতান আইউবীর তাঁবুগুলো এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তারা এই ভেবে দ্রুত এগিয়ে আসার জন্য পেছনে সংবাদ পাঠায় যে, তারা সুলতান আইউবীর বাহিনীকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গেছে।

সুলতান আইউবী একটি উঁচু টিলার উপর উঠে যান, যেখান থেকে চারদিকের সমস্ত দৃশ্য দেখা যায়। তিনি দেখলেন, গোমস্তগীনের বাহিনী সোজা শিং-এর দিকে এগিয়ে আসছে। সুলতান বিস্মিত হন। তিনি তাঁর সৈনিকদেরকে সেই সময় ঘোড়ায় জিন বাঁধার নির্দেশ দেন, যখন দুশমন একেবারে নিকটে

এসে পড়েছে। দুশমনের পদাতিক বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কয়েকটি তীর নিক্ষেপ করে। ওদিক থেকে ডাক-চিৎকার ভেসে আসে– 'পিষে ফেলো, একজনকেও জীবিত ছেড়ে দিও না, সালাহুদ্দীন আইউবীকে জীবিত ধরে ফেলো। তার মাথাটা কেটে ফেলো।'

সুলতান আইউবীর অশ্বারোহী বাহিনী কিছুটা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আবার পিছনে সরে আসে। পদাতিক ও আরোহী বাহিনী শত্রুবাহিনীর সম্মুখভাগের আক্রমণের মোকাবেলা করতে করতে পিছন দিকে সরে আসতে থাকে। এভাবে আক্রমণকারী প্রত্যেকে হামাতের সেই ফাঁদের ভেতরে এসে পড়ে, যেখানে সুলতান আইউবী তাদেরকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

টিলা-পর্বতবেষ্টিত এই ময়দানটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে দেড় মাইলের মতো। দুমশন যেইমাত্র তার ভেতরে প্রবেশ করলো, অমনি উভয় দিকের টিলার উপর থেকে তাদের উপর তীর বর্ষিত হতে শুরু করলো। দুশমনের ঘোড়াগুলো তীর বিদ্ধ হয়ে নিজেদেরই লোকদেরকে পিষতে পিষতে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে। শত্রু বাহিনীর কমান্ডার বুঝতেই পারলো না, এখানে তাঁবুগুলোর মধ্যে যে সৈনিকরা ছিলো, তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। সামনের টিলাগুলোর ভেতরে দিয়ে একটা পথ, যা উপত্যকার দিকে বেরিয়ে গেছে এবং সুলতান আইউবীর সৈন্যরা সেই পথেই লাপাত্তা হয়ে গেছে, তা তাদের জানা ছিলো না। ময়দানে তাঁবু খাটানো ছিলো, যার রশিগুলো শত্রু বাহিনীর জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিলো।

কিছুক্ষণ পর সলিতাওয়ালা অগ্নিতীর আসতে শুরু করে। এই তীর তাঁবুগুলোকে জ্বালিয়ে দিতে শুরু করে। তারা তাঁবুগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। রণাঙ্গন থেকে অগ্নিশিখা উঠতে শুরু করে। দুশমনের কমান্ডারদের জন্য বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের দলবদ্ধতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ঘোড়াগুলোর হ্রেষারব, আহতদের আর্ত-চিৎকার এবং কমান্ডারদের হাঁক-ডাক এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যেনো এখানে প্রলয় ঘটে গেছে।

প্রায় দু'ঘন্টা ধরে দুশমনের কমান্ডাররা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে তাদের সৈনিকদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু তারা সুলতান আইউবীর তীরান্দাজদের হাতে হতাহত হতেই থাকে। কিন্তু তারা তো মুসলমান সৈনিক। সামরিক চেতনা তাদেরকে পিছপা হতে দিচ্ছে না। তাদের কয়েকজন সৈনিক যে পাহাড়টির উপর থেকে তীর আসছিলো,

তাতে আরোহনের চেষ্টা করে। কিন্তু এটা ছিলো নিছক তাদের সাহসিকতা প্রদর্শন। কিন্তু উপর থেকে ধেয়ে আসা তীর তাদেরকে পাথরের ন্যায় গড়িয়ে নীচে ফেলে দেয়।

অবশেষে শত্রু কমান্ডাররা তাদের সৈনিকদেরকে পেছনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু খানিকটা পিছু হটার পর তারা টের পেলো, পেছনে সুলতান আইউবীর ফৌজ দাঁড়িয়ে আছে। ঘোষণা শুরু করলো– 'অস্ত্র ফেলে দাও। তোমরা আমাদের ভাই। আমরা তোমাদেরকে হত্যা করবো না।'

ঘোষণার তালে তালে আইউবী বাহিনীর সেনারা সম্মুখে অগ্রসর হতে এবং চারদিক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। চারদিক থেকে অবরুদ্ধ গোমস্তগীন বাহিনীর এখন আর লড়াই করার সাধ্য নেই। তাদের অর্ধেকই হতাহত হয়েছে। যারা জীবিত আছে, তারাও চরম ভীতসন্ত্রস্ত। তারা এসেছিলো অন্য আশা নিয়ে। তাদের বলা হয়েছিলো, এই জয় অতি সহজে হবে। কিন্তু রণাঙ্গন তাদের জন্য জাহান্নামে পরিণত হলো।

তারা অস্ত্র সমর্পণ করতে শুরু করে।

সুলতান আইউবীর এই কৌশল সফল হয়েছে বটে; কিন্তু অপরদিকে দুশমন তাকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। তা হলো ডান পার্শ্বের সেই ময়দান, যার ব্যাপারে পূর্ব থেকেই তিনি চিন্তিত ছিলেন। ওদিক থেকে শত্রুবাহিনী মরুঝড়ের ন্যায় এগিয়ে আসছে। তার মোকাবেলায় সুলতান আইউবীর ক্ষুদ্র দু'টি ইউনিট। আক্রমণকারীদের পতাকা নজরে পড়তে শুরু করে। এটি হাল্‌বের ফৌজ। সুলতান আইউবী হাল্‌ব অবরোধ করে এই বাহিনীর পরাকাষ্ঠা দেখেছিলেন। তাঁর জানা আছে, এই বাহিনী গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনের বাহিনী থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। সামরিক যোগ্যতা ও বীরত্বের দিক থেকে এই ফৌজ সত্যিই প্রশংসাহ্য। সুলতান আইউবী কখনো আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলেন, তাঁর বাহিনী এই বাহিনীকে প্রতিহত করতে পারবে না। আবার রিজার্ভ বাহিনীকেও তিনি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন না। ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কাছে দণ্ডায়মান সালারকে নির্দেশনা প্রদান করে পাঠিয়ে দেন।

সুলতান আইউবী রিজার্ভ বাহিনী ছাড়াও বাছাইকরা একটি বাহিনীকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি ওদিককার পাহাড়ের উপর

মোতায়েন তীরান্দাজদের কমান্ডারকে নির্দেশ দিলেন, তোমার শিং এলাকা থেকে সরে পেছনদিকে মুখ ফিরাও এবং ঐ পজিশনেই নতুন আক্রমণকারীদেরকে টার্গেট করো। তিনি তাঁর বিশেষ অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডারকে নির্দেশ দিলেন, তোমার বাহিনীকে ময়দানে নিয়ে আসো; আমি নিজে তাদের কমান্ড করবো। স্বল্প সময়ের মধ্যে সুলতান আইউবী পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নেমে আসেন। তাঁর বাহিনী প্রস্তুত দণ্ডায়মান। তিনিও ময়দানে অবতীর্ণ হোন।

সুলতান আইউবী যুদ্ধের ময়দানে তাঁর পতাকা উড়ালেন না, যেন দুশমন বুঝতে না পারে তিনি কোথায় আছেন। কিন্তু আজ তিনি সেই নিয়মে ব্যত্যয় ঘটালেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দেন, 'আমার পতাকা উঁচু করে রাখো।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'এই যুদ্ধে পতাকা উড়িয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁর বাহিনীকে বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, সুলতান স্বয়ং তাদের কমান্ড করছেন। পাশাপাশি হাল্‌বের আক্রমণকারী শত্রুসেনাদেরকে জানান দিতে চেয়েছিলেন, তাদের মোকাবেলায় সুলতান আইউবী স্বয়ং ময়দানে।'

সুলতান আইউবী অতিদ্রুত অশ্বারোহী সৈন্যদের এভাবে বিন্যস্ত করে ফেলেন যে, দু'টি ঘোড়া সম্মুখে, চারটি পিছনে। তার পিছনে ছয়টি। তারপর আটটি। অবশিষ্ট সকল সৈন্য আট আটজন করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে চলন্ত অবস্থায় সম্পন্ন করেছেন। সম্মুখ থেকে দুশমন সারিবদ্ধভাবে বিস্তৃত হয়ে এগিয়ে আসছে। নিকটে গিয়ে সুলতান আইউবীর অশ্বারোহী সেনারাও বিন্যস্ত হয়ে যায়। মোকাবেলাটা এরূপ হয় যে, সুলতান আইউবীর অশ্বারোহীরা একটি পেরেকের ন্যায় দুশমনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। সুলতান আইউবী হলেন এই বিন্যাসের মধ্যখানে। দুশমনের অশ্বারোহীরা ডান-বাম থেকে সম্মুখ দিকে এগিয়ে যায়। পথে যাকেই পেলো আঘাতে আহত করতে থাকে।

শত্রুবাহিনী আরোহী সেনাদের পেছনে পদাতিক বাহিনী। সুলতান আইউবী সম্মুখে বেশ দূরে এবং সঙ্গে সঙ্গে সারির অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়ে পদাতিক ইউনিটের উপর হামলা করে বসেন। পদাতিক শত্রুসেনার। যথাসাধ্য মোকাবেলা করে। কিন্তু আইউবী বাহিনীর ঘোড়া এবং আরোহী সেনারা তাদের পিষে মারতে মারতে ও তারবারীর আঘাত হানতে হানতে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সুলতান আইউবীর পদাতিক বাহিনীটি ছিলো

সম্মুখে। তারাও দুশমনের অশ্বারোহী বাহিনীর মোকাবেলা করে। পিছন দিক থেকে সুলতান আইউবী হঠাৎ আক্রমণ করে বসেন। নিকটস্থ পাহাড়গুলোর উপর থেকে তীরান্দাজরা তীরবর্ষণ করতে শুরু করে। কিন্তু এতোকিছুর পরও হাল্‌বের সৈন্যদের মনোবল অটুট থাকে। সুলতান আইউবী তাঁর কমান্ড বিক্ষিপ্ত হতে দিলেন না। লড়াই অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী এবং তীব্র আকার ধারণ করলো।

সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, 'সুলতান আইউবী যদি এই যুদ্ধের কমান্ড নিজে না করতেন, তাহলে এই বাহিনীর দ্বারাই তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যেতো।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ ইতিহাসবিদদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর রোজনামচা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই আক্রমণকারী বাহিনীটি হাল্‌বের নয়– মসুলের ফৌজ ছিলো এবং সালার মুজাফফর উদ্দীন ইবনে যাইনুদ্দীন তার সেনাপতিত্ব করছিলো। তাঁর ভাষ্য মতে, এই কমান্ড এতো নিপুণ ছিলো যে, মুজাফফর উদ্দীন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এই বাহিনীটিকে উপড়ে ফেলে দিয়েছিলো। নেতৃত্বের বিচক্ষণতার কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, মুজাফফর উদ্দীন একসময় সুলতান সালাউদ্দীন আইউবীর সালার ছিলো এবং এই বিদ্যা সে সুলতান আইউবীর নিকট থেকে শিক্ষালাভ করেছিলো। সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের পাশাপাশি তার অতিরিক্ত সুবিধা এই ছিলো যে, সে সুলতান আইউবীর কৌশল ভালভাবেই বুঝতো।

সুলতান আইউবী দূতদের সঙ্গে রাখতেন এবং তাদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি এমন কৌশল প্রয়োগ করেন যে, শত্রু বাহিনীকে তিনি সেই পর্বতের নিকট নিয়ে যান, যার উপর তার তীরান্দাজরা প্রস্তুত ছিলো। তীরান্দাজরা সংখ্যায় কম হলেও কাজ অনেক আঞ্জাম দেয়। সুলতান তাঁর সেনাসংখ্যার স্বল্পতায় এতো অনুভূতি ছিলো যে, তাঁকে তাঁর প্রথম পরিকল্পনাটি পাল্টে ফেলতে হয়। তিনি রিজার্ভ বাহিনীকে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু ঠিক এমন মুহূর্তে এক দূত তাঁকে সংবাদ জানায় যে, একদিক থেকে আপনার চার-পাঁচশত অশ্বারোহী আসছে। সুলতান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, তারা কোন্ বাহিনীর এবং কেন আসছে? তিনি যুদ্ধের ময়দানে শৃঙ্খলার অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। অথচ এই ময়দানে তাঁর সাহায্যের তীব্র প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর অনুমতি ও নির্দেশনাবিহীন একটি পদক্ষেপ তার

পছন্দ হয়নি। তিনি দূতকে বললেন– 'এক্ষুণি যাও। জিজ্ঞেস করে আসো, তোমরা কারা?'

দূতের নিয়ে আসা সংবাদ শুনে সুলতান আইউবী হতভম্ব হয়ে পড়েন। এরা চারশত মেয়ে এবং একশত স্বেচ্ছাসেবীর বাহিনী। হাজ্জাজ আবূ ওয়াক্কাস তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তারা সালার শামসুদ্দীনের অনুমতিক্রমে এসেছে। এ হলো সংবাদ।

সুলতান আইউবী তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এই পাঁচশত অশ্বারোহী যে ধারায় অগ্রসর হয়েছে, তাতে সুলতান বুঝে ফেলেন, কমান্ড সালার শামসুদ্দীন নিজেই করছেন। এই বাহিনীটি শত্রুকে পাহাড়ের দিকে ঠেলে নিয়ে আসছিলো। তারা দুশমনের অগ্রযাত্রা ব্যহত করে দিয়েছে।

মুসলমান মুসলমানের হাতে মারা যাচ্ছে। 'আল্লাহু আকবর' তাকবীর ধ্বনি 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনির সঙ্গে সংঘর্ষিত হচ্ছে। জমিন কাঁপছে। আকাশ নীরব দর্শকের ন্যায় তাকিয়ে আছে। খৃস্টানরা তামাশা দেখছে। ইতিহাস নির্বিকার হয়ে আছে। মেয়েরা ভাইয়ের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। রক্তের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। জাতির মর্যাদা অশ্বখুরের নীচে পদদলিত হচ্ছে। আল্লাহ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন।

সারাদিনকার যুদ্ধের পরিণতি এই দাঁড়ালো যে, দুশমনের মনোবল নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং তারা অস্ত্র ত্যাগ করতে শুরু করেছে। তারা এখন আঁধা অবরোধে অবরুদ্ধ। তাদের সেনাপতি বেরিয়ে গেছে। আহতদের আর্ত-চিৎকারে রাতের নীরব পরিবেশ প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। সারাদিনের যুদ্ধক্লান্ত নারী সৈনিকরা আহতদের তুলে আনতে থাকে। রাত পোহাবার পর ময়দানের এক ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়লো। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত লাশের পর লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। অসংখ্য মৃত ঘোড়া এদিক-ওদিক পড়ে আছে। যুদ্ধবন্দীদেরকে দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লাশগুলোর মধ্যে নারী সৈনিকদের লাশও আছে। তাদেরকেও তুলে আনা হলো।

'রাজত্বের নেশা মানুষকে এমন এক স্তরে নামিয়ে নিয়ে আসে, সেখানে একজন মানুষ তার জাতিকে দু'টি দেহে বিভক্ত করে তাদেরকে পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে দেয়'– সুলতান আইউবী ময়দানের দৃশ্য দেখে বললেন– 'ভাই তার বোনের সম্ভ্রম হরণ করছে। আমরা যদি রাজত্বের মোহ থেকে মুক্ত হতে না পারি, তাহলে কাফেররা এই জাতিকে আপসে যুদ্ধ করিয়ে জাতিরই কর্ণধারদের হাতে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'

হামাত শিং ও তার পার্শ্ব এলাকার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অন্যত্র এখানো যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের রাতে বারো কমান্ডো হাল্‌ব বাহিনীর সেই স্থানটিতে পৌঁছে যায়, যেখানে দাহ্য পদার্থের মটকাগুলো রাখা আছে।

হাল্‌বের একটি বাহিনী এখনো রিজার্ভ অবস্থায় আছে। তারা সংবাদ পেয়ে গেছে, তাদের দুই বাহিনীর হামলা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আক্রমণে সাফল্য অর্জনের জন্য আগুন নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

সুলতান আইউবীর বারো কমান্ডো তাদের টার্গেট ঠিক করে নিয়েছে। তাদের চার-পাঁচজনের নিকট ধনুক এবং সলিতাওয়ালা তীর আছে। তারা ঘোড়া থেকে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সলিতায় আগুন ধরিয়ে তীর নিক্ষেপ করে। আগুন লাগানো সলিতা গিয়ে মটকার ডিপোতে নিক্ষিপ্ত হয়। মটকাগুলোতে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায়। আগুনের লেলিহান শিখায় আকাশ ছেয়ে যায়। শত্রু শিবিরে হৈ-হুল্লোড় পড়ে যায়।

কমান্ডোদের জানানো হয়েছিলো, মটকার সংখ্যা অনেক। সেখানে স্থলস্থুল শুরু হয়ে গেলে কমান্ডোরা পুনরায় আঘাত হানে। আগুনের শিখায় স্থানটি আলোকিত হয়ে যায়। কমান্ডোরা নিরাপদ মটকাগুলোর অবস্থান দেখতে পায়। তারা আগেই বর্শার সঙ্গে হাতুড়ীর ন্যায় লোহার টুকরো বেঁধে রেখেছিলো। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসেই তারা মটকাগুলো পিটিয়ে ভাঙ্গতে শুরু করে। শত্রু সেনারা তাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। এ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। বারোজন জানবাজ সেনা হাজার হাজার শত্রুসেনার নাগালের মধ্যে যুদ্ধ করছে। আগুনের শিখা সবদিক ছড়িয়ে পড়ে। শিবিরময় ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। উট-ঘোড়াগুলো রশি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পালাতে শুরু করে।

সুলতান আইউবীর ফৌজের অবস্থান এলাকায় পাহাড়ের উপর দন্ডায়মান এক ব্যক্তি চিৎকার করছে– 'আকাশ জ্বলছে। খোদার গজব নাযিল হচ্ছে।'

সংবাদ পেয়ে সুলতান আইউবী দৌড়ে একটি টিলার উপরে উঠে যান। দুশমনের শিবিরের দিককার আকাশ লালে লাল দেখে তিনি নিজের অজ্ঞাতে বলে ওঠেন– 'শাবাশ! শাবাশ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিনিময় দান করুন।'

এখনই পাল্টা হামলা চালাবে সেই শক্তি মসুলের বাহিনীর শেষ হয়ে গেছে। সুলতান আইউবীর কমান্ডো সেনারা তৎপর হয়ে ওঠেছে। তারা তিন রাত গোমস্তগীন, সাইফুদ্দীন ও আল-মালিকুস সালিহ'র শিবিরগুলোতে এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালায় যে, তাদের কেন্দ্র পর্যন্ত হেলে ওঠেছে। অবশেষে তারা অন্য কোন দিক থেকে আক্রমণ করার নির্দেশ

প্রদান করে। ঠিক সে সময় তারা জানতে পারে, পেছনে সুলতান আইউবীর ফৌজ এসে পড়েছে।

এদিকে সুলতান আইউবী তাঁর বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করে দুশমনকে বেহাল করে দেন। তিনি হত্যাও করছেন না, ছেড়ে দিচ্ছেনও না। এই যুদ্ধ 'আঘাত করো আর পালাও' নীতি অনুযায়ী লড়া হচ্ছিলো। শত্রু বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে এবং অস্ত্র ত্যাগ করতে শুরু করে। সুলতান আইউবীর লক্ষ্যও ছিলো এই।

৫৭০ হিজরীর রমযান মোতাবেক ১১৭৫ সালের ১৩ এপ্রিল। সাহরী খাওয়ার পর সুলতান আইউবী তার পরিকল্পনার শেষ অংশটি কার্যকর করেন, যার দিক-নির্দেশনা তিনি একদিন আগেই দিয়ে রেখেছেন। তিনি খোলাখুলি আক্রমণ করে বসেন। উল্লেখযোগ্য সংঘাত হলো না। তিনি গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনের তাঁবু এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যান। কিন্তু তারা দু'জনই উধাও। তারা এমন কাপুরুষের ন্যায় পালিয়ে গেছে যে, তাদের 'জঙ্গলের মঙ্গল' তাঁবুগুলো যেমনটা তেমন পড়ে আছে। হেরেমের নারী, গায়ক-গায়িকা এবং তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলো যথাস্থানে রয়েছে। সুলতান আইউবীর ফৌজ দেখে তারা আতঙ্কিত মনে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করে। তাদেরকে ধরে সুলতান আইউবীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সুলতান তাদের প্রত্যেককে মুক্তি দিয়ে দামেস্ক পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। মসুলের গবর্নর সাইফুদ্দীনের তাঁবুটা সবচেয়ে আকর্ষণীয়। মেয়েদের ছাড়া সেখানে সুন্দর সুন্দর পিঞ্জিরাও ছিলো, যেগুলোতে রং-বেরংয়ের পাখি বাঁধা ছিলো।

সে রাতে আরো একটি মেয়েকে সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, যে কিনা শত্রু বাহিনীর সেই শিবিরটিতে লাশ শনাক্ত করে ফিরছিলো, যার উপর সুলতান আইউবীর কমান্ডো সেনারা রাতে অতর্কিত হামলা করে দাহ্য পদার্থের মটকা ধ্বংস করেছিলো। সুলতান আইউবী মেয়েটিকে চিনে ফেললেন এবং বললেন– 'তুমি আমার গোয়েন্দা আনতানূনের সঙ্গে হাররান থেকে এসেছিলে?'

'জি হ্যাঁ'– মেয়েটি বললো– 'আমার নাম ফাতেমা। আমি নারী ফৌজের সঙ্গে দামেস্কে থেকে এসেছি।' মেয়েটি আহত। সে বলতে লাগলো– 'আমি জানতে পেরেছি আনতানূন এখানে গেরিলা হামলায় অংশ নিয়েছিলো। আমি তাঁর লাশ অনুসন্ধান করছিলাম।'

'লাভ নেই।' সুলতান আইউবী বললেন।

'সে-ও বলতো, গেরিলা সৈন্যের লাশ পাওয়া যায় না'– ফাতেমা উদাস কণ্ঠে বললো– 'সে আমাকে বলেছিলো, আসো, আমরা নিজ নিজ কর্তব্যে কুরবান হয়ে যাই। আমার খুশি লাগছে এ জন্য যে, আনতানূন তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করেছে। কিন্তু আমার কর্তব্য এখনো অনাদায়ী রয়ে গেছে। আমি গোমস্তগীনকে হত্যা করতে এসেছিলাম।'

মেয়েটির আবেগময় অবস্থা দেখার পর কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারলো না। সুলতান আইউবী বললেন– 'দামেস্ক থেকে যে মেয়েগুলো এসেছিলো, তাদেরকে পাঠিয়ে দাও।' তারা দুশমনকে পরাজিত করার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। এ সময় সাহায্যের কতো প্রয়োজন ছিলো, আমিই তা জানি। এই মেয়েগুলো যেন অদৃশ্য থেকে এসেছিলো; কিন্তু আমি তাদেরকে সঙ্গে রাখতে পারি না।'

মেয়েদের প্রতিবাদ এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে দামেস্কে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সুলতান আইউবী এখন আর কোথাও থামতে চাচ্ছেন না। তিনি দুশমনকে যে পরাজয় দান করেছেন, তা থেকে তিনি পুরোপুরি ফায়দা তুলতে চাচ্ছেন। তিনি নির্দেশ দেন, সমস্ত ফৌজকে হাল্‌ব অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত করো। তিনি সালারদেরকে পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করছেন।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেলো, এক অশ্বারোহী এদিকে ছুটে আসছে। তার হাতে বর্শা। বর্শার আগায় কি একটি বস্তু গাঁথা। লোকটি নিকটে চলে আসলে সুলতান আইউবীর দেহরক্ষীরা তাকে থামিয়ে দেয়। সুলতান দেখলেন, তার বর্শার আগায় গেঁথে রাখা বস্তুটা মানুষের মাথা। তিনি তাকে সম্মুখে আসার অনুমতি প্রদান করেন।

লোকটি আযর ইবনে আব্বাস। সেই গুপ্তচর, যাকে দামেস্ক নিয়ে যাওয়ার পথে যে রক্ষীদের হেফাজত থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সে বর্শা থেকে মাথাটা খুলে সুলতান আইউবীর পায়ে নিক্ষেপ করে বললো– 'আমি আপনার পলাতক কয়েদী। আমি নিবেদন করেছিলাম, আমাকে ক্ষমা করে দিন; আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করবো। কিন্তু আপনি আমার আবেদন মঞ্জুর করেননি। আমি পথে চিন্তা করলাম, আমাকে ইসলামের বিপক্ষে পথে নামিয়েছেন আমার পিতা।

তিনিই আমার অন্তরে সম্পদের মোহ সৃষ্টি করেছেন। আমি শুধু এই কাজের জন্য পালিয়েছিলাম। আমি হাল্‌ব গেলাম। পিতাকে হত্যা করলাম। তার মাথা কেটে এনে আপনার পায়ে অর্পন করলাম। এবার বলুন, আমার পাপের কাফফারা আদায় হলো কিনা। না হলে আপনি আমাকে আবারো বন্দী করুন এবং এভাবে আমার মাথাটাও কেটে ছুঁড়ে ফেলুন।'

সুলতান আইউবী আযরকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর হাতে তুলে দিয়ে বললেন– 'এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন। লোকটি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছে। আমি ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না, দুশমনের গুপ্তচর পূর্ণ তথ্য নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা আমাদের ফাঁদে এসে পা দিলো কেন! এবার বুঝলাম, আযর পালিয়ে সংবাদ জানাতে যায়নি– গিয়েছিলো পিতাকে খুন করতে!'

পরদিন। সুলতান আইউবী তাঁবুতে ঘুমিয়ে আছেন। বাইরে অনেকগুলো লোকের কথোপকথনে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। সুলতান দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন– 'বাইরে কী হচ্ছে?' দারোয়ান বললো– 'আপনার মোহাফেজদের উর্দি পরে এবং আপনার ঝাণ্ডা উঁচিয়ে নয়জন লোক এসেছে। বলছে, তারা দামেস্ক থেকে এসেছে। তারা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আপনার রক্ষী বাহিনীতে কাজ করতে চায়। বাঁধা দেয়া হলে তারা বললো, তারা বহুদূর থেকে পরম ভক্তি ও জযবা নিয়ে এসেছে। তারা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।'

এরা শেখ সান্নান ও গোমস্তগীনের প্রেরিত সেই ঘাতকচক্র। কৌশল তাদের সফল। সুলতান আইউবী দারোয়ানকে বললেন– 'তাদেরকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও।'

তাদের হাতের বর্শাগুলো বাইরে রেখে দেয়া হয়েছে। তারা সুলতান আইউবীর তাঁবুতে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে যার যার খঞ্জর ও তরবারী বের করে হাতে নেয়। সুলতান আইউবীর দু'জন রক্ষীও তাদের সঙ্গে প্রবেশ করে। এক ঘাতক সুলতান আইউবীর উপর হামলা করে বসে। সুলতান দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন করে আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি নিজের তরবারীটা হাতে তুলে নেন। প্রথম আঘাতেই আক্রমণকারী দুর্বৃত্তের পেট চিড়ে ফেলেন। তাঁবুর ভেতরের স্থানটা সংকীর্ণ। অন্যান্য ঘাতকরাও সুলতানের উপর আক্রমণ করে। রক্ষীদ্বয় শক্ত হাতে তাদের মোকাবেলা করে। বাহির থেকে অন্যান্য রক্ষীরাও এসে পড়ে।

সুলতান আইউবীর তাঁবুতে তরবারী ও খঞ্জরের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়।

দেহরক্ষীরা ঘাতকদেরকে নিজেদের সঙ্গে ব্যস্ত করে ফেলে। লড়াই করতে করতে তারা তাঁবুর বাইরে চলে আসে। সুলতান আইউবীর লম্বা তরবারী কাউকে কাছে আসতে দিচ্ছে না। পাঁচ-ছয়জন ঘাতক প্রাণ হারায়। অন্যরা টিকতে না পেরে পালাতে উদ্যত হয়। তাদেরকে জীবিত ধরে ফেলা হলো।

ইত্যবসরে তাঁবুর ভেতর থেকে এক ঘাতক সদস্য বেরিয়ে আসে। তার পোশাক রক্তরঞ্জিত। সুলতান আইউবীর পিঠটা ছিলো তার দিকে। সুযোগ বুঝে সে সুলতানের উপর পিছন থেকে আঘাত হানতে উদ্যত হয়। এক দেহরক্ষী যথাসময়ে ঘটনাটা দেখে ফেলে। সে চিৎকার করে ওঠে– 'নীচে সুলতান!' বলেই সে আক্রমণকারীর দিকে ছুটে যায়। সুলতান আইউবী সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েন। ঘাতকের তরবারী বাতাসে আঘাত হেনে সুলতানের উপর আক্রমণ করে। দেহরক্ষী ঘাতক সদস্যের পাজরে বর্শা সেঁধিয়ে দেয়। লোকটা পূর্ব থেকেই আহত ছিলো। এবার আঘাত খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ও মারা যায়।

সুলতান আইউবী এই আক্রমণ থেকেও প্রাণে রক্ষা পেয়ে যান।

শেখ সান্নান ও গোমস্তগীন প্রেরিত এই নয় ঘাতক সদস্য শপথ করে এসেছিলো, হয়তো তারা সুলতান আইউবীকে হত্যা করবে, অন্যথায় জীবন নিয়ে ফিরবে না। তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করতে পারেনি। তবে জীবিতও ফেরত যেতে পারেনি। যারা আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে বেঁচে গিয়েছিলো, সুলতান আইউবী তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

দৃষ্টির আড়ালে

সুলতান সালাউদ্দীন আইউবীর এক সালার আহার পরবর্তী আসরে কোনো এক যুদ্ধের আলোচনা করছিলেন। এক সৈনিকের বীরত্বের আলোচনা উঠলো। সুলতান আইউবী বললেন–

'কিন্তু ইতিহাসে নাম আসবে শুধু আপনার আর আমার। এটা ইতিহাস রচয়িতাদের চরম অবিচার যে, তারা সুলতান আর সালারের নীচের আর কারো প্রতি চোখ তুলেও তাকায় না। জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে বটে; কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের আত্মত্যাগ ছাড়া জয় সূচিত হয় না। আমাদের জানবাজ সৈনিকরা দুশমনের কাছে গিয়ে যদি তাদের আপন হয়ে যায়, তাহলে আমরা তাদের কী করতে পারবো? যুদ্ধের সময় সৈনিকরা লড়াই করার পরিবর্তে যদি নিজের জীবনের চিন্তা বেশী করে, তাহলে আমরা কিভাবে বিজয় অর্জন করবো? ইনসাফের দাবি হলো, ইতিহাসে আমাদের সেই সৈনিকদের কথাও উল্লেখ থাকতে হবে, যারা এক একজন দশ দশজন শত্রুসেনার মোকাবেলা করে বিজয় ছিনিয়ে আনছে এবং জাতীয় পতাকা অবনমিত হতে দিচ্ছে না। এই সৈনিকরা যদি কখনো পরাজিত হয়, হবে আপনার-আমার অযোগ্যতার কারণে। কিংবা তাদেরকে সেই গাদ্দার ও ঈমান নিলামকারীরা পরাজয়ের মুখে ঠেলে দেবে, যারা আপন সেজে শত্রুর হয়ে কাজ করছে।'

'আচ্ছা, আল্লাহ্ আমাদেরকে কোন্ পাপের শাস্তি প্রদান করছেন যে, তিনি আমাদের মাঝে গাদ্দার সৃষ্টি করে দিচ্ছেন?' আসরের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো।

'আমি আলিম নই যে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তবে সম্ভবত আল্লাহ গাদ্দারের মাধ্যমে আমাদের সদা শংকিত করে রাখতে চাচ্ছেন, যাতে আমরা প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকি এবং একের পর এক বিজয় অর্জন করে প্রবঞ্চিত না হয়ে পড়ি। তবে আল্লাহর প্রকৃত ইচ্ছা কি, তা তিনিই জানেন। আমার ভয় হচ্ছে, ঈমান-বিক্রেতারা কোন না কোন কালে ইসলামের মর্যাদাকে ডুবিয়ে ছাড়বে। খৃস্টানদের প্রত্যয় আপনার অজানা নয়

যে, তাদের যুদ্ধ আপনার-আমার বিরুদ্ধে নয়– ইসলামের বিরুদ্ধে। তাদের ঘোষণা হলো, যতোদিন পর্যন্ত ক্রুশের অস্তিত্ব থাকবে, তারা চাঁদ-তারার বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকবে। এই প্রত্যয় তারা অনাগত প্রজন্মের জন্যও রেখে যাবে। আমি চাই, আমাদের সেই সাধারণ সৈনিকদের জীবনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকুক, যারা উত্তর মিশরের মরু প্রান্তরে, হামাতের বরফ-ঢাকা উপত্যকায় লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। আমি চাই, সেই জানবাজ গেরিলাদের কথাও ইতিহাসে লিখে রাখা হোক, যারা দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করে বিজয় কেড়ে এনেছে, যা সমগ্র বাহিনীর পক্ষেও সম্ভব ছিলো না। এদের ক'জন জীবন নিয়ে ফিরে আসে? দশজনের মধ্য থেকে একজন! তাও আসে আহত হয়ে।'

'হ্যাঁ, মোহতারাম সুলতান!'– সালার বললেন– 'এ এক মূল্যবান সম্পদ, যা আমরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে যাবো। বীরত্বের কাহিনী পাঠ করে জাতিসমূহ বেঁচে থাকে।'

'তুমি সম্ভবত জানো না, আমাদের সৈনিকরা দেশ থেকে অনেক দূরে জাতির দৃষ্টির আড়ালে এমন যুদ্ধ লড়ে যাচ্ছে, যার নির্দেশ আমরা তাদেরকে দেইনি।'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তাদের উপর তাদের ধর্মের মর্যাদাবোধ জাগ্রত থাকে। তাদের নিজেদের জীবন বলতে কিছু থাকে না। তাদের কোনো ব্যক্তিসত্ত্বা নেই। তারা দুশমনের কব্জায় পড়েও স্বাধীন থাকে। জাতি যখন বিজয় অর্জন করে, তখন তারা তাদের সম্পর্কে অনবহিত থাকে। তারা পর্দার আড়ালে থেকে বিস্ময়কর ও অভিনব পদ্ধতিতে লড়াই করে জাতির নাম উজ্জ্বল করে থাকে।'

সে যুগের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে এরূপ জনাকয়েক সৈনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের আলোচনা সুলতান আইউবী করেছিলেন। তাদের একজনের নাম আমর দরবেশ। লোকটি সুদানী মুসলমান। উপরে উল্লেখিত হয়েছে যে, সুলতান আইউবীর ভাই তকিউদ্দীন সুদানের সেনা অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা দুশমনের প্রতারণার শিকার হয়ে সুদানের মরু অঞ্চলে এতো দূরে চলে গিয়েছিলো যে, সে পর্যন্ত রসদের সরবরাহ বজায় রাখা সম্ভব ছিলো না। দুশমন তাদের রসদের পথ বন্ধ করে দেয় এবং তকিউদ্দীনের বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করে তাদের কেন্দ্রীয় কমান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলো। তাতে ইসলামী বাহিনীর অনেক ক্ষতি সাধিত হয়েছিলো। অগ্রযাত্রার আশা তো শেষ হয়েই গিয়েছিলো। এমনকি পিছপা হওয়াও সম্ভব ছিলো না। বহু সৈন্য বন্দীত্ব বরণ করে। তাদের মধ্যে তকিউদ্দীনের দু' তিনজন নায়েব, সালার এবং কমান্ডারও ছিলেন।

এই বন্দীদের মধ্যে মিশরী এবং বাগদাদীদের সংখ্যা ছিলো বেশী। কয়েকজন সুদানী মুসলমানও ছিলো। শেষে সুলতান আইউবী তার সামরিক দক্ষতা এবং অস্বাভাবিক বিচক্ষণতার বিনিময়ে তকিউদ্দীনের বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে সুদান থেকে বের করে এনেছিলেন। তারপর তিনি এই বার্তাসহ সুদানীদের নিকট দূত প্রেরণ করেন যে, আমার যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দাও। সুদানীরা আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, সুলতান আইউবীর নিকট তাদের কোনো বন্দী ছিলো না। তারা বন্দীদের বিনিময়ে মিশরের কিছু ভূখণ্ড দাবি করে। সুলতান আইউবী জবাব দেন– 'তোমরা আমাকে ও আমার সন্তানদের ফাঁসি দিয়ে দাও। তবু আমি সালতানাতে ইসলামিয়ার এক ইঞ্চি ভূমি তোমাদেরকে দেবো না। আমার সৈনিকরা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমান। তারা জাতির ইজ্জতের জন্য জীবন কুরবান করতে জানে।'

তারপর সুদান সরকার হাবশীদের দ্বারা মিশর আক্রমণ করায়। এই আক্রমণ অভিযানে অংশগ্রহণকারী একজন হাবশীও সুদান ফিরে যেতে পারেনি। যারা জীবিত ছিলো, তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। আশা ছিলো, সুদানীরা বন্দীদের মুক্তির দাবি জানাবে। কিন্তু তারা কোনো দূত প্রেরণ করেনি। এই হাবশীদেরকে তারা ধোঁকা দিয়ে মিশর এনেছিলো। এরা তাদের নিয়মিত সৈনিক ছিলো না। সুলতান আইউবী এই হাবশী কয়েদীদেরকে তার সেনাবাহিনীর শ্রমিক বানিয়ে নেন। তাদের দ্বারা মাটি খনন, বোঝা বহন এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ নেয়া হতো।

সুদানীরা সুলতান আইউবীর সৈন্যদেরকে মুক্তি না দেয়ার মূল কারণ ছিলো, তারা তাদেরকে সুদানী ফৌজে যোগ দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলো। সুদানীদের নিকট খৃস্টান উপদেষ্টা ছিলো। তারাই তাদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করছিলো। মিশরী সৈন্যদেরকে ফুঁসলিয়ে সুদানী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার পরিকল্পনাও তাদেরই শেখানো ছিলো। তারা কতজন মিশরী সৈনিককে এভাবে দলে ভেড়াতে সক্ষম হয়েছিলো, ইতিহাস তার সংখ্যা জানাতে অপারগ। তবে সুদানীদের প্রতি ভালোবাসার অস্ত্র যাকেই ঘায়েল করতে ব্যর্থ হয়েছিলো, তাকেই অত্যন্ত নির্দয় ও নির্মম নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে হত্যা করেছিলো, সে তথ্য প্রমাণিত।

এই কয়েদীদের মধ্যে ইসহাক নামক এক সেনা কর্মকর্তা ছিলেন, যিনি সুলতান আইউবীর কোন এক সেনা ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন। তিনি ছিলেন সুদানের অধিবাসী। যৌবনেই মিশরী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। সুদানের

এক পাহাড়ী এলাকায় কিছু মুসলমানের বাস ছিলো। যাদের সংখ্যা চার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে। তাদের বিভিন্ন গোত্র ছিলো। কিন্তু ইসলাম তাদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করে রেখেছিলো। সবক'টি গোত্রের কমান্ডারদের একটি পঞ্চায়েত ছিলো। সকল গোত্রের সব মানুষ এই পঞ্চায়েতের আইন ও সিদ্ধান্ত মেনে চলতো। তারা মিশরী ফৌজে ভর্তি হতো এবং সুদানী ফৌজকে এড়িয়ে চলতো। তারা ছিলো যোদ্ধা এবং সাহসী। তীরান্দাজীতে অভিজ্ঞ ছিলো তারা। সুদানী ফৌজ ও সরকার প্রলোভন দেখিয়ে এবং আক্রমণ করে নিঃশেষ করে দেয়ার হুমকি দিয়েও তাদেরকে ঘায়েল করতে পারেনি। কিন্তু ঈমানী শক্তির পাশাপাশি তাদের একটি সহায়ক শক্তি ছিলো পাহাড়। সুদানীরা তাদের উপর দু'বার আক্রমণ করেছিলো। কিন্তু তীরান্দাজরা পাহাড়ের চূড়া থেকে তীর বর্ষণ করে তাদেরকে প্রতিহত ও পরাজিত করে।

তকিউদ্দীনের সামরিক পদস্খলনের কারণে সুদানীদের হাতে বহুসংখ্যক মিশরী সৈন্য বন্দী হয়েছিলো। ইসহাক তাদের একজন। নিজ গোত্রসমূহের উপর তার ব্যাপক প্রভাব ছিলো। বন্দী হওয়ার পর সুদানীরা তাকে প্রস্তাব করে, তুমি তোমার মুসলিম গোত্রগুলোকে সুদানী ফৌজে যোগ দিতে সম্মত করো, তাহলে তোমাকে শুধু মুক্তিই দেয়া হবে না বরং যে পাহাড়ী অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা মুসলমান, সেই সবগুলো অঞ্চল নিয়ে একটি আলাদা রাজ্য গঠন করে তোমাকে তার গভর্নর বা রাজা নিযুক্ত করা হবে।

'আমি আগে থেকেই সেই রাজ্যের রাজা'– ইসহাক জবাব দেন– 'এটি আমাদের স্বাধীন রাজ্য।'

'ওটা সুদানের ভূখণ্ড'– তাকে বলা হলো– 'একদিন সেখানকার লোকদেরকে বন্দী করে ফেলবো কিংবা ধ্বংস করে দেবো।'

'আগে তোমরা এলাকাটা দখল করো'– ইসহাক বললেন– 'সেখানকার মুসলমানদেরকে নিরস্ত্র করো। তোমরা তাদেরকে তোমাদের ফৌজে শামিল করতে পারবে না। ঐ এলাকায় তোমাদের পতাকা নিয়ে দেখাও। তারপর দেখো, তারা তোমাদের ফৌজে শামিল হয় কিনা।'

ইসহাককে কয়েদখানায় রাখার পরিবর্তে একটি সুরম্য কক্ষে রাখা হলো, যেটি কোনো এক রাজপুত্রের মহল বলে মনে হলো। এক সুদানী সালার তাকে উক্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়ে নিজের তরবারীটা উভয় হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে তাঁর সম্মুখে বসে তরবারীটা তার সমীপে পেশ করে বললো– 'আপনি আমাদের বন্দী নন, অতিথি।'

'আমি এই তরবারী গ্রহণ করবো না'– ইসহাক বললেন– 'আমি অতিথি নই, বন্দী। আমি পরাজিত। আপনার থেকে আমি তরবারী সেভাবেই নেবো, যেভাবে আপনি আমার থেকে নিয়েছেন। তরবারী তরবারীর জোরে নেয়া হয়।'

'কিন্তু আপনি আমাদের শত্রু নন।' সুদানী সালার বললো।

'আমি আপনার শত্রু'– ইসহাক মুচকি হেসে বললেন– 'তরবারীর বিনিময় এমন সুরম্য কক্ষে নয়– যুদ্ধের ময়দানে হয়ে থাকে। আমি আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি যে, আপনি আমাকে এতোটুকু সম্মান করলেন।'

'আমরা আপনাকে আরো বেশী সম্মান করবো'– সালার বললো– 'আপনার সিংহাসন খার্তুমের সিংহাসনের সমপর্যায়ের হবে।'

'আর কিয়ামতের দিন আমার মসনদ থাকবে জাহান্নামের অতল তলে।' ইসহাক বললেন।

'আমি দুনিয়ার কথা বলছি।'

'কিন্তু মুসলমান কথা বলে আখেরাতের'– ইসহাক বললেন– 'যা হোক, বলুন আপনার পর আর কে আসবেন এবং কী উপহার নিয়ে আসবেন?'

'যে আসে আসুক'– সালার মুচকি হেসে বললো– 'আমিও সৈনিক আপনিও সৈনিক। আমি আপনার সৈনিক সুলভ কীর্তির মূল্যায়ন করতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি আমার মনটা ভেঙ্গে দিলেন।'

'আপনি আমার সৈনিক সুলভ কীর্তি দেখলেন কখন?'– ইসহাক বললেন– 'আমি তো যুদ্ধ করার সুযোগই পেলাম না। আমার সেনাদল মরুভূমির এমন একটি স্থানে গিয়ে উপনীত হয়, যেখানে পানির কোনো চিহ্ন ছিলো না। তিন-চার দিনেই মরুভূমি আমার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিক এবং ঘোড়াগুলোকে হাড্ডিতে পরিণত করে ফেলে। তারা জিহ্বা বের করে পানির অনুসন্ধান করতে শুরু করে। এই অবস্থায় আপনার একটি বাহিনী আমাদের উপর হামলা করে বসে এবং আমরা ধরা পড়ে যাই। মরুভূমি আমাদেরকে পরাজিত করেছে। আপনি আমার তরবারীর পরাকাষ্ঠা কোথায় দেখলেন যে, আমাকে কৃতিত্বের পুরস্কার প্রদান করছেন?'

'আমাকে অবহিত করা হয়েছে, আপনি বীরযোদ্ধা।' সালার বললো।

'শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই'– ইসহাক বললেন– 'কাল সকালে আমাকে একটি তরবারী দেবেন। আপনিও একটি নেবেন। তারপর আপনার আমার মোকাবেলা হবে। তখন আশা করি, আমি আপনার তরবারী গ্রহণ করে নেবো। কিন্তু সে সময়ে আপনি জীবিত থাকবেন না।'

সালার আরো কি যেনো বলতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে ইসহাক বললেন– 'মন দিয়ে শোনো, সম্মানিত সালার! কাল তোমরা আমাকে যে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করবে আজই তা করে ফেলো। তোমার এই সুদর্শন কয়েদখানায় মাতাল হয়ে আমি ঈমান বিক্রি করবো না।'

'কয়েকখানার নোংরা পরিবেশের পরিবর্তে আপনি এই হৃদয়কাড়া পরিবেশেই ভালোভাবে চিন্তা করতে পারবেন'– সালার বললো– 'আমি আশা করি; আপনার সম্মুখে যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, আপনি তা ভেবে দেখবেন। একজন সৈনিক ভাই মনে করে আমার এই পরামর্শটা মেনে নিন যে, নিজের ভবিষ্যৎটা অন্ধকার করবেন না। খোদা আপনার ভাগ্যে রাজত্ব লিখে রেখেছেন। সুযোগটা নষ্ট করবেন না।'

'আমার আল্লাহ আমার ভাগ্যে যা কিছু লিখে রেখেছেন, আমি তা ভালোভাবে জানি'– ইসহাক বললেন– 'আর তোমার খোদা কী লিখে রেখেছেন, তাও জানি। তুমি চলে যাও, আমাকে ভাবতে দাও।'

সালার চলে যায়। কিছুক্ষণ পর খাবার এসে হাজির হয়। খাবার নিয়ে এসেছে তিনটি মেয়ে– অতিশয় রূপসী যুবতী মেয়ে, অর্ধনগ্ন। নানা রকম উন্নতমানের খাবার, যা ইসহাক কখনো স্বপ্নেও দেখেনি। সঙ্গে সুদর্শন সোরাহীতে মদ। ইসহাক তাঁর প্রয়োজন অনুপাতে আহার করে পানি পান করে। দস্তরখান তুলে নেয়া হয়। দু'টি মেয়ে চলে যায়। একটি তার কাছে থেকে যায়। ইসহাক মেয়েটির প্রতি তাকায়। মেয়েটি অবজ্ঞা মিশ্রিত মুচকি একটা হাসি দেয়।

'আমাকে কি আপনার ভালো লাগছে না?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'তোমার ন্যায় কুৎসিত মেয়ে আমি এই প্রথম দেখলাম।' ইসহাক বললেন।

মেয়েটির চেহারার রং বদলে যায়। সে তো অত্যন্ত রূপসী মেয়ে। ইসহাক তার বিস্ময় ভাব বুঝতে পেরে বললেন– 'রূপ থাকে লাজে। নারী যদি উলঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে তার আকর্ষণ শেষ হয়ে যায়। উলঙ্গপনা তোমার জাদুময়তা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি এখন আর তোমার মুঠোয় যাবো না।'

'আমাকে দেখেও কি আপনি আমার প্রয়োজন অনুভব করছেন না।' মেয়েটি বললো।

'আমার দেহের তোমার কোনো প্রয়োজন নেই'– ইসহাক বললো– 'আমার আত্মার একটি প্রয়োজন আছে, যা তুমি পূরণ করতে পারবে না। তুমি চলে যাও।'

'আমার প্রতি নির্দেশ, আমি আপনার কাছে থাকবো'– যুবতী বললো– 'ব্যত্যয় করলে শাস্তিস্বরূপ আমাকে হাবশীদের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

'দেখো মেয়ে'– ইসহাক বললেন– 'আমি মুসলমান। আমার চিন্তাধারা ও চরিত্র তোমার চেয়ে ভিন্ন। আমার ধর্ম আমাকে বেগানা মেয়েকে সঙ্গে রাখার অনুমতি দেয় না। আমি তোমাকে আমার এই কক্ষে রাখতে পারি না। যদি তুমি এই কক্ষে রাত কাটানোর আদেশ নিয়ে এসে থাকো, তাহলে তুমি থাকো, আমি বাইরে গিয়ে ঘুমাই।'

'আমার জন্য এটাও অপরাধ বলে বিবেচিত হবে'– মেয়েটি বললো– 'আপনি আমাকে এই কক্ষে থাকতে দিন। আমার প্রতি দয়া করুন।' মেয়েটি বুঝে ফেললো, লোকটি পাথর। তাই সে ইসহাকের নিকট অনুনয়-বিনয় করতে শুরু করলো।

'তোমার কাজ কী?'– ইসহাক জিজ্ঞেস করেন– 'তোমাকে আমার কাছে কী উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে? যদি বলো, থাকতে দেবো।'

'আমার কাজ হলো আপনার ন্যায় পুরুষদেরকে মোমে পরিণত করা'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আপনিই প্রথম পুরুষ, যিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি বহু ধর্মীয় কর্ণধারকে আমার অনুরক্ত বানিয়েছি এবং তাদেরকে সুদানের ছাঁচে ঢেলে নিজের মতো করে প্রস্তুত করেছি।' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে– 'আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি আমাকে কুৎসিত ভেবেছেন, নাকি ঠাট্টা করলেন?'

'তোমরা যাকে সুগন্ধি বলো, আমার কাছে তা দুর্গন্ধ'– ইসহাক বললেন– 'আমার দৃষ্টিতে তুমি বাস্তবিকই কুৎসিত। যা হোক, তুমি যেখানে ইচ্ছা শুয়ে পড়ো। আচ্ছা, তুমি খাটে শোও, আমি মেঝেতে শোবো।

মেয়েটি মেঝেতে শুয়ে পড়ে।

'তোমার নাম কী মেয়ে?' ইসহাক জিজ্ঞেস করেন।

'আশি।'

'তোমার ধর্ম?'

'আমার কোনো ধর্ম নেই।'

'তোমার পিতামাতা কোথায় থাকেন?'

'জানি না।'

ইসহাকের চোখে ঘুম এসে যায়। অল্পক্ষণ পরই তিনি নাক ডাকতে শুরু করেন।

❖ ❖ ❖

'আপনারা এমন এক ব্যক্তির পেছনে সময় নষ্ট করছেন'– আশি বললো। তার সম্মুখে সুদানী ফৌজের পদস্থ অফিসারগণ উপবিষ্ট– 'তার মধ্যে চেতনা বলতে কোনো বস্তু নেই। আমি কত কঠিন পাথরকে মোমে পরিণত করেছি,

আপনারা তা জানেন। কিন্তু এর মতো মানুষ আমি আর দেখিনি।'

'বোধ হয় তুমি কোনো ত্রুটি করেছো।' এক অফিসার বললো।

ইসহাককে জালে আটকবার জন্য যা যা করেছে, যতো সব ফাঁদ-ফন্দি অবলম্বন করেছে, মেয়েটি তার সবিস্তার বিবরণ প্রদান করে এবং জানায়– 'আমি যতো যা কিছু করেছি, তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়ে আমার প্রতি নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকেন এবং কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়েন।'

সুদানী কর্মকর্তাগণ চার-পাঁচদিন পর্যন্ত ইসহাককে তাদের মতে আনার চেষ্টা চালাতে থাকে। তার মানসিকতা পরিবর্তনের কোনো পন্থাই তারা বাদ রাখেনি। কিন্তু ইসহাকের একটাই কথা– আমি মিশরী ফৌজের একটি ইউনিটের কমান্ডার, আমি মুসলমান, আমি একজন বন্দী।

অবশেষে তাকে মহল থেকে বের করে কয়েদখানায় নিয়ে একটি সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখা হলো। কক্ষের ছিদ্রযুক্ত দরজা তালাবদ্ধ করে রাখা হলো। কক্ষটি এতোই দুর্গন্ধময় যে, ইসহাকের মস্তিষ্ক বিগড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

রাতের বেলা। কক্ষটি অন্ধকার। এক সৈনিক একটি বাতি নিয়ে এসে দরজার ছিদ্র দিয়ে ইসহাকের হাতে দেয়। ইসহাক বাতিটি মেঝেতে রেখে দেয়। বাতির আলোতে তিনি কক্ষে পচা-গলা লাশ দেখতে পায়। লাশটির মুখ খোলা। চোখও খোলা। ইসহাক সৈনিককে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এটি কার লাশ?'

'তোমার কোনো এক বন্ধুর'– সৈনিক জবাব দেয়– 'কোনো এক মিশরী। যুদ্ধে ধরা পড়েছিলো। লোকটাকে অনেক নির্যাতন করে খুন করা হয়েছে। পাঁচ-ছয় দিন আগে এই কক্ষে মারা গেছে।'

'তা লাশটা এখানে পড়ে আছে কেন?' ইসহাক জিজ্ঞেস করেন।

'তোমার জন্য'– সৈনিক অবজ্ঞার সুরে বললো– 'তাকে তুলে নেয়া হলে তুমি একা হয়ে যাবে তাই।' সৈনিক অট্টহাসি হেসে চলে যায়।

ইসহাক বাতিটা উপরে তুলে লাশটা পরখ করতে থাকে। পোশাক দেখে বুঝে ফেলেন লোকটা মিশরী ফৌজের সদস্য।

ইসহাক কক্ষে প্রবেশ করার পর যে দুর্গন্ধ অনুভব করেছিলেন, তা উবে যায়। তিনি গলিত লাশটির মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে বললেন– 'তোমার দেহ নিঃশেষ হয়ে যাবে। তোমার আত্মা সতেজ থাকবে। তুমি আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছো। তুমি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি জীবিত আছো এবং জীবিত থাকবে। সৈনিক ঠিকই বলেছে যে, তুমি না থাকলে আমি নিঃসঙ্গ হতাম।'

ইসহাক দীর্ঘক্ষণ সঙ্গীর লাশের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর তার পাশে শুয়ে

ঘুমিয়ে পড়েন। ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি দেখতে পান, সেই সুদানী সালার দাঁড়িয়ে আছে। সৈনিক বললো– 'কিছুর প্রয়োজন হলে বলুন, এনে দেই।'

'আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝি'– ইসহাক বললেন– 'আমি পরাজিত। তুমি আমাকে তিরষ্কার করতে পারো। তবে সত্যিই যদি তুমি আমার প্রয়োজন পূরণ করতে আগ্রহী হয়ে থাকো, তাহলে নিশ্চয়ই রণাঙ্গন থেকে তোমরা মিশরের পতাকা কুড়িয়ে পেয়ে থাকবে। আমাকে একটি পতাকা এনে দাও, লাশটা ঢেকে রাখি।'

সালার অট্টহাসি হেসে বললো– 'আমরা কি তোমাদের পতাকা বুকে জড়িয়ে রেখেছি? মিশরের কোনো পতাকায় হাত লাগানোকেও আমরা অপমানবোধ করি।' সে সিপাহীকে বললো– 'একে এখান থেকে বের করে নীচে নিয়ে যাও। লাশ এখানে পড়ে থাকুক।'

ইসহাককে কয়েকদখানার পাতাল কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। এখানে অসহনীয় উৎকট দুর্গন্ধ। ইসহাক বুঝে ফেললেন, এখানেও লাশ আছে, অনেকগুলো লাশ। সুদানী সালার আগে আগে হাঁটছে। এক স্থানে ছয়-সাতজন মিশরী উল্টো মুখো ঝুলে আছে। তাদের বাহুর সঙ্গে পাথর বাঁধা। এক ধারে এক ব্যক্তিকে বড় একটি ক্রুশের সঙ্গে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যে, তার দু'হাতের তালুতে একটি করে পেরেক গাঁথা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে।

এখানে আটক শত্রুসেনাদের কিরূপ নির্যাতন-নিপীড়ন করা হচ্ছে, এই পাতাল কক্ষে ঘুরিয়ে ইসহাককে তার দৃশ্য দেখানো হলো। স্থানে স্থানে রক্ত। কোনো কোনো বন্দী বমি করছে। কয়েকজন অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। নির্যাতনের সব ধরন প্রদর্শন করিয়ে সুদানী সালার ইসহাককে জিজ্ঞেস করে– 'এবার বলো কোন্ পন্থাটি তোমার পছন্দ হয়। তবে নির্যাতন-নিপীড়ন ছাড়াই যদি তুমি আমাদের কথা মেনে নাও, তাহলে তোমারই জন্য তা কল্যাণকর হবে।'

'তোমাদের যেমন খুশী আমার উপর নিপীড়ন চালাও। আমাকে যেখানে খুশী নিয়ে যাও। আমি জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।' ইসহাক বললেন।

'তোমাকে দিয়ে আমরা কী করাতে চাই, আমি পুনরায় তোমাকে বলে দিচ্ছি'– সালার বললো– 'তোমাকে বলা হয়েছিলো, সবক'টি মুসলিম কবিলাকে সুদানী বাহিনীতে নিয়ে আসো। বিনিময়ে তোমাকে মুক্তিও দেয়া হবে এবং মুসলিম গোত্রসমূহের শাসকও নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু সেই সুযোগ তুমি হারিয়ে ফেলেছো। এবার প্রস্তাব হলো, আমাদের মতে চলে আসো,

বিনিময়ে তোমাকে নিপীড়ন থেকে রেহাই দেয়া হবে এবং সুদানী ফৌজের সম্মানজনক একটি পদ দেয়া হবে।'

'আমার কোন পদের প্রয়োজন নেই। তোমরা আমার সঙ্গে যেমন খুশী আচরণ করো।' ইসহাক বললেন।

ইসহাকের নিপীড়নের পালা শুরু হলো। পায়ে শিকল পরিয়ে পা দুটো ছাদের সঙ্গে বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হলো। সালার সিপাহীদের বললো– 'একে সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবে থাকতে দিও। সন্ধ্যার সময় লাশের কক্ষে ফেলে এসো। আশা করি, এতটুকুতে লোকটার মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

❖ ❖ ❖

সন্ধ্যা নাগাদ ইসহাক সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। যখন জ্ঞান ফিরে পান, তখন তিনি মিশরী সহকর্মীর লাশের নিকট পড়ে আছেন। কক্ষের এক কোণে সামান্য পানি আর কিছু খাবার রাখা ছিলো। ইসহাক পানিটুকু পান করেন এবং খাবার খান। তিনি লাশটিকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আমি তোমার আত্মার সঙ্গে প্রতারণা করবো না। শীঘ্রই আমি তোমার নিকট চলে আসছি।'

কথা বলতে বলতে ইসহাকের চোখ বুজে আসছে। ইসহাক ঘুমিয়ে পড়েন।

মধ্যরাতে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে চাকার সঙ্গে বাঁধা হলো। সুদানী সালার উপস্থিত। সে বললো– 'হাজার হাজার মুসলমান আমাদের সঙ্গে আছে। তুমি বোধ হয় পাগল হয়ে গেছো। তুমি ইসলামের জন্য ত্যাগ দিচ্ছো; অথচ সালাহুদ্দীন আইউবী নিজের রাজত্ব বিস্তারের জন্য তোমার ন্যায় পাগলদেরকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিচ্ছে। লোকটা মদও পান করে, নারীও ভোগ করে। আর তোমরা কিনা তার নামে জীবন উৎসর্গ করছো।'

'সেনাপতি মহোদয়!'– ইসহাক বললেন– 'তোমাকে আমার ধর্ম ও সুলতানের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখার সাধ্য আমার নেই। আর তুমিও আমাকে আমার ধর্ম ও রাজ্যের জন্য জান কুরবান দেয়া থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। আমার জাতির কোনো গোত্রের একজন মুসলমানও তোমার ফৌজে যোগ দেবে না। মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করে না।'

'তুমি সম্ভবত জানো না আরবে মুসলমান মুসলমানের রক্ত ঝরাচ্ছে'– সালার বললো– 'খৃস্টানরা ফিলিস্তিনে বসে বসে তামাশা দেখছে। সকল আমীর ও মুসলিম শাসকগণ সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।'

'তারা হয়তো করেছে'– ইসহাক বললেন– 'কিন্তু আমি করবো না। যারা

ইসলাম ও ইসলামী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তারা এ জগতেও ভুগবে, পরজগতেও ভুগবে। তুমি তোমার সময় নষ্ট করো না। আমার সঙ্গে যা কিছু করতে চাও করে ফেলো। তারপর আরেকজন সুদানী মুসলমানকে ধরে আনো। তার দ্বারা তোমার কাজ হতে পারে।'

'আমরা জানতে পেরেছি, তুমি শুধু একটা ইশারা করলেই সমস্ত মুসলমান আমাদের সঙ্গে চলে আসবে'– সালার বললো– 'আমরা তোমার দ্বারা এ কাজ বিনামূল্যে করাতে চাই না। আমরা তোমার ভাগ্য বদলে দেবো।'

'আমি শেষবারের মতো বলছি, আমি আমার জাতিকে বিক্রি করবো না।' ইসহাক বললেন।

ইসহাক চাক্কির সঙ্গে বাঁধা। লম্বা যে খুঁটিটা ধাক্কা দিলে চাক্কি নড়তে শুরু করে, তিন-চারজন হাবশী তার সন্নিকটে দণ্ডায়মান। সুদানী সালারের ইঙ্গিত পেয়ে তারা খুঁটিটা ধাক্কা দিয়ে একপা সম্মুখে সরিয়ে দেয়। চাক্কি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে। ইসহাকের দেহটা একবার উপরে একবার নীচে উঠানামা করতে থাকে। তার বাহুদ্বয় কাঁধ থেকে আর পদদ্বয় হাঁটু থেকে ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। শরীর থেকে তার এমন ধারায় ঘাম ঝরতে শুরু করে, যেনো কেউ উপর থেকে পানি ঢেলে দিয়েছে।

'এবার ভেবে-চিন্তে জবাব দাও।' ইসহাকের কানে সুদানী সালারের কণ্ঠ ভেসে আসে।

'আমি ঈমান বিক্রি করবো না।' ইসহাক ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দেন।

চাক্কিটা আরো সম্মুখে টেনে নেয়া হয়। ইসহাকের গায়ের চামড়া ছিলে যেতে শুরু করে।

'এখনও সময় আছে, জবাব দাও।'

'আমার লাশও একই উত্তর দেবে– আমি ঈমান বিক্রি করবো না।' বড় কষ্টে ইসহাক জবাব দেন।

'একে কিছুক্ষণ এভাবে থাকতে দাও'– সালার আদেশ করে– 'তারপর প্রস্তাব মেনে নেবে।'

ইসহাক কুরআন তিলাওয়াত করতে শুরু করেন। সালার চলে যায়। তার দেহের জোড়াগুলো যেনো খুলে যাচ্ছে। চামড়াগুলো ছিলে যাচ্ছে। মুখটা আকাশের দিকে। তিনি কল্পনায় মহান আল্লাহকে সম্মুখে দেখতে পান। বললেন– 'ইয়া আল্লাহ! আমি গুনাহগার। তুমি আমাকে আরো শাস্তি দাও। আমি যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি, তাহলে তুমি আমাকে শাস্তিদান

করো। তোমার সম্মুখে আমি লজ্জিত হতে চাই না।'

তারপর চোখ বুজে পুনরায় কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করেন।

'তুমি চিৎকার করছো না কেন?'– ইসহাকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান সিপাহী বললো– 'তুমি উচ্চস্বরে চিৎকার করো; তাতে তোমার কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে।'

'আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না'– ইসহাক বললেন– 'চাক্কিটা আরো সামনের দিকে ঠেলে দাও।'

কয়েদখানার হিংস্র প্রকৃতির এই সিপাহী হাবশীদের বললো– 'চাক্কি আরো চালাও।' হাবশীদের ধাক্কা খেয়ে চাক্কি আরো সম্মুখে চলে যায়। ইসহাকের দেহটা মট মট করে শব্দ করে ওঠে। শুনে অপর এক সিপাহী ছুটে আসে। এসে সঙ্গীকে বললো– 'তোমাকে কে চাক্কি চালাতে বললো? লোকটা তো মরে যাবে। একে আরো কিছু সময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

চাক্কি কিছুটা নীচু করে দেয়া হয়।

'লোকটা বলছে, তার নাকি কোনো কষ্ট হচ্ছে না।' সিপাহী তার সঙ্গীকে বললো।

'তোমার কি চেতন আছে?'– সিপাহী ইসহাককে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কী বলছো?'

'অবচেতন মনে বলছে'– অপর সিপাহী বললো– 'তুমি চাক্কি যে পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেছো, সে পর্যন্ত গেলে মানুষ মারা যায়। লোকটার চেতন থাকতে পারে না।'

আমার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে বন্ধুগণ!'– ক্ষীণ কণ্ঠে ইসহাক বললেন– 'আমি আমার প্রভুর সঙ্গে কথা বলছি।'

সিপাহীদ্বয় বিস্ময়ের সাথে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে। একজন বললো– 'লোকটাকে তো অতোটা শক্তিশালী মনে হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে তো মহিষের ন্যায় হাবশীরাও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। লোকটা বোধ হয় আলিম হবে। তার সঙ্গে আল্লাহর শক্তি আছে।'

'হ্যাঁ, তোমরা ঠিক বলেছো'– ইসহাক বললেন– 'আমার নিকট আল্লাহর শক্তি আছে। আমি তাঁর কালাম পাঠ করছি। তোমরা চাক্কি পুরোপুরি চালিয়ে দেখো, আমার দেহ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং উভয় অংশ থেকে এই আওয়াজই শুনতে পাবে, যা এ মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছো।'

সিপাহী মুসলমান নয়। সুস্থ কোনো আদর্শ তার নেই। কুসংস্কারই তার ধর্ম। পীর-ফকির, পাগল-দেওয়ানারা তার খোদা। মূর্তিপূজাও করে সে। এই চাক্কির মর্ম ভালোভাবে বুঝে সে। ইতিপূর্বে সে দেখেছে, এই চাক্কির সঙ্গে বাঁধা মানুষটি তার সামান্য আন্দোলনেই চিৎকার করে ওঠতো এবং সবকিছু মেনে নিতো। চাক্কির আন্দোলন একটু বাড়িয়ে দিলে অজ্ঞান হয়ে যেতো এবং

কিছুক্ষণ পর মরে যেতো। কিন্তু ইসহাক চাক্কির সর্বশেষ কার্যকারিতা পর্যন্ত বেঁচে রইলো এবং সচেতন রইলো। তাতে সিপাহী বুঝে ফেলেছে এই লোকটি কোনো সাধারণ মানুষ নয়।

'তুমি কি আকাশের অবস্থা জানো?' এক সিপাহী জিজ্ঞেস করে।

'আমার আল্লাহ জানেন।' ইসহাক জবাব দেন।

'তোমার আল্লাহ কোথায়?' সিপাহী জিজ্ঞেস করে।

'আমার অন্তরে'- ইসহাক জবাব দেন- 'এতো নির্যাতনের পরও তিনি আমাকে যন্ত্রণা হতে রক্ষা করছেন। আমার কোনো কষ্টই হচ্ছে না।'

'আমি গরীব মানুষ'- এক সিপাহী বললো- 'এখানে তোমার মতো মানুষদের হাড় ভেঙ্গে স্ত্রী-সন্তানদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করি। তুমি আমার অবস্থার পরিবর্তন করে দিতে পারো।'

'বাইরে গিয়ে'- ইসহাক বললেন- 'আমি যা কিছু পাঠ করছি, তোমাকে শিখিয়ে দেবো; তোমার কিসমত বদলে যাবে।'

'আমরা চাক্কি নীচু করে দিচ্ছি'- এক সিপাহী বললো- 'সালারকে আসতে দেখলে আবার উপরে তুলে দেবো।'

'না'- ইসহাক বললো- 'আমি তোমাকে এই খেয়ানত করতে দেবো না। এটাই আমার শক্তি। একেই আমরা ঈমান বলে থাকি।'

'আমরা তোমাকে সাহায্য করবো'- এক সিপাহী বললো- 'তুমি যখন যা বলবে, তা-ই করে দেবো। সম্ভব হলে তোমাকে কয়েদখানা থেকে বের হতে সাহায্য করবো।'

সালার এসে গেছে।

'কী ব্যাপার, এখনও তোমার জ্ঞান ঠিক আছে?' বিস্ময়ের সুরে সালার জিজ্ঞেস করে।

'আমার আল্লাহ আমার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখেছেন।' ইসহাক জবাব দেন।

সালারের ইঙ্গিতে চাক্কিটা আরো সম্মুখে চালানো হয়। ইসহাক স্পষ্ট অনুভব করেন, তার দেহটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে গেছে এবং তার জীবনের শেষ মুহূর্ত এসে পড়েছে। তিনি কোঁকাতে কোঁকাতে আরো উচ্চস্বরে কালামে পাক তিলাওয়াত শুরু করেন। চাক্কি আরো সম্মুখে এগিয়ে নেয়া হলো। ইসহাকের দেহ থেকে মট মট শব্দ শোনা যায়, যেনো তার হাঁড়গুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে।

'এই ভেবে খুশী হয়ো না যে, আমরা তোমাকে জীবনে মেরে ফেলবো'- সুদানী সালার বললেন- 'তুমি জীবিত থাকবে এবং তোমার সঙ্গে প্রতিদিন

এরূপ আচরণ হতেই থাকবে। মেরে ফেলে আমরা তোমাকে নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেবো না।'

ইসহাক কোনো জবাব দিলেন না। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকেন।

সালারের ইঙ্গিতে চাক্কি কিছুটা নীচে নামিয়ে দেয়া হলো। ফৌজের অপর এক অফিসার সালারের সঙ্গে ছিলো। সালার তাকে সরিয়ে নিয়ে বললো– 'লোকটা বড় কঠিনপ্রাণ মনে হচ্ছে। এতো নিপীড়নের পরও অচেতন পর্যন্ত হলো না। শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলে মারা যাবে। কিন্তু লোকটাকে আরো ক'দিন বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমি অন্য একটি পন্থা ভাবছি। জানতে পেরেছি তার চৌদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ে আছে। স্ত্রীও আছে। তাদেরকে এই বলে এখানে নিয়ে আসবে যে, ইসহাক কয়েদখানায় মৃত্যু শয্যায় শায়িত। ইচ্ছে হলে তাকে দেখে যেতে পারো। আর যদি মৃত্যুবরণ করে, লাশটা নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ'– অফিসার বললো– 'এভাবে ধোঁকা দিয়েই আনতে হবে। অন্যথায় ওখানকার মুসলমানরা আমাদের কাউকে তাদের এলাকায় ঢুকতে দেবে না।'

'এনে তাদেরকে উলঙ্গ করে এর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাখবো'– সালার বললো– 'তারপর তাকে বলবো, আমাদের শর্ত মেনে নাও, অন্যথায় তোমার যুবতী মেয়ে ও স্ত্রীকে তোমার চোখের সামনে অপদস্ত করা হবে।'

সালারের অনুপস্থিতিতে যে দু'জন সিপাহী ইসহাকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলো, তারা নিকটে দাঁড়িয়ে সালার ও অফিসারের কথোপকথন শ্রবণ করছিলো। সালার তাদের একজনকে পাঠিয়ে ফৌজের কমান্ডারকে ডেকে আনেন। তাকে ইসহাকের গ্রামের ঠিকানা ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে ওখানে যেতে বলে এবং দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়। তাকে বিশেষভাবে বলে দেয়া হলো, মুসলমানদের সঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলবে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রশংসা করবে। অন্যথায় মুসলমানরা তোমাকে জীবিত ফিরে আসতে দেবে না।

কমান্ডার তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে যায়।

ইসহাককে নিপীড়নযন্ত্র থেকে নামিয়ে সেই কক্ষে নিক্ষেপ করা হলো, যেখানে একজন মিশরীর গলিত লাশ পড়ে ছিলো। ইসহাক মহান আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন। এতো তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি নিজের মধ্যে শান্তি অনুভব করছিলেন। তার আত্মায় কোনো ব্যথা নেই। শারীরিক ব্যাথা-বেদনার প্রতি তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু তার জানা নেই যে, তাকে এমন এক লাঞ্ছনায় নিক্ষেপ করার আয়োজন চলছে, যা তার আত্মাকে রক্তাক্ত করে দেবে। তিনি জানেন না, তার ষোড়শী কন্যা ও স্ত্রীকে কয়েদখানায় নিয়ে

আসার জন্য এক ব্যক্তি রওনা হয়ে গেছে।

এখান থেকে ইসহাকের গ্রাম ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করলে পুরো এক দিনের পথ। এখন ভোর বেলা। সুদানী সালার তার সঙ্গী অফিসারের সঙ্গে চলে গেছেন। কয়েদখানার সিপাহীদ্বয়ের ডিউটি শেষ হওয়ার পথে। দিনের ডিউটির জন্য অন্য সিপাহীরা আসছে। এই দু'সিপাহী পরস্পর কথা বলে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা ইসহাককে একজন বুজুর্গ ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, সরাসরি কোনো এক অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক। এমন একজন বুজুর্গ ব্যক্তির স্ত্রী-কন্যাকে কয়েদখানায় ডেকে এনে অপদস্ত করা হবে, তা তারা সহ্য করতে পারবে না। এক সিপাহী এই আশংকাও ব্যক্ত করে যে, এই লোকটির স্ত্রী-কন্যাকে অপমান করা হলে প্রত্যেকের উপর গজব আপতিত হবে। ইসহাক বের হতে পারলে তাদের ভাগ্য বদলে দেবেন, এমন আশাও তারা পোষণ করছে। এক সিপাহী বললো, সে ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে এই স্থান পর্যন্ত আসতে দেবে না।

❖ ❖ ❖

বার্তাবাহী সুদানী কমান্ডার যখন মুসলমানদের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন সন্ধ্যা। এলাকায় প্রবেশ করে প্রথমে সে জিজ্ঞেস করে, মিশরী ফৌজের কর্মকর্তা, সুদানী মুসলমান, নাম ইসহাক; তার বাড়িটা কোন্ গ্রামে? এলাকায় ইসহাক একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। যে কেউ তাকে চেনে। কমান্ডার জানায়, লোকটি আহতাবস্থায় যুদ্ধবন্দী হয়ে আছে। অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে তাকেও কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। তার একান্ত কামনা, জীবনের শেষ মুহূর্তে স্ত্রী ও কন্যাদের এক নজর দেখে যাবেন। আমি তাদেরকে নিতে এসেছি।

এক ব্যক্তি কমান্ডারের সঙ্গ নেয়। উপত্যকার পর উপত্যকা অতিক্রম করে দু'জন ইসহাকের গ্রামে প্রবেশ করে। তারপর তার বাড়ি গিয়ে পৌঁছে।

ইসহাকের বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে কমান্ডারের সাক্ষাৎ হয়। সুদানী কমান্ডার মাথানত করে তার সঙ্গে করমর্দন করে এবং নেহায়েত আদবের সঙ্গে বলে- 'আপনার পুত্র এতোই বীর পুরুষ যে, আমাদের সালারও তাকে সালাম করেন। তিনি বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন বটে; কিন্তু মরুভূমি তাকে পিপাসায় কাতর করে বেহাল করে তোলে। তিনি আহতাবস্থায় আমাদের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। আমরা সুদানী সালার ও শাসকদের যেভাবে চিকিৎসা-সেবা দিয়ে থাকি, তারও ঠিক তেমনি সেবা-চিকিৎসা চলছে। তথাপি তিনি সুস্থ হচ্ছেন

না। তার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপই হচ্ছে। তারপরও তাকে বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। তিনি আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন যে, তার কন্যা ও স্ত্রীকে শেষবারের মতো এক নজর দেখবেন।'

'তোমরা যদি তাকে এতোই ইজ্জত করে থাকো, তো তাকে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছো না কেন?'– ইসহাকের পিতা বললেন– 'হয়তোবা সে আমাদের ডাক্তারদের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে যাবে।'

'সুদানের সেনা প্রধান বলেছেন, তিনি আমাদের মেহমান'– কমান্ডার জবাব দেয়– 'মেহমানকে অসুস্থাবস্থায় বিদায় দেয়া মেজবানের জন্য অপমান। সুস্থ হলেই তাকে স্বসম্মানে আপনাদের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

'আচ্ছা, এটা কি সম্ভব নয় যে, তার স্ত্রী ও কন্যা তার কাছে থেকে তার সেবা করবে?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করেন।

'এরা যদি ওখানে থাকতে চায়, তাহলে সম্মানের সঙ্গে রাখা হবে'– কমান্ডার বললো– 'আমাদের দেশে বীর-বাহাদুরের সম্মান করা হয়। আমাদের ধর্ম আপনাদের থেকে ভিন্ন। কিন্তু আমরাও সুদানী, আপনারাও সুদানী। দেশ আমাদের এক। আর আমরা দেশকে শ্রদ্ধা করি। ইসহাক যদিও সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈনিক, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। আমরা ভাই ভাই। সালাহুদ্দীন আইউবীকে আমরা বড় যোদ্ধা বলে বিশ্বাস করি। তিনি খৃস্টানদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছেন।'

'তাহলে তোমরা তাকে শত্রু ভাবছো কেন?'– বৃদ্ধ বললেন– 'তোমরা কেনো খৃস্টানদেরকে বন্ধু মনে করছো?'

'মুহ্তারাম!'– কমান্ডার বললো– 'আমরা যদি কথার পাকে জড়িয়ে পড়ি, তাহলে দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে যাবে। আপনার পুত্রবধূ ও নাতনীকে রাত পোহাবার আগেই আপনার পুত্রের নিকট পৌঁছাতে হবে। আপনার পুত্রের আকাঙ্খা পূরণ করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। তারা এখনই আমার সঙ্গে রওনা হতে প্রস্তুত আছে কি?'

পর্দার আড়াল থেকে এক নারীকণ্ঠ ভেসে আসে- 'হ্যা, আমরা প্রস্তুত।'

'সঙ্গে কোনো পুরুষ যেতে পারবে কি?'– বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করেন– 'আমিও আমার পুত্রকে দেখতে চাই।'

'সফর অনেক দীর্ঘ'– 'কমান্ডার বললো– 'আপনি এতো দীর্ঘ ঘোড়সাওয়ারী বরদাশত করতে পারবেন না। আমি শুধু ইসহাকের স্ত্রী-কন্যাকেই নিয়ে যাওয়ার আদেশ পেয়েছি।

কয়েদখানার সিপাহী ডিউটি শেষ করে বাড়ি চলে যায়। অতিদ্রুত পোশাক পরিবর্তন করে সে। মাথাটা এমনভাবে ঢেকে নেয় যে, মুখমণ্ডলও আবৃত হয়ে গেছে। ঘোড়ার সঙ্গে খাদ্য-পানি বেঁধে নিয়ে কাউকে কিছু না বলেই রওনা দেয়। ইসহাকের বাড়ির পথ আগেই জেনে নিয়েছে সে। সালার যখন কমান্ডারকে ইসহাকের বাড়ির পথ নির্দেশ করেছিলো, এই সিপাহী তখন পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলো। ইসহাকের প্রতি ভক্তিতে পরিপূর্ণ তার হৃদয়। লোকালয় থেকে বের হয়ে দ্রুত ঘোড়া হাঁকায় সিপাহী। কমান্ডার তো চলে গেছে তারও বহু আগে। কাজেই তার আগে ইসহাকের বাড়ি পৌঁছা সিপাহীর পক্ষে সম্ভব নয়।

ইসহাকের পিতার নিকট দু'টি ঘোড়া ছিলো। তিনি ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করে দেন। ইসহাকের কন্যা ও স্ত্রী ঝটপট প্রস্তুত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসে। এলাকার আরো কতিপয় লোক এসে জড়ো হয়। তারাও সুদানী কমান্ডারের বক্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন করে ইসহাকের কন্যা ও স্ত্রীকে কমান্ডারের সঙ্গে বিদায় করে দেয়।

রাতের সফর। পথে কোথাও যাত্রাবিরতি দেয়া যাবে না। ইসহাকের ভাবনায় দু'মহিলার চোখের নিদ্রা উড়ে গেছে। তাদের পক্ষে ঘোড়সওয়ারী নতুন কিংবা কঠিন বিষয় নয়। এখানকার মুসলমানরা তাদের সন্তানদের অশ্বারোহন ও তীরচালনা শৈশবেই শিক্ষা দিয়ে থাকে।

তিনটি ঘোড়া পাহাড়ী এলাকা থেকে বেরিয়ে গেছে। কমান্ডার এই ভেবে আনন্দিত যে, সে সাফল্যের সাথে ইসহাকের স্ত্রী-কন্যাকে জালে আটকাতে সক্ষম হয়েছে।

ইসহাক সেই প্রকোষ্ঠে বসে আছেন, যেখানে মিশরী সৈনিকের গলিত লাশ পড়ে ছিলো। এই লাশ সেখানে তাকে অস্থির করে তোলার জন্য রাখা হয়েছিলো। কিন্তু ইসহাক তো এখন দৈহিক অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি লাশটির সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছেন, যেনো লাশটি জীবিত। দুর্গন্ধের এক তিল অনুভূতিও তার নেই। তিনি যেনো এখন আর দেহ নন– একটি আত্মা। সারাটা দিন তাকে কক্ষ থেকে বের করা হয়নি। সন্ধ্যার পরও কেউ তাকে বিরক্ত করেনি। তিনি এই ভেবে বিস্মিত যে, তাকে কেনো শান্তিতে থাকতে দেয়া হচ্ছে। সম্ভবত সুদানী সালার তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে।

পাহাড়ী এলাকা থেকে বের হয়ে দুই মহিলাকে নিয়ে কমান্ডার মরু এলাকার দিকে যাচ্ছে। মহিলাদেরকে সে ইসহাক সম্পর্কে ভালো ভালো কথা শোনাচ্ছে। তারা মনোযোগ সহকারে তার বক্তব্য শুনছে।

সুদানী সালার তার সঙ্গীকে বলছে– 'কেউ কি আপন স্ত্রী ও কন্যার অপমান সহ্য করতে পারে? আমি আশাবাদী, কমান্ডার ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে আসবে। । আমি ইসহাককে বলবো, যতোক্ষণ না তুমি মুসলিম গোত্রগুলোকে সুদানী ফৌজে শামিল করে সুদানের অফাদার না বানাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার স্ত্রী ও কন্যা আমাদের হাতে বন্দী থাকবে।'

'আমাদের কমান্ডারকে ভোর নাগাদ এসে পৌঁছা উচিত।' সালারের সঙ্গী বললো।

'তার আগেও এসে পড়তে পারে'– সালার বললো– 'লোকটা বড় চতুর।'

কমান্ডারের পেছনে পেছনে রওনা হওয়া সিপাহী পার্বত্য এলাকার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করছে। অর্ধেকেরও বেশী পথ অতিক্রম করে ফেলেছে সে। আকাশে চাঁদ নেই। তবু মরু এলাকা বলে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। তারকার আলোয় চলার মতো পথ দেখা যায়।

রাতের নীরবতার মধ্যে সিপাহী কারো কথা বলার শব্দ শুনতে পায়। বক্তা তারই দিকে এগিয়ে আসছে। সিপাহী একটি টিলার আড়ালে গিয়ে থেমে যায়। কথা বলার শব্দ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে। এবার একাধিক ঘোড়ার পায়ের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। পরক্ষণেই সিপাহী টিলার আড়াল থেকে তিনটি ঘোড়া অতিক্রম করতে দেখে। সে তরবারী হাতে নেয়। কমান্ডার এখনো ইসহাকের কথা বলে যাচ্ছে। সিপাহী নিশ্চিত হয়, লোকটি তাদের সেই কমান্ডার এবং তার সঙ্গে ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যা।

সিপাহী ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং কমান্ডারের পিছু নেয়। তার ঘোড়ার পদশব্দে কমান্ডার চমকে ওঠে। সে তরবারী উঁচু করে পেছন দিকে ঘুরে যায়। কিন্তু সিপাহী ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে কমান্ডারের উপর এমন এক আঘাত হানে যে, কমান্ডারের একটি বাহু কেটে যায়। পাল্টা আঘাত হানার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কমান্ডার। সিপাহী তার ঘাড়ে আঘাত হেনে তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দেয়।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ভ হয়ে যায় মহিলাদ্বয়। ইসহাকের স্ত্রী তার মেয়েকে বললো– 'পালাও, ডাকাত মনে হচ্ছে।' তারা ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সিপাহী তাদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো– 'এখানে কোনো ডাকাত নেই। আমাকে ভয় করো না। আমি তোমাদেরকে একজন দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছি। আমার সঙ্গে নিজ বাড়িতে চলো। আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো। আমার সঙ্গে আর কোনো মানুষ নেই।'

ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যা অস্থির-পেরেশান যে, এসব কী ঘটছে। সিপাহী

কমান্ডারের ঘোড়ার লাগাম তার ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে রওনা হয়। পথে সে ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে জানায়, ইসহাক কয়েদখানায় বন্দী। মুসলমান গোত্রগুলোকে সুদানী ফৌজে শামিল করে দেয়ার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু তিনি তা মেনে নিতে নারাজ। ইসহাকের সঙ্গে কিরূপ আচরণ চলছে, সিপাহী তাদের তা জানতে দেয়নি। সে বললো, তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার নেপথ্যে পরিকল্পনা হলো, তোমাদেরকে ইসহাকের সামনে উলঙ্গ দাঁড় করিয়ে লাঞ্ছিত করে ইসহাককে বাধ্য করা। এই যে লোকটিকে আমি খুন করেছি, সে এ লক্ষ্যেই তোমাদেরকে নিতে এসেছিলো। আমি তোমাদেরকে এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার পেছনে পেছনে আসি। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।'

'তুমি কে?'– ইসহাকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কি মুসলমান?'

'আমি কয়েদখানার সিপাহী'– সিপাহী জবাব দেয়– 'আমি মুসলমান নই।'

'তাহলে আমাদের জন্য তোমার হৃদয়ে দয়া জাগলো কেনো?'

'আমি শুনেছি, মুসলমানদের একজন পয়গম্বর আছেন'– সিপাহী বললো– 'তোমার স্বামীকে পয়গম্বর বলে মনে হচ্ছে।'

ইসহাকের স্ত্রী জানতে চায়, তুমি কেন আমার স্বামীকে পয়গম্বর মনে করছো। সিপাহী আসল ঘটনা এড়িয়ে গিয়ে বললো– আমি তাকে সত্য পয়গম্বর মনে করি। তিনি মুসলমান এবং কয়েদখানায় বন্দী। আমি মুসলমান নই। তার স্ত্রী ও কন্যাকে লাঞ্ছিত করার যে আয়োজন চলছে, তা তিনি জানেন না। আমার অন্তরে ইচ্ছা জাগলো, তোমাদের দু'জনের ইজ্জত রক্ষা করবো। আবেগের বশবর্তী হয়ে আমি এমন কাজ করে ফেলেছি, যা আমার সামর্থের বাইরে ছিলো। এ তারই অদৃশ্য শক্তি। আমি তাকে পয়গম্বর মনে করি।'

❖ ❖ ❖

রাতের শেষ প্রহরে চারটি ঘোড়া ইসহাকের ঘরের সম্মুখে গিয়ে থেমে যায়। ঘরের দরজায় করাঘাত পড়ে। পুত্রবধূ ও নাতনীর সঙ্গে ভিন্ন এক পুরুষকে দেখে ইসহাকের পিতা বিস্মিত হন। ভেতরে প্রবেশ করে সিপাহী তাকে পুরো ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে। কিন্তু কয়েদখানায় ইসহাকের সঙ্গে কিরূপ আচরণ চলছে, তা গোপন রাখে। ইসহাকের পিতা তৎক্ষণাৎ গোত্রের লোকদেরকে বিষয়টি অবহিত করে। মানুষ এসে ইসহাকের বাড়িতে ভিড় জমায়। সিপাহী তাদেরকে জানায়, ইসহাককে এই শর্তে মুক্তি দেয়ার কথা বলা হচ্ছে যে, তিনি আমাদের সব মুসলমানকে সুদানী ফৌজে শামিল করে দেবেন এবং আপনারা

সবাই সুদানের অনুগত হয়ে যাবেন। কিন্তু ইসহাকের বক্তব্য– আমাকে জীবনে মেরে ফেলো, তবু আমি আমার স্বজাতির সঙ্গে গাদ্দারী করতে পারবো না।

শুনে সবাই আৎকে ওঠে এবং সুদানকে গালমন্দ করতে শুরু করে। একজন বললো– 'এখানে সালাহুদ্দীন আইউবীর আগমন ঘটবে। এটা আল্লাহর জমিন।'

'আমরা কয়েদখানা আক্রমণ করে ইসহাককে উদ্ধার করবো।' এক ব্যক্তি বললো।

'তোমাদের পক্ষে এ কাজ সহজ নয়'– সিপাহী বললো– 'পাতাল কক্ষ থেকে কাউকে বের করে আনার সাধ্য তোমাদের নেই।'

'তুমি তো কয়েদখানার সিপাহী'– ইসহাকের পিতা বললেন– 'তুমি সহযোগিতা করতে পারো।'

'আমি গরীব এবং সাধারণ একজন সৈনিক'– সিপাহী বললো– 'আমি আপনার পুত্রকে পয়গম্বর মনে করি। আমি তাকে বলেছি, তুমি আমার ভাগ্য বদলে দাও। তিনি বলেছেন, এখান থেকে বের হয়ে আমি তোমার ভাগ্য বদলে দেবো। সময় যতো অতিক্রম করছে, তার প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনারা সবাই তার জন্য জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন। আমার জীবনও কি তেমন হতে পারে না, যেমনটা আপনাদের?'

'তুমি মুসলমান হয়ে যাও এবং এখানেই থাকো'– ইসহাকের পিতা বললেন– 'আমরা সবাই জান্নাতে বাস করি। এখানকার জমি এতো অধিক ফসল উৎপন্ন করে যে, যারা কৃষি কাজ করে না, তাদেরও না খেয়ে থাকতে হয় না। এটা আমাদের আল্লাহর অনুগ্রহ। তুমি আমাদের নিকট এসে পড়ো এবং ভাগ্য পরিবর্তন করো। আমরা স্বাধীন। এখানকার পর্বতমালা আমাদের দুর্গ। এই দুর্গ আল্লাহ আমাদের জন্য বানিয়ে দিয়েছেন।'

সিপাহী ইসহাকের এলাকায় থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইসহাকের পিতার হাতে কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে সেখানেই বসবাস করতে শুরু করে।

এখন ভোর বেলা। সুদানী সালার অস্থিরচিত্তে কমান্ডারের আগমনের অপেক্ষা করছে। কিন্তু তার কোনো খোঁজ নেই। সূর্য মাথার উপর ওঠে আসছে আর সালারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ধারণা, কমান্ডার পথ ভুলে গেছে। সে অপর এক কমান্ডারকে ডেকে দায়িত্ব বুঝিয়ে পথের নির্দেশনা দিয়ে রওনা করিয়ে দেয়।

ইসহাক কক্ষে আবদ্ধ। সারাটা দিন তার এই অবরুদ্ধ অবস্থায় কেটেছে। তার কক্ষে পড়ে থাকা লাশটি গলতে শুরু করেছে। কয়েদখানার যে সান্ত্রী মানুষের হাড় ভাঙ্গা এবং পাতাল প্রকোষ্ঠের দুর্গন্ধ সহ্য করতে অভ্যস্ত, সেও ইসহাকের কক্ষের নিকটে যেতে আপত্তি করছে। এক সান্ত্রী নাকে হাত রেখে

ইসহাককে জিজ্ঞেস করলো– 'হতভাগা! এতো দুর্গন্ধ তুমি কিভাবে সহ্য করছো? এরা তোমার নিকট যা যা দাবি করছে, তুমি মেনে নাও এবং এখান থেকে মুক্তি গ্রহণ করো। তুমি তো এই মুর্দারের গন্ধে পাগল হয়ে যাবে।'

'আমার কোনো দুর্গন্ধ অনুভব হচ্ছে না'– ইসহাক বললেন– 'এটা মুর্দার নয়, ইনি শহীদ। আমি রাতে তার গা ঘেঁষে ঘুমাই।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছো'– সান্ত্রী বললো– 'লাশের দুর্গন্ধের ক্রিয়া এমনই হয়ে থাকে।'

ইসহাকের মুখে মুচকি হাসি ফুটে ওঠে। তিনি লাশটির সন্নিকটে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুরু করেন।

কেটে গেছে এ রাতটিও। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে সালার পরবর্তী যে কমান্ডারকে প্রেরণ করেছিলেন, সে ফিরে আসে। লাগাতার দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত কমান্ডার যা কিছু দেখে এসেছে, তা বিবৃত করতে তার ঠোঁট কাঁপছে। সে সালারকে জানায়, পথে কিছু এলাকা বালির টিলা ও পর্বতময়। দেখলাম, এক স্থানে অনেকগুলো শকুন একটি মুর্দা খাচ্ছে। পার্শ্বেই এক স্থানে পড়ে আছে একটি তরবারী, এক জোড়া জুতা ও কিছু কাপড়-চোপড়। শকুনগুলোকে তাড়িয়ে দেয়ার পর বুঝতে পারলাম, ওরা যা খাচ্ছিলো ওটি একটি মানুষের লাশ। লাশের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে গেছে। পার্শ্বে পরিত্যক্ত খঞ্জর ও চামড়ার বেল্ট ইত্যাদি দেখে আমি নিশ্চিত হই যে, এটি আমাদের সুদানী কমান্ডারের লাশ। আমি কিছুদূর সম্মুখে এগিয়ে মাটি পরখ করে ঘোড়ার পদচিহ্ন দেখতে পাই। তাতে বুঝা গেলো, এই কমান্ডার পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করছিলো। তবে সে মহিলা দু'জনকে নিয়ে এসেছিলো কিনা এবং তাকে কে খুন করলো, বুঝা গেলো না।

শুনে সালার বললেন– 'সব জানা যাবে।'

মুসলমানদের উক্ত অঞ্চলে সুদানীরা তাদের গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছিলো, যারা ওখানকার মুসলমানদেরই একজন। ওখানে তাদের একমাত্র কাজ চরবৃত্তি। তারাই ইসহাক সম্পর্কে তথ্য দিয়েছিলো, ঐ অঞ্চলে তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

সালারের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। সন্ধ্যার পর দু'জন গুপ্তচর সেখান থেকে এসে পৌঁছে। তারা সালারকে জানায়, কমান্ডার ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু আমাদের কয়েদখানার এক সিপাহী পথে কমান্ডারকে হত্যা করে মহিলা দু'জনকে ফেরত নিয়ে গেছে। গোয়েন্দারা

সিপাহীর নামও জানায়। সালার বিষয়টি সুদানের সম্রাটকে অবহিত করে। সম্রাট জানায় খৃস্টান উপদেষ্টাদের। খৃস্টান উপদেষ্টারা পরামর্শ দেয়, তোমরা চুপ থাকো। মুসলমানদের উপর হামলা করার মতো বোকামী করো না। তাদেরকে কৌশলে বন্ধুতে পরিণত করার চেষ্টা করো। বড়জোর এটুকু করতে পারো যে, উক্ত সিপাহীকে গোপনে হত্যা করাও, যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে, আমাদের হাত সর্বত্র পৌঁছতে পারে। ইসহাক যদি তোমাদের শর্ত মেনে না নেয়, তাহলে অন্য কোনো সুদানী মুসলমানকে টার্গেট করো এবং ইসহাকের নির্যাতন অব্যাহত রাখো।

ইসহাককে পুনায় নিপীড়নের যাঁতাকলে নিক্ষেপ করা হলো। এবার তার থেকে কমান্ডার হত্যার প্রতিশোধও নিতে চাচ্ছে সালার। তাকে এমন পাশবিক নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট করা হলো, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। রাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ইসহাক। অচেতন অবস্থায়ই তাকে একটি কক্ষে নিক্ষেপ করা হলো। যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে, তখন কক্ষে ঘোর অন্ধকার। বাইরে একটি প্রদীপ জ্বলছে। ইসহাক অন্ধকারে একদিকে হাত বাড়ালে হাত কারো গায়ের সঙ্গে লাগে। তার স্মরণে এসে যায়, এতো সেই লাশ, যেটি প্রথম দিন থেকে তার সঙ্গে পড়ে আছে। কিন্তু তার কাছে মনে হলো, লাশটা নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে। তার শরীরের অবস্থা এতোই শোচনীয় যে, উঠে বসার শক্তি নেই।

হঠাৎ লাশটা নড়ে ওঠে। ইসহাক চমকে ওঠে তাকায়। লাশের চেহারায় দৃষ্টিপাত করে। এ্যা, এতো সেই লাশ নয়, এতো অন্য কোনো জীবিত মানুষ এবং এটি অপর একটি কক্ষ। লোকটি সম্ভবত অচেতন। পরে ধীরে ধীরে তার চৈতন্য ফিরে আসে এবং চোখ খুলে। ইসহাক বড় কষ্টে উঠে বসে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কে?'

'আমর দরবেশ।' অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে লোকটি জবাব দেয়।

'আহ! আমর দরবেশ'– ইসহাক চমকে ওঠে বললেন– 'আমি ইসহাক।'

ইসহাক ও আমর দরবেশ একে অপরকে ভালোভাবেই চেনে। আমর দরবেশও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজের একটি ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন। তিনি সেই মুসলমান কবিলার লোক, যারা সুদানী হওয়া সত্ত্বেও সুদানী ফৌজে ভর্তি হওয়া থেকে বিরত থাকছে। আমর দরবেশও এখন যুদ্ধবন্দী। ইসহাকের নাম শুনে তিনি উঠে বসেন।

'তারা তোমাকে কী বলছে?' ইসহাক জিজ্ঞেস করেন।

'তারা বলছে'– আমর দরবেশ জবাব দেন– 'তুমি আলেমের বেশ ধারণ

করে নিজ এলাকায় গিয়ে লোকদের অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে শত্রুতা সৃষ্টি করো। আমরা তোমাকে কৌশল বলে দেবো, তোমাকে রাজপুত্রের ন্যায় রাখবো এবং যে মেয়েকে পছন্দ হয়, তোমার সঙ্গে দেবো। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমাদের উদ্দেশ কি? তারা বলেছে, তুমি তোমার সবক'টি গোত্রকে সুদানের অনুগত বানিয়ে দাও। বিনিময়ে তারা আমাকে মুসলিম অঞ্চলের আমীর নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এরা মুসলমানদের আলাদা বাহিনী গড়তে চায়।'

'আমি জানতে পেরেছি'– আমর দরবেশ বললেন– 'তারা তোমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে। বুঝতে পারছি না, আমাদের দু'জনকে কেনো এক কক্ষে আবদ্ধ করলো। এর মধ্যে কল্যাণ থাকতে পারে। আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছিলাম। আমি একটা পন্থা ভেবেছি। সে মতে কাজ করার আগে তোমার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন ছিলো। ভালোই হলো, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে।'

'কী পন্থা ভেবেছেন?' ইসহাক জিজ্ঞেস করেন।

'তুমি তো বুঝতে পারছো, এরা আমাদেরকে ছাড়বে না'– আমর দরবেশ বললেন– ' আমরা কতকাল নিপীড়ন সহ্য করবো। আজ না হোক কাল তো আমাদের মরতেই হবে। এখানে আরো কয়েকজন সুদানী মুসলমান বন্দী আছে। কেউ না কেউ তাদের হাতে এসে যাবে। আমার আশংকা, এরা আমাদের কোনো না কোনো সহকর্মীকে ফাঁদে ফেলে আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে। একটা পন্থা এই হতে পারে যে, আমরা এদের শর্ত মেনে নিয়ে এখান থেকে মুক্তি লাভ করবো এবং এলাকায় গিয়ে কোনো কাজ করবো না। আমরা রাতের আঁধারে গোপনে মিশর চলে যাবো। আমাদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয় পন্থা হলো, আমি এদের সব প্রস্তাব মেনে নেবো। এরা আমাকে যা যা পাঠ শোনাবে, আমি সব পড়ে নেবো। তাদের নির্দেশিত বেশ ধারণ করবো এবং গোত্রের লোকদেরকে সাবধান করে দেবো, যেনো তারা সুদানীদের কারো খপ্পরে না পড়ে। বের হয়ে আমি তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে নেয়ার চেষ্টা করবো।'

'এ-ও তো হতে পারে যে, তখন সুদানীরা আমাদের এলাকার উপর হামলা করে বসবে'– ইসহাক বললেন– 'আমাদের জনগণ অতো তাড়াতাড়ি অস্ত্র সমর্পণ করার মতো লোক নয় বটে; কিন্তু সেনাবাহিনীর শক্তিও অতো দ্রুত নিঃশেষ হবে না। সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়ে সাধারণ জনতার পেরে ওঠা সহজ হবে না।'

'আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে'— আমর দরবেশ বললেন— 'আমরা মিশর থেকে কমান্ডো বাহিনীর সাহায্য নিতে পারি। এক্ষুণি যা প্রয়োজন, তাহলো, আমাদের একজন বেরিয়ে যাবো। আমরা দু'জনই যদি একসঙ্গে তাদের শর্ত মেনে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি, তাহলে আরও ভালো হবে।'

'আমি এখানেই থাকবো'— ইসহাক বললেন— 'তুমি তাদেরকে ধোঁকা দাও। আমরা দু'জনই যদি একসঙ্গে তাদের দাবি মেনে নেই, তাহলে তারা বুঝে ফেলবে, এক কক্ষে অবস্থান করে আমরা পরামর্শের মাধ্যমে কোনো পরিকল্পনা ঠিক করেছি। আমি তাদের নিপীড়ন ভোগ করতে থাকবো। তুমি বেরিয়ে যাও।'

রাত পোহাবা মাত্র কক্ষের দরজা খুলে যায়। এক সিপাহী বর্শার আগা দ্বারা খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তুলে ধাক্কাতে ধাক্কাতে সঙ্গে করে ইসহাককে নিয়ে যায়। কক্ষের দরজা পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর সুদানী ফৌজের এক কর্মকর্তা এসে হাজির হয়। সে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে আমর দরবেশকে জিজ্ঞেস করে— 'আজও যদি তুমি অস্বীকার করো, তাহলে কল্পনা করতে পারবে না তোমার শরীরের দশা কী হবে। আমরা তোমাকে মরতে দেবো না। দুনিয়াতেই তুমি জাহান্নাম দেখতে পাবে। প্রতিদিনই মরবে, প্রতিদিনই জীবিত হবে।'

'আমাকে কোনো একটি ভালো জায়গায় নিয়ে যাও'— 'আমর দরবেশ বললেন— 'আমার দেহটাকে একটু শান্তি দাও। এখানে আমি কিছুই ভাবতে পারি না।'

'আমি তোমাকে জান্নাতে নিয়ে বসাতে পারি'— সুদানী কর্মকর্তা বললো— 'আমি তোমাকে জান্নাতের হুরদের মাঝে বসাবো। কিন্তু সেখানেও যদি আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে যতোদিন বেঁচে থাকবে, আফসোস করবে। কেঁদে কেঁদে আমাদের বলবে, আমি তোমাদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। কিন্তু তখন আর আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না।'

আমর দরবেশ কোঁকাচ্ছেন। চোখ দুটো পুরোপুরি খুলতে পারছেন না। তিনি কর্মকর্তার কানে ফিসফিসিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন— 'এমনটা হবে না। আমাকে কোথাও নিয়ে চলো এবং বলো, আমাকে কী করতে হবে।'

আমর দরবেশকে তখনই সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হলো এবং ইসহাককে যেরূপ বিলাসবহুল কক্ষে রাখা হয়েছিলো, তেমনি এক কক্ষে রাখা হলো। সামান্য পরে একজন ডাক্তার এসে উপস্থিত হন। তিনি তার দেহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে যান। তাকে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হতো। এ সময়ে ইসহাককে নিপড়িনকারী সেই সুদানী সালার আমর

দরবেশকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কি আমাদের সবগুলো প্রস্তাব মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো?' আমর দরবেশ মাথা নেড়ে সম্মতিসূচক জবাব দেন। তারপর আহার শেষ করেই শুয়ে পড়েন। আমর দরবেশ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

গোটা রাত এবং পরবর্তী দিনের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর আমর দরবেশের ঘুম ভাঙ্গে। তিনি কয়েদখানায় বহুদিন যাবত নিপীড়ন ভোগ করে আসছেন। শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হাড়-চামড়ার মাঝে গোশত নেই। শুলে হাড়ে ব্যথা পান। কিন্তু এখন সুদর্শন কক্ষে মনোরম গালিচায় কয়েক ঘণ্টা ঘুমাবার পর তার দেহে সুস্থতা ও সজীবতার ভাব ফুটে উঠেছে। তাকে ওষুধ সেবন করানো হয়েছে। খাওয়ানো হয়েছে রাজকীয় খাবার।

চোখ খুলে দেখতে পান এক যুবতী তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাসছে। অত্যন্ত রূপসী। মাথাটা উন্মুক্ত। ঝলমলে রেশমী চুল। কাঁধ, বাহু ও বুকের অনেকখানি উদোম।

আমর দরবেশ সৈনিক মানুষ। জন্মেছেন জঙ্গলে। যৌবনে কেটেছে যুদ্ধের ময়দানে। মেয়েটিকে তার কাছে স্বপ্ন মনে হলো। কিন্তু মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলালে তিনি নিশ্চিত হন এটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব।

মেয়েটি কক্ষ থেকে বের হয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনে। ডাক্তার তার স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিয়ে ওষুধ খাইয়ে চলে যান।

খানিক পর এসে উপস্থিত হয় দু'জন খৃস্টান। তারা অনর্গল সুদানী ভাষায় কথা বলছে। নাশকতায় অভিজ্ঞ। তারা আমর দরবেশকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে যে, নিজ এলাকায় গিয়ে বলবে না, তুমি আমাদের হাতে বন্দী ছিলে। বরং বলবে, যুদ্ধের ময়দানে এক বুযুর্গের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো, যিনি বলেছেন মিশরী বাহিনীর সুদান আক্রমণ ভুল প্রমাণিত হবে। মুসলমানদের জন্য উত্তম হলো, তারা সুদানের সঙ্গে যোগ দেবে। অন্যথায় তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি একজন দেওয়ানা আলেমের বেশে মুসলমানদের অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবী ও মিশর সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করবে।

আমর দরবেশ হাসিমুখে সম্মতি প্রকাশ করেন। তৎক্ষণাৎ তার প্রশিক্ষণ ও রিহার্সেল শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর কয়েকটি মেয়ে তার জন্য খাবার নিয়ে আসে। এনে হাজির করে মদও। আমর মদ পান করতে অস্বীকার করেন। আহার শেষে এই মেয়েরা চলে যায়। রাতের পোশাকে এসে উপস্থিত হয় অপর এক মেয়ে। দেহটা অর্ধনগ্ন। চাল-চলন, ভাবভঙ্গী উত্তেজনাকর।

'তুমি কেন এসেছ?' আমর দরবেশ মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন।

'আপনার জন্য'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আমি আপনার কাছে থাকবো।'

'তোমার নাম কি?'

'আশি।' নামটা বলেই মেয়েটি আমর দরবেশের পালংকের উপর বসে পড়ে।

'আমি আদেশ পেয়ে এসেছি, আমাকে আপনার সঙ্গে থাকতে হবে।'

'এরা আমার থেকে যা আদায় করতে চাচ্ছে, আমি তা মেনে নিয়েছি'– আমর দরবেশ বললেন– 'তোমার ন্যায় সুদর্শন ফাঁদের কোনো প্রয়োজন নেই।'

'আমি জানি'– আশি বললো– 'আমাকে আপনার সম্পর্কে সবকিছু বলা হয়েছে। আমি পুরস্কার হিসেবে এসেছি। আমি জানি আমাকে আপনার প্রয়োজন রয়েছে। সৈনিক যখন রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসে, তখন তার আত্মা নারীর প্রয়োজন অনুভব করে থাকে।'

'আমি পরাজিত সৈনিক'– 'আমর দরবেশ বললেন– 'আমার আত্মা মরে গেছে। নিজ দেহের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেছে। কোনো প্রয়োজনের অনুভূতি আমার নেই। কয়েদখানায় সিদ্ধ পাতা খেয়েও আমি আনন্দ পেয়েছি। এখানে এতো সুস্বাদু রাজকীয় খাবার খেয়েও তৃপ্ত। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে আমি আনন্দিত নই। আমি পরাজিত।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে। যেনো কোনো রসিক বন্ধু তার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে।

'দু-চার ঢোক মদ আপনাকে আনন্দে উদ্বেলিত করে তুলবে'– মেয়েটি বললো– 'কয়েক ঢোক লাল পানি কণ্ঠনালী অতিক্রম করার পর আমার প্রতি তাকাবেন। তখন আমার মধ্যে ফুলের সৌন্দর্য দেখতে পাবেন।'

'আমার সমস্যাটা হলো, আমি মুসলমান'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমরা সম্ভ্রম নিয়ে খেলা করি না, বরং আমরা সম্ভ্রমের সুরক্ষা করে থাকি।'

'সে তো মুসলমান মেয়েদের সম্ভ্রম'– মেয়েটি বললো– 'আমি মুসলমান নই।'

'তুমি সম্ভ্রান্তও নও'– আমর দরবেশ বললেন– 'তারপরও আমার কর্তব্য, তোমার সম্ভ্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখবো। নারী মুসলমান হোক কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বী বা ভিন্ন জাতির; মুসলমান যদি পাক্কা ঈমানদার হয়, তার সম্ভ্রমের হেফাজত করবেই। তুমি সারা রাত আমার কাছে বসে থাকো। সকালে সকলের নিকট বলে বেড়াবে, গত রাতটা আমি একটা পাথরের কাছে অতিবাহিত করেছি।

'আমি কি রূপসী নই?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'যেমনই হয়ে থাকো, তুমি আমার কোনো কাজের নও'– আমর দরবেশ

বললেন– 'আমি বরং তোমার কাজে আসতে পারি। তুমি যদি এই লাঞ্ছনাময় জীবন থেকে মুক্তি পেতে চাও, তাহলে জীবন বাজি রেখে হলেও আমি তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবো এবং কোনো ভদ্র ঘরে পুনর্বাসন করে দেবো।'

'আপনার আগেও এক ব্যক্তি এখানে এসেছিলেন'– আশি বললো– 'তিনিও আপনার ন্যায় কথা বলতেন। তিনিও সুদানী মুসলমান ছিলেন। মুসলমান বিধায় নারীর প্রতি আপনার কোনো আকর্ষণ নেই, আপনার এ দাবি আমি মানতে পারছি না। আমি মিশরের এমন অনেক মুসলমানকে দেখেছি, যারা নারী পেলে ক্ষুধার্ত জন্তুতে পরিণত হয়। আমি এমন তিনজন মিশরী মুসলমানের নাম বলতে পারবো, যাদেরকে আমি এবং সোরাহী বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেছে। তারা কিরূপ মুসলমান?'

'তারা ঈমান বিক্রেতা'– আমর দরবেশ বললেন– 'তুমি যখন কথা বলো, তখন আমি তোমার চেহারা ও চোখে তোমার মাতা-পিতার ঝলক দেখার চেষ্টা করছি। তারা কোথায়? বেঁচে আছেন কি?'

'জানি না'– আশি বললো– 'আপনার পূর্বে যিনি এখানে এসেছিলেন, তিনিও জিজ্ঞেস করেছেন, আমার বাবা-মা বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন।'

আশি ইসহাকের প্রসঙ্গ টেনে আনে। ইসহাককে যখন এই কক্ষে রাখা হয়েছিলো, তখনও এই মেয়েটিকেই তার কাছে এখানে পাঠানো হয়েছিলো। মেয়েটি আমর দরবেশকে বললো– 'ঐ সুদানী মুসলমান আমার পিতা-মাতা সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমাকে অস্থির করে তুলেছিলো। ইতিপূর্বে তিনি ব্যতীত আর কেউ আমাকে আমার পিতা-মাতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনি। তার এই অপ্রীতিকর প্রশ্নের ফলে আমি রাতভর ভাবতে থাকি, আমার পিতামাতা কারা এবং কিরূপ ছিলেন? ছিলো তো অবশ্যই। কিছু কিছু স্মৃতি মনে আসে আবার অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এখন আমি নিজেকে তাদের স্মরণ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু সফল হইনি। আজ আপনি পুনরায় নতুন করে তাদের কথা মনে করিয়ে দিলেন। আমার পিতা-মাতা থাকতে পারে– এমন ভাবনা যখন আমার থাকে না, তখন আমি ভালো থাকি।

'তোমার কোনো ভাই ছিলো?'

'স্মরণ নেই'– আশি বললো– 'রক্ত সম্পর্ক কী জিনিস, আমি জানি না।'

'তোমার ঘুম আসছে, শুয়ে পড়ো।' আমর দরবেশ বললেন।

'আমার মন চায় বসে বসে আপনার কথা শুনি'– আশি বললো– 'আপনার মতো মানুষগুলোকে আমার খুব ভালো লাগে। আমি যারই সঙ্গে কিছু সময়

অতিবাহিত করি, তার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে যায়। আপনার পূর্বে যে সুদানী মুসলমান এখানে এসেছিলো, তাকে আমার সারাজীবন স্মরণ থাকবে। আর আপনি দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাকে আমি আজীবন শ্রদ্ধা করবো। আপনি আমার মধ্যে আত্মা ও চেতনাকে জাগ্রত করে দিয়েছেন। আপনি সম্ভবত আমাকে হৃদয়ের চোখে দেখছেন। অন্যরা আমাকে দেখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে।'

'আমি তোমাকে সম্ভ্রমহারা নারী মনে করতাম'– আমর দরবেশ বললেন– 'কিন্তু এখন দেখছি তুমি বুদ্ধির কথা বলছো।'

'আমি প্রিয়দর্শিনী ও মধুর বিষ'– আশি বললো– 'আমাকে পাথরকে মোমে পরিণত করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আমি কোনো সহজ-সরল মেয়ে নই। আমি প্রতাপান্বিত শাসকের তরবারী আমার পায়ের উপর রাখাতে জানি। আমি আলেমদের আদর্শ পরিবর্তন করে দিতে পারি। কিন্তু এখন নিজেকে এমন এক মোম বলে মনে হচ্ছে, যা সামান্য তাপেই গলে যাবে, যা কোনো পাথরকে গলাতে সক্ষম নয়।'

'এটা আমার বক্তব্যের ক্রিয়া নয়'– আমর দরবেশ বললেন– 'এটা আমার ঈমানের উত্তাপ, যা তোমাকে বিগলিত করে ফেলেছে। আমি তোমার মাঝে রক্ত সম্পর্ক জাগিয়ে দিয়েছি। তুমি মানুষ। তুমি কারো কন্যা, তুমি কারো বোন। তুমি কোনো একটি জাতির সম্ভ্রম।'

রাত কেটে যাচ্ছে। একদিকে ঘুমের আবেশ, অপরদিকে আমর দরবেশের বক্তব্য আশির উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মেয়েটি পালংকের কোণে বসা ছিলো। সেখানেই এলিয়ে পড়ে সে।

ঘুম ভাঙ্গার পর আশি দেখতে পেলো, সে পালংকে শায়িত আর আমর দরবেশ মেঝেতে। ঘুমন্ত আমরের প্রতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আশি। বুকের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। নিজের গণ্ডদেশে অশ্রুর উপস্থিতি অনুভব করে সে। বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবে, আরে আমার চোখে অশ্রুও তো আছে তাহলে। ইতিপূর্বে আশির চোখ থেকে কখনো অশ্রু বের হয়নি। ধীরে ধীরে আমর দরবেশের নিকটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তার ডান হাতটা উপরে তুলে এনে নিজের চোখের সঙ্গে লাগায়।

আমর দরবেশের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাকিয়ে দেখে, আশি তার পাশে বসা। মুখে কথা নেই, হাসিও নেই। এ কথাও বললো না, মেঝেতে ঘুমানো তোমার পক্ষে ঠিক হয়নি। সে নীরবে বাইরে চলে যায়। পানি নিয়ে ফিরে আসে। আমর দরবেশ এই পানি দ্বারা ওজু করে নামাযে দাঁড়িয়ে যান। আশি কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

নাস্তার পর দু'জন খৃস্টানের সুদানী সালার এসে উপস্থিত হয়।

'আমার একটি কথা মনোযোগ সহকারে শুনে নাও'– আমর দরবেশ সালারকে বললেন– 'যে কোনো সময় আমার ইসহাককে প্রয়োজন হতে পারে। তাকে অস্থির না করে খোলামেলা আরামদায়ক কক্ষে থাকতে দিন। পাতাল কক্ষ থেকে সরিয়ে তাকে উপরে নিয়ে আসা হোক। তিনি আমার বন্ধু। আমি যখন তার প্রয়োজন অনুভব করবো, তখন আমিই তাকে বুঝিয়ে নেবো। প্রয়োজন হলে ধোঁকা দিয়ে হলেও তার থেকে কাজ নেবো। তখন যদি তিনি মতে না আসেন, তখন তার সঙ্গে যা খুশি আচরণ করুন।'

সুদানী সালার বললো– 'তাই হবে।'

খৃস্টান উপদেষ্টাগণ আমর দরবেশকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। তিনি ভালোভাবেই প্রশিক্ষণ রপ্ত করেন। তারা তাকে যা যা বলেছে, তাও তিনি মুখে আওড়াতে থাকেন। চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত তার প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। দিনে তার সঙ্গে থাকে খৃস্টান উপদেষ্টারা, আর রাতে আশি। এই মেয়েটি তার ভক্তে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু দু'একদিন আমর দরবেশের সাহচর্যে থাকার পর এখন তার নিজেকে পবিত্র বলে মনে হচ্ছে।

একটানা ছয় দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর আমর দরবেশ সপ্তম দিন একজন দরবেশের বেশে নিজ এলাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তাকে দরবেশ ও দেওয়ানা আলেমের পোশাক পরিধান করানো হলো। আশি তাকে বলেছিলো, আপনি যখন মিশন নিয়ে রওনা হবেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তার আবদার রক্ষার্থে আমর দরবেশ সুদানী সালারকে বললেন, পুরস্কার স্বরূপ মেয়েটিকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। আমি তাকে সঙ্গে রাখতে চাই। সালার তার আবেদন মেনে নেয়। আশিকে তার সঙ্গে দেয়া হলো। প্রদান করা হলো তিনটি উট। একটিতে আমর দরবেশ আরোহন করেন। একটিতে আরোহন করে আশি। অপরটিতে বোঝাই করা হলো তাঁবু ও রসদ-সামান।

রওনা হওয়ার প্রাক্কালে সুদানী সালার আমর দরবেশকে অবহিত করে, ইসহাককে পাতাল কক্ষ থেকে বের করে উপরে আরামদায়ক উন্মুক্ত কক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁকে আরো জানানো হয়, মুসলমানদের এলাকায় আমাদের লোক আছে। তারা নিজ থেকে আপনার সঙ্গে মিলিত হবে এবং আপনাকে সাহায্য করবে।

আমর দরবেশ আশিকে সঙ্গে নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এক মিশনে রওনা হয়ে যান।

আমর দরবেশকে রওনা করিয়েই সুদানী সালার নিজ কক্ষে চলে যায়। সেখানে ছয়জন লোক উপবিষ্ট। তারা সবাই সুদানী মুসলমান এবং পার্বত্য এলাকার বাসিন্দা। সুদান সরকার থেকে বহু সুযোগ-সুবিধা ও মান-মর্যাদা পাচ্ছে। নিজ এলাকায় খাঁটি মুসলমানরূপে জীবন-যাপন করে তারা।

'সে রওনা হয়ে গেছে'– সালার বললো– 'তোমরা অন্য পথে রওনা হও। একজন একজন করে যাবে। নিজ এলাকায় চলে যাও এবং তার উপর দৃষ্টি রাখো। যদি কখনো সন্দেহ হয় যে, সে ধোঁকা দিচ্ছে, তাহলে তাকে এমনভাবে খুন করে ফেলবে, যেনো কেউ টের না পায়। আমি আরো লোক পাঠাচ্ছি। তাদেরকে তোমাদের ঘরে থাকতে দেবে।'

এরা একজন একজন করে রওনা হয়ে যায়। সুদানী সালার অপর দু'জন লোককে ডেকে আনে। তারা সুদানী হলেও মুসলমান নয়। সালার তাদেরকে বললো– 'এই মুসলমানদের উপর ভরসা রাখা যায় না। নিজ এলাকায় গিয়ে কী করে বলা যায় না। এই যে ছয়জন লোক রওনা হয়ে গেলো, ওরা আমাদেরই লোক। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, ওরা মুসলমান। ওখানে গিয়ে তাদের নিয়ত পাল্টে যেতে পারে। আমর দরবেশ যদি ঠিক থাকে, তাহলে তোমাদের দাহ্য পদার্থের প্রয়োজন হতে পারে। সেগুলো এদের ঘরে লুকিয়ে রাখা আছে। এগুলো কখন কোথায় ব্যবহার করতে হবে, তা তোমাদের জানা আছে।'

এই দু'জনও রওনা হয়ে যায়।

যে সিপাহী সুদানী কমান্ডারকে হত্যা করে ইসহাকের স্ত্রী ও কন্যাকে রক্ষা করেছিলো, এখন সে ইসহাকের ঘরে অবস্থান করছে। আমর দরবেশ যেদিন রওনা হলো, সেদিন বাইরে এক স্থানে ঘোরাফেরা করছিলো। হঠাৎ একদিক থেকে একটি তীর এসে তার গা-ঘেঁষে একটি গাছে গিয়ে বিদ্ধ হয়। সিপাহী দৌড়ে ইসহাকের ঘরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইসহাকের পিতাকে ঘটনাটি অবহিত করে। কিন্তু তীর কে ছুঁড়তে পারে, কেউই বুঝে উঠতে পারলো না। এটা যে তাকে হত্যা করার সুদানীদের প্রথম প্রচেষ্টা, তা কেউ জানে না।

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আলী বিন সুফিয়ান কায়রোতে অবস্থান করছেন। অপরদিকে সুলতান আইউবী ক্রুসেডারদের সুহৃদ মুসলিম শাসক সাইফুদ্দীন, গোমস্তগীন ও আল-মালিকুস সালিহ-এর বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের কেন্দ্রীয় শহর হালবের দিকে

অগ্রসর হচ্ছেন। সুলতান আইউবীর এই মুসলিম বিরুদ্ধবাদীরা এমন বিশৃঙ্খল অবস্থায় পলায়ন করেছিলো যে, পথে কোথাও দাঁড়াতে পারেনি। পথে এমন তিন-চারটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিলো, যেখানে তারা যাত্রাবিরতি দিয়ে বিক্ষিপ্ত সৈনিকদেরকে গুছিয়ে নিয়ে সুলতান আইউবীর মোকাবেলা করতে পারতো। কিন্তু সেসব পথে না গিয়ে তারা পিছু হটার জন্য এমন পথ অবলম্বন করে, যেটি সামরিক দিক থেকে তাদের জন্য ব্যাপক ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। সুলতান আইউবী অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং ঐসব গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে নেন। তাঁর গন্তব্য হাল্‌ব।

গোয়েন্দা মারফত প্রাপ্ত তথ্যাবলীতে সুলতান জানতে পারছেন মিশরে কখন কী ষড়যন্ত্র মাথা তুলছে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তিনি কখনো পেরেশান হতেন না। কিন্তু ইসলাম ও ইসলামী সাম্রাজ্য বিরোধী ষড়যন্ত্র তাকে বেচাইন করে তুললো। আর এই বাস্তবতা ছিলো তাঁর জন্য বিষের ন্যায় তিক্ত যে, এসব ষড়যন্ত্রের হোতা হলো খৃস্টানরা আর এর ক্রীড়নক মুসলমান। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর ডান হাত। বরং বলা যায় আলী তাঁর চোখ-কান। নিজের অবর্তমানে সুলতান তাকে মিশর রেখে এসেছেন এবং তার সহকারী হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে নিজের সঙ্গে নিয়ে আসেন। মিশরের শাসনক্ষমতা আইউবীর ভাই আল-আদিলের হাতে। নিজ ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে আল-আদিল রাতে ঘুমান সামান্য। আলী বিন সুফিয়ানকে সব সময় সঙ্গে রাখেন। এভাবেই বর্তমানে মিশরের শান্তি, নিরাপত্তা ও এই ভূখণ্ডে ইসলামের মান-অস্তিত্ব সুরক্ষার দায়িত্ব এই দু'ব্যক্তির হাতে ন্যাস্ত।

আল-আদিল ও আলী বিন সুফিয়ানের ভালোভাবেই জানা আছে, সুলতান আইউবীর অবর্তমানে মিশরে নাশকতা বেড়ে চলেছে। তাছাড়া সুদানের দিক থেকে আশংকা বিদ্যমান। মাস চারেক আগে আল-আদিল সুদানীদের ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্রকে অবিশ্বাস্য সাফল্যের সাথে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে সুদানীদের ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি। কারণ, তাদের যে হামলাটি ব্যর্থ হয়েছিলো, সেটি তাদের নিয়মিত ফৌজের হামলা ছিলো না। সেই হামলা ব্যর্থ হওয়ার পরও সুদানের নিয়মিত সেনাবাহিনী কোনো প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই প্রস্তুত ছিলো। এই বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলো খৃস্টানরা। এমনকি কোনো কোনো ইউনিটের কমান্ডও ছিলো খৃস্টানদের হাতে।

তার প্রমাণ, সুদানের হামলার মোকাবেলায় সীমান্তে সীমান্ত বাহিনীর সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া আলী বিন সুফিয়ান বিপুলসংখ্যক

গোয়েন্দা সদস্যকে সীমান্ত এলাকায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারা মরু মুসাফির ও যাযাবরের বেশে সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। সীমান্ত চৌকিগুলোর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়েছে। এসব চৌকিতে তাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত থাকছে। সীমান্ত বাহিনীগুলোর টহলসেনারাও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। পাশাপাশি আছে আরো একটি আয়োজন। আলী বিন সুফিয়ানের কয়েকজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা বণিকের বেশে সুদানের সঙ্গে অবৈধ ব্যবসা করছে, যাকে চোরাচালানী বলা হয়। পণ্য দিয়ে তাদেরকে সীমান্ত পার করিয়ে দেয়া হতো। এরা সুদান গিয়ে বলতো, আমরা মিশরের সীমান্ত বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে এসেছি। সুদানে কিছু কিছু পণ্যের অভাব ছিলো। তন্মধ্যে সবজি উল্লেখযোগ্য। সুলতান আইউবীর পরামর্শে মিশরে অধিক হারে সবজি উৎপাদন করা হতো, যার একাংশ সুদান পাচারের মাধ্যমে সুদানের গোপন তথ্য সংগ্রহ করা হতো।

সুদানের যেসব ব্যবসায়ী মিশরী বণিকদের সঙ্গে কারবার করতো, তাদেরও অধিকাংশ গুপ্তচর, যারা মিশরের পক্ষে কাজ করতো। মিশরী গোয়েন্দারাই তাদেরকে তৈরি করে নিয়েছে। গুপ্তচরবৃত্তির এই পদ্ধতি সফল হলে সুলতান আইউবী নির্দেশ প্রদান করেন, সুদানের জন্য পণ্যের দাম সস্তা করে দাও, যাতে আমাদের এই কর্মপদ্ধতি সমগ্র সুদানে জালের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। সুলতানের নির্দেশ মোতাবেক জাল ছড়িয়ে দেয়া হলো এবং সুদানী ফৌজ ও সরকারের প্রতিটি গতিবিধি কায়রোতে গোচরীভূত হতে লাগলো। আলী বিন সুফিয়ান সীমান্তের কাছাকাছি দু'তিনটি জরুরী কেন্দ্র স্থাপন করে দেন। যখনই ওদিক থেকে কোনো সংবাদ আসতো, সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের কোনো না কোনো কেন্দ্র হয়ে সেই সংবাদ বিদ্যুদ্গতিসম্পন্ন ঘোড়ায় চড়ে কায়রো পৌঁছে যেতো। এ কাজের জন্য যেসব বাহন রাখা হয়েছিলো, তারা দিন-রাত অবিরাম ছুটে চলার ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলো।

সুদানে একটি বিস্তৃত পাহাড়ী এলাকা আছে। সেখানকার অধিবাসীরা সবাই মুসলমান। তাদের অধিকাংশ মিশরী ফৌজের সৈনিক। বিষয়টি সুলতান আইউবী জানেন। তাঁর এ-ও জানা আছে, এ লোকগুলো সুদানী ফৌজে ভর্তি হতে চায় না। সুলতান আইউবীর শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আগে মিশরী ফৌজে সুদানী হাবশী ও সুদানী মুসলমান সবাই ভর্তি হতো। তাদের কমান্ডারও ছিলো এক সুদানী। প্রিয় পাঠকদের হয়েতো মনে আছে, সেই কমান্ডারের নাম নাজি। সুলতান আইউবীর আগে নাজিই ছিলো মিশরের

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অথচ, দেশে খেলাফতের মসনদও ছিলো নিয়মতান্ত্রিক। এমারতও ছিলো। খলীফা বলুন কিংবা আমীর, তারা প্রকৃত অর্থে রাজা ছিলেন। খৃস্টানরা মিশরকে সালতানাতে ইসলামিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে এখানে নাশকতা ও ষড়যন্ত্রের আখড়া প্রতিষ্ঠিত করে। নাজি তাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সে মিশরের সুদানী ফৌজকে নিজের মুঠোয় নিয়ে নেয়। এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিলো পঞ্চাশ হাজার।

মিশরের শাসনক্ষমতা হাতে নেয়ার পর সুলতান আইউবীর সঙ্গে প্রথম সংঘাতটা হয় নাজির সঙ্গে। তিনি নূরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট থেকে বাছাইকৃত জানবাজ সৈন্য এনে মিশরের পঞ্চাশ হাজার সুদানী ফৌজকে ভেঙ্গে দেন। তার কতিপয় সালারকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং নতুন বাহিনী গঠন করে নেন। তার অল্প ক'দিন পরই তিনি আদেশ জারি করেন যে, সুদানের অপসারিত সৈন্যদের যারা আনুগত্যের শপথ নিয়ে নিষ্ঠার সাথে মিশরী ফৌজে শামিল হতে আগ্রহী, তাদেরকে ভর্তি করে নেয়া হোক। ফলে যেসব সুদানী মুসলমান মিশরী ফৌজে ছিলো, তারা সকলে ফিরে আসে। তারা বুঝতে সক্ষম হয়, তাদেরকে অমুসলিম ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নকে পরিণত করা হয়েছিলো। সুলতান আইউবীর ফৌজে শামিল হয়ে যখন তারা খৃস্টানদের বিরুদ্ধে দু'তিনটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং সুলতানকে কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করে, তখন তাদের ঈমান তাজা হয়ে যায়। সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদেরকে দ্বীন, ঈমান ও জাতীয় মর্যাদার উপদেশও প্রদান করা হতো। তাদেরকে বুঝানো হতো, যারা তাদের ধর্মের শত্রু, তারা তাদেরও শত্রু, যাদের চোখে মুসলিম মা-বোনদের কোনো মর্যাদা নেই। সুলতান আইউবীর যে বাহিনীটি আরবে লড়াই করেছে, তাদের বেশীরভাগ সৈন্যই সুদানী মুসলমান।

সুদান সরকার তথাকার মুসলমানদের নানাভাবে বাধ্য করার চেষ্টা করছে যে, মিশরী ফৌজে ভর্তি হওয়ার পরিবর্তে সুদানী ফৌজে ভর্তি হবে। কায়রোর গোয়েন্দা বিভাগ এ বিষয়ে অবগত। সুদানীরা মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালিয়েও দেখেছে। এর ফলে সুদানের উর্ধ্বতন এক সামরিক অফিসার গুপ্তভাবে খুনও হয়েছে। সুদান সেই এলাকায় যথারীতি সামরিক অভিযানও পরিচালনা করেছিলো। মুসলমানরা সুদানী বাহিনীকে পাহাড়-উপত্যকায় ছত্রভঙ্গ করে হত্যা করেছিলো ও তাড়িয়ে দিয়েছিলো। সেখানকার ভৌগোলিক কাঠামো মুসলমানদের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। পাহাড়-টিলা তাদের নিরাপত্তা বিধান করতো। এই মুসলমানরা যোদ্ধাও ছিলো বটে।

সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে রেখেছিলেন। মিশরী 'বণিক' কাফেলার মাধ্যমে তাদেরকে এতো পরিমাণ অস্ত্র দিয়ে রেখেছিলেন, যার দ্বারা তারা সারাবছর অবরোধের মধ্যেও লড়াই করতে সক্ষম ছিলো। তাদেরকে ক্ষুদ্র মিনজানীক এবং দাহ্য পদার্থও সরবরাহ করা হয়েছিলো। সুদানী মুসলমানরা সেগুলো ঘরে ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলো। সুলতান আইউবীর পরিকল্পনা ছিলো, সামরিক অভিযান কিংবা অন্য কোনো উপায়ে উক্ত অঞ্চলকে মিশরের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন, যাতে সেখানকার মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। এই অবস্থান সীমান্ত থেকে আধা দিনের পথ। আলী বিন সুফিয়ান সেখানে তার গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছিলেন, যারা শুধু সংবাদদাতাই নয়– অভিজ্ঞ কমান্ডো যোদ্ধাও ছিলো।

এই মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো পাঁচ হাজার। সংখ্যায় কম হলেও তারা বিরাট এক সামরিক শক্তি। এদের বাদ দিলে সুদানের হাতে থাকে শুধু কতিপয় হাবশী, যাদের কোনো সামরিক ঐতিহ্য নেই। তারা লড়াই করতো বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে। যুদ্ধের ময়দানে তাদের অবস্থা এই দাঁড়াতো যে, যদি তাতে দুশমনের পা উপড়ে যাওয়ার উপক্রম হতো, তাহলে তারা সিংহে পরিণত হতো। পক্ষান্তরে সামান্য বেকায়দায় পড়ে গেলে তারা পিছু হটতে শুরু করতো।

ইতিমধ্যে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য খৃস্টান বিশেষজ্ঞরা এসে গেছে এবং মিশরী ফৌজের দু'তিনজন গাদ্দার সালার সোনা-দানার লোভে সুদান চলে এসেছে। খৃস্টান বিশেষজ্ঞ দল ও মিশরী সালারদের বদৌলতে সুদানী ফৌজে কিছুটা যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই সুদান সরকার মিশরের উপর প্রকাশ্য হামলা করতে ভয় পেতো এবং এ কারণেই সুদান মুসলমানদেরকে তাদের ফৌজে শামিল করার চেষ্টা করছিলো। খৃস্টান উপদেষ্টারা জানতো, পঞ্চাশ হাজার হাবশীর মোকাবেলায় পাঁচ হাজার মুসলমানই যথেষ্ট।

❖ ❖ ❖

আলী বিন সুফিয়ান সংবাদ পেয়ে গেছেন যে, সুদানের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় সে দেশেরই কয়েদখানার এক সিপাহী সুদানী ফৌজের এক কমান্ডারকে হত্যা করে মুসলমানদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সংবাদদাতা গুপ্তচর আলীকে পুরো ঘটনা শোনায়। এ গুপ্তচর ঘটনাটা সরাসরি সিপাহীর মুখ থেকে শুনে এসেছে এবং এ তথ্যও জেনে এসেছে যে, ইসহাক নামক এক

মিশরী কমান্ডার সুদানের কয়েদখানায় বন্দী আছেন এবং এ উদ্দেশ্যে তার উপর নিপীড়ন চালানো হচ্ছে, যেনো তিনি তার এলাকার মুসলমানদের সুদানের অনুগত বানিয়ে দেন। গোয়েন্দা আলী বিন সুফিয়ানকে এ তথ্যও প্রদান করেন যে, উক্ত কমান্ডারের নিজ এলাকায় বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে।

'ইসহাককে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করা জরুরী মনে হচ্ছে'– রিপোর্টটা মিশরের ভারপ্রাপ্ত গবর্নর আল-আদিলকে অবহিত করে আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আপনি তো জানেন, কয়েদখানায় কিরূপ নিপীড়ন চলে। সেখানে পাথরও কথা বলতে বাধ্য হয়। নির্যাতনে বাধ্য হয়ে ইসহাক সুদানীদের অনুগত হয়ে যেতে পারে। আমি এ তথ্যও পেয়েছি, আমাদের আরো দু'তিনজন মুসলমান কমান্ডার সুদানের কয়েদখানায় বন্দী আছে। তাদের প্রত্যেকেরই উপর নিপীড়ন চলছে। আমি তো আপনাকে এ পরামর্শ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবো না, আমাদের কয়েকজন কমান্ডো সেনাকে সুদানের মুসলিম এলাকায় প্রেরণ করুন। আমার আশংকা হচ্ছে, কমান্ডার হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ সুদানী বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসবে।'

'অন্য দেশে কমান্ডো প্রেরণ করার আগে আমাদেরকে সবদিক ভালোভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে'– আল-আদিল বললেন– 'এর পরিণতিতে প্রকাশ্য যুদ্ধও বেঁধে যেতে পারে।'

'আমাদের হাতে ভাববার মতো সময় নেই'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'এক্ষুণি আমাদেরকে দু'টি অভিযান পরিচালনা করা আবশ্যক। প্রথমত, একজন বিচক্ষণ দূতকে পয়গাম দিয়ে মোহতারাম সুলতানের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং তার সিদ্ধান্ত জানতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমি স্বয়ং সুদানে প্রবেশ করে মুসলমানদের এলাকায় চলে যাবো। ওখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। পরিস্থিতির সঠিক চিত্র শুধু আমার চোখই দেখতে পারে। হতে পারে, ওখানে ফৌজ হামলা করবে না। ওখানে খৃষ্টানও আছে। তারা মুসলমানদেরকে কুসংস্কারে লিপ্ত করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাসের ভিত টলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে। মসজিদে মসজিদে তাদের প্রশিক্ষিত মাওলানা প্রেরণ করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে পারে। তারা মিশরে অনুপ্রবেশ করেও এমন চাল চেলেছে। আমার প্রবল আশংকা, তারা মুসলমানদের বিশ্বাস ও জাতীয় চেতনার উপর হামলা চালাবে। আপনার তো জানা আছে, আমাদের মুসলিম সম্প্রদায় দুশমনের আবেগময় ও উত্তেজনাকর বক্তব্যে দ্রুত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমাদের শত্রুরা বুঝে ফেলেছে, মুসলমানকে

যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করা সহজ নয়। বিকল্প হিসেবে তারা বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার যুদ্ধে এমন অস্ত্র ব্যবহার করে, মুসলমান তাতে কাবু হয়ে যায়। আপনার অনুমতি পেলে আমি ওখানে চলে যাচ্ছি। আপনি সুলতান আইউবীর নিকট একজন দূত পাঠিয়ে দিন।'

'আপনার অবর্তমানে আপনার দায়িত্ব কে পালন করবে?' আল-আদিল জিজ্ঞেস করেন।

'গিয়াস বিলবীস'– আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞাসার জবাব দেন– 'তার সঙ্গে আমার এক সহকারী যাহেদীনও থাকবে। আপনি আমার অনুপস্থিতি টেরই পাবেন না।'

'ভালোভাবেই টের পাবো'– আল-আদিল বললেন– 'আপনি শত্রুর দেশে যাচ্ছেন। যদি ফিরে আসতে না পারেন, তাহলে মিশর অন্ধ ও বোবা হয়ে যাবে।'

'আমি না থাকলে জাতি মরে যাবে না'– আলী বিন সুফিয়ান মুচকি হেসে বললেন– 'ব্যক্তি যখন জাতির জন্য প্রাণ দেয়, তখন জাতি জীবিত থাকে। সুলতান আইউবী যদি মনে করতেন, তিনি মৃত্যুবরণ করলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে, তাহলে তিনি ঘরেই বসে থাকতেন আর সালতানাতে ইসলামিয়া খৃস্টানদের হাতে চলে যেতো। সুলতানের এই নীতিটা আমার বড়ই ভালো লাগে যে, তিনি বলে থাকেন, দুশমনের অপেক্ষায় ঘরে বসে থেকো না। বরং তার উপর দৃষ্টি রাখো। যদি তাকে প্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পাও, তাহলে তার পার্শ্ব কিংবা পেছনে চলে যাও। আমি সেই নীতির ভিত্তিতেই সুদান যাচ্ছি। দুশমন যদি মুসলমানদের এলাকায় সাফল্য অর্জন করেই ফেলে, তাহলে আমরা আমাদের কোন্ কীর্তির জন্য গর্ব করবো?'

'ঠিক আছে, আপনি যান'– আল-আদিল বললেন– 'আমি সুলতানের নামে পয়গাম লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আলী বিন সুফিয়ান সুদান সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে চলে যান। আল-আদিল কাতিবকে ডেকে পয়গাম লেখাতে শুরু করেন। তিনি সুদানের মুসলমানদের খবরাখবর বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করান। এ-ও লিখান যে, এই বার্তা আপনার হাতে পৌছার আগে আলী বিন সুফিয়ান সুদান গিয়ে পৌছবেন। তিনি বার্তায় আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শের কথাও উল্লেখ করেন। অবশেষে সুলতানের নিকট সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করেন।

পত্রখানা দূতের হাতে দিয়ে আল-আদিল বললেন, প্রতিটি চৌকি থেকে ঘোড়া বদল করে নেবে এবং কোনো অবস্থাতেই ঘোড়ার গতি মন্থর হতে দেবে

না। পানাহার ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠেই সমাধা করবে। পথে যদি দুশমনের হাতে পড়ে যাও, তাহলে যে কোনোভাবে হোক পত্রখানা নষ্ট করে ফেলবে।

দূত রওনা হয়ে যায়।

আমর দরবেশ শহর ছেড়ে বহুদূর চলে গেছেন। এখন তার আশপাশে কোনো বসতি নেই। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তিনি রাত যাপনের জন্য উপযুক্ত একটি জায়গার সন্ধান করছেন। দূরে এক স্থানে কিছু গাছ-গাছালী চোখে পড়লো। সেখানে পানিও থাকতে পারে। কিন্তু তার কাছে পানির মজুদ আছে। উটগুলোকেও পানি পান করানোর প্রয়োজন নেই। তিনি মরু দস্যুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বৃক্ষময় এলাকা থেকে দূরে অবস্থান করতে চান। তার সঙ্গে কালো বোরকায় আবৃতা আশি। অত্যন্ত মূল্যবান মেয়ে। ডাকাত দলের চোখে পড়ে গেলে তার রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। ভেবে-চিন্তে আমর দরবেশ পার্শ্বেই এক স্থানে নেমে পড়েন এবং সেখানেই তাঁবু স্থাপন করেন।

হঠাৎ আমর দরবেশ দু'জন উষ্ট্রারোহীকে তাদের দিকে আসতে দেখেন। তিনি আশিকে তাঁবুর ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে পর্দা ফেলে দেন এবং নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর চোগার ভেতরে তরবারী লুকায়িত আছে। আছে খঞ্জরও। তাঁবুতে দু'টি ধনুক ও অনেকগুলো তীর আছে।

উষ্ট্রারোহীদেরকে নিজের দিকে আসতে দেখে আমর দরবেশ ভাবতে শুরু করলেন, ওরা যদি ডাকাত হয়ে থাকে, তাহলে কি আমি তাদের মোকাবেলা করতে পারবো। তবে মোকাবেলা করতে হলে আশিকে তিনি সঙ্গে পাবেন বলে নিশ্চিত। তিনি জানেন, আশি শুধু মনোমুগ্ধকর মেয়েই নয়– লড়াকুও বটে। তার তীর চালনার প্রশিক্ষণ আছে। সে খৃস্টানদের গড়া এক নাশকতাকারী নারী।

উষ্ট্রারোহীরা এগিয়ে আসছে। আমর দরবেশ তাদের প্রতি মুখ রেখে আশিকে বললেন– 'ধনুকে তীর সংযোজন করো। ওরা যদি ডাকাত প্রমাণিত হয়, তাহলে পেছন থেকে তীর ছুঁড়বে।'

উষ্ট্রারোহীরা তাঁবুর নিকটে এসে দাঁড়িয়ে যায়। একজন উটের পিঠ থেকেই জিজ্ঞেস করে– 'তোমরা কারা? কোথায় যাচ্ছো?'

আমর দরবেশ আকাশপানে হাত তুলে চোখ বন্ধ করে বললেন– 'যার বুকে আসমানের পয়গাম থাকে, তার কোনো গন্তব্য থাকে না। আমি কে? আমিও তো জানি না। আসমান থেকে একটি পয়গাম আসলো। আমার বুকে গেঁথে গেলো। তারপর ভুলে গেলাম, আমি কে, আমি কোথায় যাচ্ছি। সে সত্ত্বা

আমার বুকে আলো প্রজ্বলিত করেছেন, তিনিই বলতে পারেন, আমি কে, কোথায় যাচ্ছি। এখানে আমার ইচ্ছার কোন দখল নেই। আমি এখন সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছি। সকালবেলা হয়তো আবার পেছন দিকে হাঁটা দেবো।

আগন্তুক দু'জন উটের পিঠ থেকে নেমে আসে। একজন বললো– 'আপনাকে তো একজন পীর-পয়গম্বর বলে মনে হচ্ছে। আমরা উভয়ে মুসলমান। আপনি কি গায়েবের খবর বলতে পারেন? আমাদের ন্যায় গুনাহ্গারদেরকে সোজা পথ দেখাতে পারেন?'

'আমিও মুসলমান'– আমর দরবেশ আপ্লুত কণ্ঠে বললেন– 'তোমরাও মুসলমান। আমি তোমাদের ধ্বংস দেখতে পাচ্ছি। আমিও তোমাদের ন্যায় ঘুরেফিরে জিজ্ঞেস করতাম, সোজা পথ কোন্‌টি? কিন্তু কেউ বলতে পারেনি। একদিন রক্তরঞ্জিত কতগুলো লাশের মধ্যে আমি সবুজ বর্ণের চোগা পরিহিত সাদা দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তিনি আমাকে লাশের মধ্য থেকে তুলে এনে সোজা পথের সন্ধান দিলেন। পরক্ষণেই তিনি লাশগুলোর খুনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তো পাহাড়ে-জঙ্গলে বসবাস না করে তোমরা মরু এলাকায় চলে যাও। মিশরের নাম ভুলে যাও। ওটা ফেরাউনদের দেশ। ওখানে যখন যিনি রাজার আসনে আসীন হন, মিশরের মাটি ও বাতাস তাকেই ফেরাউন বানিয়ে দেয়।'

'এখন তো সেখানকার রাজা সালাহুদ্দীন আইউবী'– এক উষ্ট্রারোহী বললো– 'তিনি তো খাঁটি মুসলমান।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী নামের মুসলমান'– আমর দরবেশ এমন ভঙ্গীতে বললেন, যেনো তিনি স্বপ্ন দেখছেন– 'সে-ই তো তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনছে। তোমরা যে মাটির তৈরি, সেই মাটির মর্যাদার জন্য রক্ত ঝরাও। তোমরা সুদানের সন্তান।'

'কিন্তু সুদানের রাজা তো কাফির।' উষ্ট্রারোহী বললো।

'তিনি মুসলমান হয়ে যাবেন'– আমর দরবেশ বললেন– 'তিনি মুসলমানদের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। তার ফৌজ কাফিরদের ফৌজ। তাই তিনি ইসলামের নাম মুখে আনেন না। তোমরা চলে যাও। তরবারী, বর্শা, তীর-ধনুক নিয়ে যাও। উট-ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে যাও। তাকে বলো, তোমরা তার মোহাফেজ। তোমরা সুদানের মোহাফেজ।'

তারপর আমর দরবেশ হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন– 'যাও, ওঠো, এখান থেকে চলে যাও।'

আগন্তুক দু'জন উটের পিঠে চড়ে বসে এবং চলে যায়। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একজন অপরজনকে বললো– 'ধোঁকা দেবে না।'

'আমার ধারণাও তাই'– অপরজন বললো– 'পাক্কা মনে হচ্ছে, পাঠ ভুলেনি।'

'আশির মতো রূপসী মেয়ে যদি উপহার হিসেবে পেয়ে যাই, তাহলে পিতা-মাতার বিরুদ্ধে চলে যেতেও কুণ্ঠিত হবো না।' উষ্ট্রারোহী বললো।

'চলো, আমরা ফিরে যাই'– অপরজন বললো– 'গিয়ে বলবো, সব ঠিক আছে...। আচ্ছা, মেয়েটি বোধ হয় তাঁবুতে আছে।'

'লোকটা সতর্ক মনে হচ্ছে। মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছে'– একজন বললো– 'আমাদেরকে তাদের হেফাজত করার প্রয়োজন নেই।'

'প্রয়োজন নেই'– অপরজন বললো– 'সৈনিক মানুষ। সঙ্গে অস্ত্র আছে। তীর-ধনুকও আছে। আশিও সতর্ক মেয়ে।'

এরা দু'জন সুদানী গুপ্তচর। আমর দরবেশ পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করছে কিনা জানবার জন্য তাদেরকে পেছনে প্রেরণ করা হয়েছে। আমর দরবেশও বিচক্ষণতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে তারা নিশ্চিত হয়ে ফিরে গেছে।

'ওরা ডাকাত নয়'– তাঁবুতে প্রবেশ করে আমর দরবেশ আশিকে বললেন– 'চলে গেছে।'

'এরা দস্যু অপেক্ষাও ভয়ংকর'– আশি বললো– 'তুমি তাদেরকে যথার্থই উত্তর দিয়েছো। যারা তোমাকে এদিকে প্রেরণ করেছে, এরা তাদের গুপ্তচর। এরা খোঁজ নিতে এসেছে, তুমি তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছো কিনা।'

'তুমি কি এদেরকে চেনো।'

'আমি এদের গাছের ডাল'– আশি বললো– 'যদি তাদের থেকে কেটে পড়ে যাই, তাহলে শুকিয়ে যাবো।'

'তাহলে তো আমাকে তোমার থেকেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

মেয়েটি হেসে ওঠলো এবং বললো– 'তুমি তো নিজেই আমাকে পুরস্কার স্বরূপ চেয়ে এনেছো।'

তাঁবুতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আহমদ দরবেশ। আশিও ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ আশির চোখ খুলে যায়। বাইরে কতগুলো চিতা হুংকার দিয়ে বেড়াচ্ছে। উটগুলো ভয়ে দাঁড়িয়ে গেছে এবং ভয়ার্ত চিৎকার করছে। আশি আমর দরবেশকে জাগিয়ে তুলে বললো– 'আমি ভয়ে মরে যাচ্ছি।' আমর দরবেশ

বাইরের হুংকার-চিৎকার শুনতে পান। আশি বললো– 'এগুলো ব্যাঘ্র। নিকটে আসবে না। উটগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। কোনো ভয় নেই। উটের ভয়ে ব্যাঘ্ররা পালিয়ে যাবে।'

হঠাৎ ব্যাঘ্রগুলো পরস্পর হামলে পড়ে। সবগুলো ব্যাঘ্র একসঙ্গে হুংকার ছাড়ে। আশি চিৎকার করে উঠে আমর দরবেশের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আমর বসা ছিলেন। তিনি মেয়েটিকে এমনভাবে কোলে ও বাহুবন্ধনে নিয়ে নেন, যেমনিভাবে মা তার ভয়পাওয়া শিশুকে লুকিয়ে ফেলেন। মেয়েটির সারা শরীর কাঁপছে। তার মুখ থেকে কথা বেরুচ্ছে না। ব্যাঘ্রগুলো পরস্পর লড়াই করতে করতে দূরে চলে যায়।

আমর দরবেশ মেয়েটিকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে বললেন– 'ওরা চলে গেছে। তুমি শুয়ে পড়ো।'

'না'– আশি তার কোল থেকে মাথা সরালো না। ক্ষীণ কণ্ঠে বললো– 'তুমি আমাকে কিছুক্ষণ এভাবে থাকতে দাও।'

এ দৃশ্য আমর দরবেশের পছন্দ নয়। তাঁর মনে ধারণা জন্মালো, মেয়েটি তাঁকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। তিনি আরো শক্ত পাথর হয়ে যান। এমন রূপসী মেয়ে ইতিপূর্বে তিনি কখনো ছুঁয়ে দেখেননি। এখন তার মনে হতে লাগলো, মেয়েটি এভাবে পড়ে থাকলে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন না। যতো পাথরই হোন, তিনি মানুষ তো বটে। তদুপরি সুদেহী সুপুরুষ। আমর দরবেশ নিজের নফসের মোকাবেলা করতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি মাথা উঠায়। অন্ধকারে তার চেহারার প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। সে আমর দরবেশের মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো– 'তুমি এক রাতে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, আমার পিতা-মাতা কারা এবং কোথায়? তোমার যে সঙ্গী তোমার আগে উক্ত কক্ষে এসেছিলো, সেও আমাকে একই প্রশ্ন করেছিলো। তখন আমার এর উত্তর জানা ছিলো না। কিন্তু প্রশ্নটা আমাকে অস্থির করে তুলেছিলো এবং বহু অতীতের স্মৃতিমালা জাগিয়ে তুলেছিলো। কিছু স্মৃতি আমার স্মরণ আসছিলোও। কিন্তু পরক্ষণেই তা স্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিলো। আজ তা স্মরণে এসে গেছে। তুমি যখন বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে আমাকে কোলে তুলে লুকিয়ে ফেলেছিলে, তখন আমার স্মৃতিতে আলোর মতো চমকে উঠেছিলো। তার আলোকে আমি আমার বহু পুরনো স্মৃতি দেখতে পাই। আমি তখন বেশ ছোট ছিলাম। বাবা আমাকে ঠিক এমনি তার বুকে জড়িয়ে নিয়ে নিজ বাহুতে লুকিয়ে ফেলেছিলেন।'

মেয়েটি নীরব হয়ে যায়। চুপচাপ স্মৃতির পাতা উল্টাতে থাকে সে। হঠাৎ শিশুর ন্যায় লাফিয়ে উঠে বললো– 'হ্যাঁ, আমার পিতা ছিলেন। এমনই মরু এলাকা ছিলো। রাত ছিলো না দিন ছিলো মনে পড়ছে না। আমরা একটি কাফেলার সঙ্গে যাচ্ছিলাম। অনেকগুলো অশ্বারোহী ধেয়ে এসে কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের কাছে তরবারী ছিলো, বর্শা ছিলো। ভয়ানক এক দৃশ্য ছিলো, যা আজ তোমার কোল ও বাহুর উত্তাপে স্মৃতিতে জেগে উঠেছে। আব্বাজান আমাকে তোমারই ন্যায় আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছিলেন। হ্যাঁ, মায়ের কথাও মনে পড়ছে। মা আমার গায়ের উপর পড়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত, তিনি আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তারপর মনে পড়ছে, তিনি একদিকে পড়ে গিয়েছিলেন। আমার রক্তের কথাও মনে পড়ছে। এক ব্যক্তি আমাকে আমার বাহুতে ধরে তুলে নিয়েছিলো। একজন বলেছিলো– খাঁটি হিরা। জোয়ান হলে দেখবে। আমার সে সময়কার চিৎকারের কথাও মনে পড়ছে। সেদিন আমি আজ রাতের ন্যায় চিৎকার করছিলাম।'

'মস্তিষ্কের উপর বেশী চাপ সৃষ্টি করো না'– আমর দরবেশ মেয়েটির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন– 'আমি তোমার পুরো কাহিনী বুঝে ফেলেছি। তুমি মুসলমানের সন্তান। তুমি আরব কিংবা ফিলিস্তিনের বাসিন্দা। খৃস্টানরা মুসলমানদের কাফেলা লুণ্ঠন করতো। এখনো যেসব অঞ্চল খৃস্টানদের দখলে, সেখানে তারা মুসলমানদের কাফেলা লুট করে থাকে। তারা সোনা-চাঁদি এবং তোমার ন্যায় রূপসী মেয়েদেরকে নিয়ে যায়। আমি বুঝে ফেলেছি, তুমি এ পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছেছো।'

'আমি যখন সবকিছু বুঝতে শুরু করেছি, তখন আমি এমন বহু মেয়েকে দেখেছি'– আশি বললো– 'আমাদেরকে উন্নতমানের খাবার ও দামী দামী পোশাক দেয়া হতো। গৌর বর্ণের পুরুষ-মহিলারা আমাদেরকে আদর করতো। তারা আমার মস্তিষ্ক থেকে সব স্মৃতি মুছে দিয়েছে। আমি ওখানেই বড় হয়েছি। জায়গাটি ছিলো জেরুজালেম। শৈশব থেকেই আমাদেরকে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রশিক্ষণ শুরু হয়। মদও পান করানো হতো। আমাকে প্রথমে আরবী এবং পরে সুদানী ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। তারপর যখন আমি যৌবনে পা রাখি, তখন আমাকে এই কাজে ব্যবহার করা শুরু হয়, যে কাজে তুমি আমাকে দেখেছো। তীর-তরবারী চালনার তো আমাদেরকে বহু অনুশীলন করা হয়। আজ যখন তুমি আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিজ আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছো, তখন হঠাৎ আমার পিতার কথা মনে পড়ে যায়।

আমার ব্যাপারে তাঁর আবেগ ছিলো পবিত্র। আর তোমার আবেগও পবিত্র। এ কারণেই আমি তোমাকে বলেছিলাম, আরো কিছু সময় আমাকে তোমার কোলে পড়ে থাকতে দাও। তোমার কোলে মাথা রেখে আমি পিতার মমতা অনুভব করছিলাম। আজ আমি শপথ নিলাম, আমি যতোদিন বেঁচে থাকবো, তোমার গোলাম হয়ে থাকবো। এখন আমি সুদানীদের কোনো কাজে আসবো না। এটা তোমারই স্বচ্চরিত্রতা ও সৎ নিয়তের সুফল। আমি মুসলমান। তুমি আমার শিরায় মুসলমান পিতার রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছো। এখন আর আমি তোমাকে সেই কাজ করতে দেবো না, যে কাজের জন্য তুমে এসেছো। তুমি আমার ভেতরটায় ঈমানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছো।'

'কয়েকদিন তোমাকে এ কাজ করতে হবে'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাচ্ছি।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করবো।'

তুরের জ্যোতি

তাঁবু গুটিয়ে সুদানী মুসলমানদের পার্বত্য অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আমর দরবেশ। কিন্তু সফরসঙ্গী রূপসী মেয়েটি নিয়ে তার অন্তহীন ভাবনা। মেয়েটি মুসলমান। এ কারণে আমর দরবেশ তাকে ক্রুসেডারদের হাত থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছেন। মেয়েটি চার-পাঁচ বছর বয়সে ক্রুসেডারদের হাতে চলে গিয়েছিলো। তারপর বিশ বিশটি বছর ব্যয় করে তারা তার গায়ে যে রঙের প্রলেপ মাখিয়েছে, তা অপসারণ করা সহজ নয়। ভালো হলো, মেয়েটি নিজেই বুঝে ফেলেছে যে, সে মুসলমান ঘরের সন্তান। এখন তার হৃদয়ে ক্রুসেডারদের প্রতি প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সে আমর দরবেশকে বলে দিয়েছে, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। কিন্তু আমর দরবেশ ভাবছেন, মেয়েটির উপর আস্থা স্থাপন করা যায় কিনা।

একই তাঁবুতে রাত কাটিয়ে ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মেয়েটি আমর দরবেশকে বললো– 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি এখনো আমাকে তোমার শত্রু মনে করছো।'

'নারীর ফাঁদে পড়ে মুসলিম জাতি বহু ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে আশি!'– আমর দরবেশ উত্তর দেন– 'তুমি অত্যন্ত রূপসী মেয়ে। তোমার চলন-বলন ও ভাবভঙ্গী মানুষের মধ্যে পশুত্বকে জাগিয়ে তোলে। আমি এক যুবক। আমি কয়েক বছর যাবত যুদ্ধের ময়দানে আছি। কিছুদিন সুদানের কয়েদখানায় যুদ্ধবন্দী হিসেবে সময় কাটিয়েছি। এই দীর্ঘ সময়টায় আমি আপনজনদের চেহারা পর্যন্ত দেখিনি। রাতে তাঁবুতে তুমি আমার সঙ্গে একাকী ছিলে। আমি রাতভর মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছি, যেনো আমি পশুত্বের মোকাবেলায় জয়ী হতে পারি। আমি সফল হয়েছি। আল্লাহ আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। তারপর ভাবতে শুরু করি, আমি তোমাকে শত্রু ভাববো, না বন্ধু। সেই ভাবনা এখনো ভাবছি। এখনো আমি তোমার এই সন্দেহ দূর করতে পারছি না যে, আমি তোমাকে শত্রু ভাবছি। শেষ পর্যন্ত তোমাকেই প্রমাণ করতে হবে, তুমি বিশ্বাসযোগ্য।'

'আমি আবারও বলছি, তুমি আমার বুকে ঈমানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছো'– আশি বললো– 'আর আমি তোমাকে এ কথাও বলে রাখছি, সুদানীরা তোমাকে যে মিশন নিয়ে প্রেরণ করেছে, তুমি যদি তাতে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চাও, আমি তোমাকে সঙ্গ দেবো। জীবন বিপন্ন হলেও আমি পিছপা হবো না। আমিই তো তোমাকে বলেছিলাম, যে দু'জন লোক এসে তোমার ভক্ত হয়ে চলে গেলো, তারা মূলত্ সুদানীদের গুপ্তচর।'

'আমাকে ভাবতে দাও আশি'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমি বুঝে ফেলেছি, আমার চার পাশে গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমাকে আমি সেই জালের একটি অংশ মনে করি। এখনো তুমি তা-ই করো, যা তোমাকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আমিও সেই পাঠ ও নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করবো, যা আমাকে শেখানো হয়েছে। আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি অন্য কোনো উদ্দেশে যাচ্ছি। কিন্তু এই মিশন থেকে মুখ ফেরানো সম্ভব নয়। আমি এর পরিণাম জানি। দু'তিনটি তীরের গতি সবসময় আমার দিকে থাকে। আমি তাদেরকে তখনই দেখতে পাবো, যখন তীর আমার বুকে এসে বিদ্ধ হবে।'

'আমি সর্বাবস্থায় তোমাকে সঙ্গ দেবো'– আশি বললো– 'আমি প্রমাণ করবো, আমার শিরায় মুসলমানের রক্ত বিদ্যমান।'

আমর দরবেশ ও আশি দু'টি উটে চড়ে মুসলিম ভূখণ্ড অভিমুখে এগিয়ে চলছেন। তৃতীয় উটটিতে তাদের তাঁবু ও অন্যান্য মালপত্র বোঝাই করা। যে আশি এক সময় অর্ধনগ্ন চলাফেরা করতো, এখন সে আপাদমস্তক কালো বোরকায় আবৃত। মুখমণ্ডলও নেকাবে ঢাকা। দেখে বুঝবার কোনো উপায় নেই যে, মেয়েটি ক্রুসেডারদের একটি সুদর্শন তীর, যা পাথরসম শক্ত একজন মানুষের অন্তরে ঢুকে গেলে মানুষটি মোম হয়ে খৃস্টানদের ধাঁচে তৈরি হয়ে যায়।

আমর দরবেশ ও আশি যেদিকে যাচ্ছেন, দূরে এক অশ্বারোহীকে সেদিকেই যেতে দেখা গেলো। আমর দরবেশ ভাবলেন, এই লোকটিও সম্ভবত সেই সুদানী গুপ্তচরদের একজন, যারা তার সঙ্গে ছায়ার মতো লেপ্টে আছে। তার এই ধারণা যদি ভুল হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সে মরুদস্যু। আশপাশে কোথাও তার সাঙ্গরা লুকিয়ে আছে। তাই যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে আমর কী করবেন?'

'আশি'– সফর সঙ্গীকে উদ্দেশ করে আমর দরবেশ বললেন– 'তুমি কি

ঐ অশ্বারোহীকে দেখতে পাচ্ছো?'

'অনেকক্ষণ ধরেই দেখছি।'

'যদি দস্যু হয়ে থাকে, তাহলে কি আমরা তাদের মোকাবেলা করতে পারবো?'

'আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে'– 'আশি সাহসী জবাব দেয়– 'যদি রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় এসে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে কী হবে বলতে পারবো না। দিনের বেলায় হলে মোকাবেলা করবো। তোমার সঙ্গে স্বয়ং আমি একটি সম্পদ। তারা আমাকে তোমার হাত থেকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমাকে তারা জীবন্ত নিতে পারবে না।'

নানাবিধ শংকার মাঝে দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলে আমর দরবেশ ও আশি। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে অস্ত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ধীরে ধীরে পর্বতমালা চোখে পড়তে শুরু করেছে তাদের। উঁচু পর্বতমালা এখনো বহুদূর হলেও অঞ্চলটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেই স্থান আর বেশী দূরে নয়। উটগুলো এগিয়ে চলছে।

যে অঞ্চল থেকে তার মিশন শুরু করবেন বলে কথা, সেখানে এসে পৌঁছে গেছেন আমর দরবেশ। মুসলমানদের প্রথম গ্রামটায় পৌঁছতে আর অল্প কিছু পথ বাকি। আমর দরবেশ স্বয়ং সেই গ্রামের বাসিন্দা। যে অশ্বারোহী লোকটি দূর পথে অগ্রসর হচ্ছিলো, গতি পরিবর্তন করে সে এদিকে এগিয়ে আসে এবং আমর দরবেশের সঙ্গে মিলিত হয়।

'তোমাদের আস্তানা ঐখানে'– অশ্বারোহী আমর দরবেশকে উদ্দেশ করে বললো– 'তোমরা আমাকে না চিনলেও আমি তোমাদেরকে চিনি।'

লোকটিকে দেখে আশি মুখের নেকাব সরিয়ে হাসতে শুরু করে। অশ্বারোহী তাকে জিজ্ঞেস করে– 'সফর কেমন কাটলো?'

'খুব ভালো'– আশি হাসিমুখে জবাব দেয়।

'তোমরা ভয় পাওনি তো'– আরোহী জিজ্ঞেস করে– 'সফরকালে তোমাদের নিরাপত্তার এমন ব্যবস্থা ছিলো, যা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। অন্যথায় এমন একটি রূপসী মেয়ে নিয়ে এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারতে না।'

'তুমি কে?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করেন।

'সুদানী মুসলমান'– আরোহী জবাব দেয়– 'এখন এ ভাবনা ভেবো না, তুমি কে আর আমি কে। তোমরাও আমার ন্যায় এ অঞ্চলেরই বাসিন্দা। তুমি ভালোভাবেই জানো, আমরা যদি সামান্যতম ভুলও করি, তাহলে এখানকার

মুসলমানরা আমাদের চামড়া তুলে ফেলবে।'

আরোহী আমর দরবেশের আরো কাছে এসে কানে কানে বললো– 'এ কথাও মনে রেখো,তুমি যদি দায়িত্ব পালনে সামান্যতম হেরফের করো, তাহলে বিনা নোটিশে খুন হয়ে যাবে। এখানে তোমার কাজ কী তা তোমার ভালোভাবেই জানা আছে। এই রাতটা বিশ্রাম করবে। আগামীকাল থেকে এখানে তোমার নিকট লোকজন আসতে শুরু করবে। আশির জানা আছে, তাকে কী করতে হবে।'

আমর দরবেশের সবকিছু জানা আছে। তার দায়িত্ব এই এলাকার মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো এবং মুসলমানদেরকে সুদানের অফাদার বানিয়ে সুদানী বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা।

সুলতান আইউবী মিশরে অনুপস্থিত। এ মুহূর্তে তিনি আরব ভূখণ্ডে শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধরত। ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা হলো, সুদানী ফৌজকে প্রস্তুত করে মিশরের উপর আক্রমণ করাবে। কিন্তু সুদানী মুসলমানদের যুদ্ধবাজ গোত্রগুলো সুদানের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সুলতান আইউবীর ভক্ত ও অনুসারী। আমর দরবেশ তাদের ভক্তি-বিশ্বাসকে তছনছ করে দিতে এসেছেন।

সূর্য ডুবে গেছে। আমর দরবেশ আগন্তুক অশ্বারোহীর সহায়তায় তাঁবু স্থাপন করেন। আরোহী বিদায় নেয়ার আগে বললো– 'আগামীকাল সম্ভবত তোমাদের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ হবে না। সকাল সকালই লোকজন এখানে আসতে শুরু করবে।' সে একটি পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললো– 'সাঝের আলো আঁধারীতেও পাহাড়টা তোমাদের চোখে ছাতার ন্যায় বৃক্ষ মনে হবে। আগামী রাত ওখানে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবে। কাল যে পোশাক পরিধান করবে, ভোরেই তা প্রস্তুত করে রাখবে। আমি যাচ্ছি। এখন থেকে প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করবে।'

আরোহী মেয়েটিকে ইঙ্গিতে বাইরে নিয়ে বললো– 'তোমাকে বেশী সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এখানকার মুসলমানরা জংলী। তোমার হেফাজতের জন্য আমরা প্রস্তুতি আছি। কিন্তু তোমার হেফাজত নিজেকেই বেশী করতে হবে। এই লোকটাকে আয়ত্ত্বে রাখবে।' সে মেয়েটির দু'কাঁকের উপর ছড়িয়ে থাকা চুলে বিলি কেটে ঠোঁটে শয়তানী হাসি হেসে বললো– 'এই সুদর্শন শিকলগুলোয় তো তুমি সিংহকেও আটকে ফেলতে পারো।'

'তুমিও তো এখানকার মুসলমান'– আশি বললো– 'তুমি হিংস্র নও কি?'

'তোমার দর্শনে কে হিংস্র হয়ে ওঠে না?' বলেই আরোহী ঘোড়ার পিঠে চড়ে সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে হারিয়ে যায়।

এই অশ্বারোহী ঈমান নীলামকারী মুসলমানদের একজন। সুদানের সহজ-সরল মুসলমানদের বিশ্বাসের উপর পরিচালিত যুদ্ধের সেনাপতি। এই এলাকারই বাসিন্দা। কিন্তু কেউ জানে না লোকটি জাতির আস্তিনের বিষাক্ত সাপ। এই মিশনে সে একা নয়। তারা আট-দশজন মুসলমানের একটি দল।

ঘোড়ায় চড়ে লোকটি একটি গ্রামের দিকে ছুটে চলে। পথে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তারই পথপানে তাকিয়ে ছিলো সে।

'সব ঠিক তো?' লোকটি আরোহীকে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে'– আরোহী জবাব দেয়– 'তবে যে কোনো সময় পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে। ক্রুসেডাররা যদি আমাকে পরিপক্ক পাঠ শিখিয়ে থাকে, তাহলে আমি বলবো, মেয়েটার চিন্তাধারা পাল্টে গেছে। তাকে কেমন যেনো আনমনা ও নীরব মনে হলো।'

'তা হয় না। আশি অনেক সতর্ক ও বিচক্ষণ মেয়ে।'

'তাহলে বোধ হয় দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে নির্জীব হয়ে পড়েছে'– আরোহী বললো– 'তাছাড়া আমর দরবেশও তো কম হিংস্র নয়।'

কথা বলতে বলতে তারা গ্রামে ঢুকে পড়ে। এক স্থানে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে। অশ্বারোহী ও তার সঙ্গী তাদের নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো– 'আমরা ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। এখন গ্রামে ফিরছি। তারপর বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বললো– 'এখান থেকে সামান্য দূরে এক বুযুর্গের আবির্ভাব ঘটেছে। লোকটি শুধু আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন। দিনের বেলায়ও ডানে-বায়ে দু'টি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন। তাকে দেখে আমরা তার কাছে বসে পড়েছিলাম। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। মুখস্ত পড়েন। আমাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলেন না। আমরা তাকে ডাকলাম। তিনি রা করলেন না। তার তাঁবুর নিকট হতে একটি ধোঁয়ার কুণ্ডলী উত্থিত হয়ে উপরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং তার মধ্য হতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। মেয়েটির রূপ আমরা তোমাকে বলে বুঝাতে পারবো না। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। কেননা, মানুষ নয়– মেয়েটিকে পরী বলে মনে হলো। মেয়েটি বুজুর্গের সম্মুখে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লো। পরে সেজদা থেকে ওঠে

বুজুর্গের মুখের সঙ্গে কান লাগালো। বুজুর্গের ওষ্ঠাধর নড়ে উঠলো। মেয়েটি আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেলো।'

'আমরা ভয়ে পালাতে উদ্যত হলাম। কিন্তু মাটি আমাদেরকে ধরে রাখে। সম্ভবত মেয়েটির চোখ আমাদেরকে আটকে রাখে। সে আমাদেরকে বললো- ইনি খোদার দূত। তোমাদের সকলের জন্য পয়গাম নিয়ে এসেছেন। তাকে বিরক্ত করো না। এ মুহূর্তে তিনি খোদার সঙ্গে কথা বলছেন। তোমরা আগামী দিন এসো। যদি তোমাদের প্রতি তার দয়া হয়, তাহলে তিনি তোমাদের প্রত্যেককে তূর পর্বতের দীপ্তি দেখাবেন। আমি এই মাত্র তূর পর্বত থেকে এসেছি। তিনি আমাকে তলব করেছিলেন। আমার কানে কানে তোমাদেরকে বলতে বলেছেন যে, তিনি তোমাদের ভাগ্য বদলে দেবেন। যদি তোমরা অধৈর্য হও, তাহলে তিনি অন্যত্র চলে যাবেন। আমরা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। আমরা সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিলাম। আমরা কিছুই বলতে পারিনি। বুজুর্গের প্রতি তাকালাম, দেখতে পেলাম, তার মাথার উপর নূর চমকাচ্ছে। আমরা সেখান থেকে চলে এলাম।'

লোকগুলোর কণ্ঠস্বর স্পর্শকাতর। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো, তারা বিস্মিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত। মানবীয় ফিতরাতের একটি দুর্বলতা হলো, বিস্ময়কর বক্তব্য চেতনাকে নাড়িয়ে তোলে। স্পর্শকাতরতা আনন্দ দান করে। কাহিনী শ্রবণে দু'এলাকাবাসীর সে অবস্থা-ই সৃষ্টি হলো। তারা দু'টি গৃহের দরজায় করাঘাত করে দু'তিনজন লোককে ডেকে আনে এবং তারা যা শুনেছে, তাদেরকে শোনায়। অশ্বারোহী ও তার সঙ্গী কাহিনী বর্ণনায় একটি বিশেষ আকর্ষণ যুক্ত করে দেয়। তারা মেয়েটির রূপের বিবরণ এমন ভাষায় ও এমন শব্দে প্রদান করে যে, শ্রোতারা খোদা, কুরআন ও উক্ত বুযুর্গের পরিবর্তে মন-মস্তিষ্কে মেয়েটিকেই স্থান দিতে শুরু করে। তারা অশ্বারোহী ও তার সঙ্গীকে মেহমান হিসেবে বরণ করে নেয়। অন্যান্য ঘরের লোকজনও এসে ভিড় জমায়।

ভোর বেলা। সূর্য এখনো উদিত হয়নি। গ্রামের সব মানুষ অশ্বারোহী ও তার সঙ্গীর নেতৃত্বে আমর দরবেশের আস্তানা অভিমুখে ছুটে চলে। তাঁবুর সম্মুখে ছোট্ট একটি জাজিমের উপর আমর দরবেশ এলোপাতাড়ি বসে আছেন। চক্ষু বন্ধ করে বিড় বিড় করছেন। একটি লাঠি তার ডানে, একটি

বাঁয়ে। মাটিতে পুঁতে দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। লাঠি দুটোর মাথায় তেলে ভেজা কাপড় জ্বলছে। এগুলো প্রদীপ। আমর দরবেশের আট-দশ পা দূরে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামবাসীরা এসে তাদের কাছে দাঁড়িয়ে যায়।

তাদের একজন বললো– 'আমি এগিয়ে গিয়ে বুযুর্গের সঙ্গে কথা বলি।' তিন-চার পা অগ্রসর হওয়ার পর লোকটি পেছন দিকে এমনভাবে চিৎ হয়ে পড়ে যায়, যেনো কেউ তাকে সামনের দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ওঠে সে জনতার মাঝে গিয়ে দাঁড়ায়। ভয়ে থর থর করে কাঁপছে লোকটি। সে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো– 'কেউ সম্মুখে যেও না। কে যেনো আমাকে সামনে থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। আমি কাউকে দেখতে পাইনি। বোধ হয় জিন হবে।'

তার অপর দু'সঙ্গী বললো– 'আমরা যাবো। তুমি ভীত হয়ে পড়েছো।' তারা দু'জন একসঙ্গে এগিয়ে যায়। তিন-চার পা অগ্রসর হওয়ার পর তারাও প্রথমজনের ন্যায় পেছন দিকে চিৎ হয়ে পড়ে যায়। তারা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। জনতা ভয় পেয়ে যায়। সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, বুজুর্গ তার প্রহরায় জিন দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, যে কাউকে সম্মুখে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না।

তাঁবু থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে। মেয়েটি আশি। তার পরনে কালো রেশমী পোশাক। চিবুক ও মুখমণ্ডল হাল্কা নেকাবে আবৃত। চোখ দুটো খোলা। মাথাটা কালো কাপড়ে ঢাকা। মাথার রেশমকোমল চুলগুলো দু'কাঁধের উপর দিয়ে ভাগ হয়ে বুকের উপর এসে ঝুলছে। মেয়েটি আবৃতা বটে; কিন্তু পোশাকটা এমন যে, তাকে অর্ধনগ্ন বলেই মনে হচ্ছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ এমন রূপসী মেয়ে আর কখনো দেখেনি। মেয়েটিকে তারা পরী মনে করছে। তার চাল-চলন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি মায়াময়।

আশি আমর দরবেশের সম্মুখে এসে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। সেজদা থেকে উঠে নিজের একটি কান তার মুখের সঙ্গে লাগায়। আমর দরবেশের ঠোঁট নড়ে ওঠে। আশি উঠে দাঁড়িয়ে যায়।

'তোমরা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো'– আশি জনতাকে উদ্দেশ করে বললো– 'কেউ সামনে অগ্রসর হওয়ার দু:সাহস দেখাবেন না। খোদার দূত জিজ্ঞেস করেছেন, তোমরা এখানে কেনো এসেছো? তোমরা ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারো।'

যে তিন ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পড়ে গিয়েছিলো, তাদের একজন উচ্চ কণ্ঠে বললো– 'হে আল্লাহর দূত! তুমি কি অনাগত ভবিষ্যতের সংবাদ বলতে পারো?'

'জিজ্ঞেস করো কী জানতে চাও?– আমর দরবেশের গুরুগম্ভীর মুখে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন।

'সুদানের অনুগত না হয়ে কি আমরা এই ভূখণ্ডকে ইসলামী রাজ্যে পরিণত করতে পারবো?' লোকটি জিজ্ঞেস করে।

হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আমর দরবেশ। দু'হাত মাটিতে ছুঁড়ে মারেন। আশি ছুটে এসে তার কাছে বসে পড়ে এবং তার মুখের সঙ্গে কান লাগিয়ে রাখে। আমর দরবেশের ঠোঁট নড়ে ওঠে। আশি উঠে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে বললো– 'খোদার দূত বলেছেন, পানিতে যদি আগুন ধরে যায়, তাহলে তোমরা এই ভূখণ্ডকে ইসলামী রাজ্যে পরিণত করতে পারবে।' কারো কাছে পানি থাকলে এই কাপড়টির উপর ঢেলে দাও।'

আমর দরবেশের সামান্য দূরে একটি কাপড় এমনভাবে পড়ে আছে, যেনো কেউ দেহ থেকে খুলে দলা করে রেখে দিয়েছে। যে তিন ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলো, তাদের একজন এগিয়ে আসে। তার হাতে চামড়ার ছোট্ট একটি মশক। সে বললো– 'আমার কাছে পানি আছে। আমি সফরে আছি বিধায় সঙ্গে পানি রেখেছি।' এগিয়ে নিয়ে সে মশকটির মুখ খুলে কাপড়ের উপর পানি ঢেলে দেয়।

আশি মাটি থেকে প্রদীপটি আমর দরবেশের হাতে তুলে দেয়। আমর দরবেশ আকাশের দিকে মুখ করে ঠোঁট নাড়ান, যেনো তিনি কারো সঙ্গে কানে কানে কথা বলছেন। তারপর প্রদীপের শিখা কাপড়ের সঙ্গে লাগান। কারো কল্পনা ছিলো না, পানিভেজা কাপড়ে আগুন ধরে যাবে। কিন্তু তা-ই হলো। আমর দরবেশ যেইমাত্র প্রদীপের শিখা কাপড়ের নিকট নিয়ে যান, অমনি কাপড়টি জ্বলে উঠে এবং পুরো বস্ত্রটি একটি অগ্নিশিখায় পরিণত হয়। জনতার ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি বিস্মিত কণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলে। তারা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে, তাদের সম্মুখে পানি জ্বলছে।

'খোদার ইশারা বুঝে নাও'– আমর দরবেশ বললেন– 'আর ভালো ভাবে চিনে নাও আমি কে। আমি তোমাদেরই একজন।'

তিনি নিজ গ্রামের নাম উল্লেখ করে বললেন– 'আমি ঐ এলাকার বাসিন্দা। আমি হাশেম দরবেশের পুত্র আমর দরবেশ। আমি নবী-রাসূল

নই। খোদা তার শেষ নবীকে প্রেরণ করে ফেলেছেন।'

তিনি নিজের আঙ্গুলে চুমো খেয়ে চোখে লাগিয়ে বললেন- 'আমিও তোমাদেরই ন্যায় আখেরী নবীর একজন উম্মত। খোদা আমাকে আলো দেখিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন, যেনো এই আলোকে আমি সেই লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেই, যারা অন্ধকারে নিমজ্জিত।'

আমর দরবেশ এমন ভঙ্গীতে কথা বলছেন, যেনো তার উপর উন্মত্ততা চেপে আছে। তিনি বললেন-

'আমার গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, আমি সালাহউদ্দীন আইউবীর কমান্ডার। আমি সেই বাহিনীর সঙ্গে ছিলাম, যারা সুদান আক্রমণ করেছিলো। যাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে। আমরা সবাই অনুতপ্ত হলাম। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাকে মিশরী ফৌজের লাশের মধ্য থেকে তুলে এনেছেন এবং আমাকে ইঙ্গিত দিয়েছেন সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ কেনো পরাজিত হলো। আমার অনুতাপ আনন্দে রূপান্তরিত হলো। আমি একটি বৃক্ষের ডালে খোদার নূর দেখতে পেলাম। এমন এক আলো, যেনো একটি তারকা আকাশ থেকে নেমে এসে গাছের ডালে আটকে গেছে। সেই তারকার ভেতর থেকে আওয়াজ এলো- সামনে দেখো, পেছনে দেখো, ডানে দেখো, বামে দেখো...।

আমি সব দিক তাকালাম। আওয়াজ এলো- তুমি কি কোনো জীবিত মানুষ দেখতে পাচ্ছো? আমি চতুর্দিকে শুধু লাশ আর লাশ দেখতে পেলাম। সকলের শোচনীয় অবস্থা। আহতদের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ সৈনিক পিপাসায় মারা গেছে। এরা সকলে লড়াই করছিলো। তারকার আলোর মধ্য হতে আওয়াজ এলো- তুমি কি দেখোনি, তোমাদের তরবারী ভোতা হয়ে গিয়েছিলো? তুমি কি দেখোনি, তোমাদের তীরগুলোর কোনো গতিই ছিলো না? তুমি দেখোনি, তোমাদের ঘোড়াগুলোর পা মাটিতে বসে গিয়েছিলো?

তখন আমার মনে পড়লো, আলোর মধ্যকার আওয়াজ আমাকে যা যা বলেছে, আমি সবই দেখেছি। আমার তরবারী কর্তন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলো। আমি দেখেছি, আমার ছোড়া তীরটা বাতাসের মধ্যদিয়ে এমনভাবে যাচ্ছিলো, যেনো বাতাসের তোড়ে শুকনো খড় উড়ছে। আমার ঘোড়া গতি হারিয়ে ফেলেছিলো। বালুকাময় প্রান্তর যেনো সূর্যের সমস্ত উত্তাপ ধারণ করে আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ঝলসে দিয়েছিলো। আমি একটি ভস্মিত লাশে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর তারকার মধ্য হতে একটি স্ফুলিঙ্গ এসে আমার উভয় চোখে ঢুকে পড়ে। পরে সেটি আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে যায়। আওয়াজ এলো– আমি তোমাকে পুনর্জীবন দান করলাম। জিজ্ঞেস করো, আমি তোমাকে এই অনুগ্রহ কেনো করলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম। আওয়াজ উত্তর দিলো– আমি মুসলমানদের ভালোবাসি। মুসলমান আমার রাসূলের কালেমা পাঠ করে। এই লাশগুলো যাদের, আমি তাদেরকে শিক্ষার উপকরণে পরিণত করেছি যে, এরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলো। যারা এখনো পথ হারায়নি, বিপথগামী হওয়ার উপক্রম হয়েছে, আমি তাদেরকে সোজা পথ দেখাতে চাই। আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি। কেননা, তুমি প্রতি সকালে কুরআন পাঠ করে থাকো। যাও, আমি তোমাকে আলো দান করলাম। এই আলো আমার মুসলমান বান্দাদের দেখাও।

কথাগুলো আমি ভালোভাবে বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম– হে আমার প্রভুর আলো! বিষয়টা আমাকে খুলে বলুন এবং বলে দিন, আমার কথা কে গ্রহণ করবে? কিভাবে করবে? বলুন– আমাদের তরবারীগুলো কেনো ভোতা হয়ে গিয়েছিলো? তীরগুলোর গতি কোথায় উঠে গিয়েছিলো? আলোর আওয়াজ বললো– সেই তরবারী ভোতা হয়ে যায়, যার আঘাত নিজ মায়ের উপর করা হয়। সেই তীর খেজুরের শুকনো ডালের ন্যায় হয়ে যায়, যেটি আপন মায়ের বুকের ছোড়া হয়। তুমি জানো না, মা কে? মা হলো সেই ভূখণ্ড, যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে, যার মাটিতে খেলাধুলা করে তুমি যৌবন লাভ করেছো। তুমি সুদানের মুসলমানদেরও জানিয়ে দাও, সুদানের পবিত্র ভূখণ্ড তোমাদের মা। তাকে তোমরা ভালোবাসো। এরই মাটির ভেতর তোমাদের জান্নাত। বাইরে থেকে কোনো মুসলমান যদি এই জান্নাতকে জয় করতে আসে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তুমি তো জাহান্নাম দেখে নিয়েছো। যাও, তোমার কালেমাগো সুদানী ভাইদের বলো, তোমাদের মা, তোমাদের জান্নাত, তোমাদের কাবা হলো সুদান।'

'হযরত'– এক ব্যক্তি বললো– 'তাহলে কি আপনি বলছেন, আমরা সুদানের রাজার অনুগত হয়ে যাবো, যিনি আমাদের রাসূলকে মান্য করেন না?'

এই লোকটিও সেই তিন ব্যক্তির একজন, যারা সম্মুখে অগ্রসর হতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলো।

'খোদার আওয়াজ বলেছেন, সুদানের এই কাফির বাদশাহ মুসলমান হয়ে যাবেন'– আমর দরবেশ পরম গাম্ভীর্যের সাথে বললেন– 'তিনি মুসলমানদের

পথপানে চেয়ে আছেন। তার ফৌজ কাফিরদের ফৌজ। সে কারণে তিনি আল্লাহ ও রাসূলের নাম উচ্চারণ করেন না। তোমরা চলে যাও। তরবারী, বর্শা ও তীর-ধনুক নিয়ে যাও। উট-ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে যাও। তাকে গিয়ে বলো, আমরা আপনার মোহাফেজ। আমরা সুদানের সন্তান।'

'আমি খোদাকে বললাম, আমি বললে এসব কথা কেউ গ্রহণ করবে না। আমার মুসলমান ভাইয়েরা আমাকে হত্যা করে ফেলবে। উত্তরে খোদার আওয়াজ বললো– 'আমি ব্যতীত আর কে পানিতে আগুন লাগাতে পারে? তুমি যাও, আমি তোমাকে এই শক্তি দিয়ে দিলাম, যাতে মানুষ তোমাকে বিশ্বাস করতে পারে, তোমার কণ্ঠকে আমার কণ্ঠ মনে করে। কোনো মানুষ তো আর পানিতে আগুন ধরাতে পারে না। তারপর আলোর মধ্য হতে আওয়াজ আসলো– তারপরও যদি মানুষ তোমাকে মিথ্যা মনে করে, তাহলে তুমি তাদেরকে রাতে আসতে বলো। আমি তাদেরকে সেই জালওয়া দেখিয়ে দেবো, যা মূসাকে তূর পর্বতে দেখিয়েছিলাম।''

'আচ্ছা তোমরা কি তূর পর্বতের জ্যোতি দেখে সত্যের আওয়াজকে মেনে নেবে?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ, হে খোদার দূত!'– সেই তিন ব্যক্তির একজন বললো– 'আপনি যদি আমাদেরকে তূর পর্বতের জ্যোতি দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার কণ্ঠকে খোদার কণ্ঠ বলে মেনে নেবো।'

'যাও'– আমর দরবেশ ক্ষোভের সাথে মাটিতে হাত ছুঁড়ে বললেন– 'চলে যাও। যখন সূর্যের কিরণমালা পাহাড়ের পেছনে চলে যাবে এবং আকাশে তারকারাজির প্রদীপমালা জ্বলে উঠবে, তখন আবার আসবে।'

জনতা আমর দরবেশের আস্তানা ত্যাগ করে ফিরে যায়। তাদের অন্তরে কোনো সন্দেহ নেই। তারা চার-পাঁচজন করে দল বেঁধে হাঁটছে আর মন্তব্য-মূল্যায়ন করছে। মানবীয় ফিতরাতের দুর্বলতাগুলো ভেসে ওঠেছে। বিশ্বাস চাপা পড়ে গেছে। জযবা শীতল হয়ে গেছে। সহজ-সরল পশ্চাৎপদ মানুষ এরা। একটি স্পর্শকাতর নাটক তাদের বিবেকের গতি ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমর দরবেশের কণ্ঠ ও বাচনভঙ্গী তাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে অপর কেউ না কেউ বলছে– 'তুমি কি পানিতে আগুন ধরাতে পারো?'

এখনো রাতে তূর পর্বতের জ্যোতি দেখার কাজ বাকি আছে। এরা আশিকে জিন মনে করছে। স্পষ্ট ভাষায় তা ব্যক্তও করছে।

এরা সেইসব মুসলমান, যারা সুদানের অমুসলিম বাদশাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছিলো। তারা সুদানী বাহিনীকে এই পার্বত্য অঞ্চলে পরাস্ত করে পিছু হটিয়ে দিয়েছিলো। তারা ছিলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভক্ত-সমর্থক। সুদানী নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের পার্বত্য অঞ্চলকে স্বাধীন ইসলামী রাজ্য মনে করতো। কিন্তু আমর দরবেশের স্পর্শকাতর ও জাদুময় বক্তব্য তাদের সব চিন্তাধারা পাল্টে দিলো। তারা বিপথগামী হয়ে উঠলো। একটি দেশের সেনাবাহিনী যাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো, একজন মানুষের একটি চিত্তাকর্ষী আক্রমণে তাদের সব অস্ত্র হাত থেকে পড়ে গেলো। এখন এরা যে যেখানে যাকে পাচ্ছে, গুজব ছড়াচ্ছে। তারা যা দেখলো, যা শুনলো, তাকে আরো আকর্ষণীয় করে প্রচার করতে লাগলো।

'একটি আশংকা আমাকে অস্থির করে রেখেছে যে, সুদানী মুসলমানরা স্পর্শকাতর, কুসংস্কারের সামনে অস্ত্র ত্যাগ করে বসবে।' সুলতান আইউবী বললেন।

সুলতান এখন সুদান থেকে দূরে– বহু দূরে ফিলিস্তিনের দোরগোড়ায় একটি পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী ও সালারদের মাঝে বসে আছেন। তিনি আল-আদিল-এর পত্রখানা পাঠ করছেন। মিশরের ইন্টেলিজেন্স সুদানী মুসলমানদের সম্পর্কে পুরো তথ্য মিশরের ভারপ্রাপ্ত গবর্নর আল-আদিলকে অবহিত করে। আল-আদিল পত্রে সেসব তথ্য সুলতান আইউবীর নিকট লিখে পাঠিয়েছেন। পত্রে তিনি এ-ও লিখেছেন যে, আলী বিন সুফিয়ান বণিকের বেশে সুদান রওনা হয়ে গেছেন। পত্রে আল-আদিল জানতে চেয়েছেন, সুদানের মুসলমানদের পাহাড়ী এলাকায় কমান্ডো দল পাঠাবেন কিনা। তিনি এই আশংকাও ব্যক্ত করেছেন যে, আমরা যদিও বা গোপনে কমান্ডো দল প্রেরণ করি, তবু সুদান সরকার যদি জানতে পারে, তাহলে অভিযানটা প্রকাশ্য যুদ্ধের রূপ নিতে পারে। অথচ এখন আমাদের অধিকাংশ ফৌজ আরবে যুদ্ধরত। বার্তায় উল্লেখ করা হয়, সুদানী সরকার মুসলমানদেরকে তাদের অনুগত বানানোর লক্ষ্যে আমাদের যুদ্ধবন্দীদের ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।

সুলতান আইউবী তাঁর সালার ও উপদেষ্টামণ্ডলীকে পত্রখানা পাঠ করে শুনিয়ে বললেন– 'সুদানের এই মুসলমানগুলো সুদান সেনাবাহিনীর জন্য সাক্ষাৎ যম। তোমরা দেখে থাকবে, তাদের যে ক'জন লোক আমাদের

বাহিনীতে আছে, তারা কিরূপ জযবা ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু দুশমন যখন তাদেরকে তেলেসমাতি ভাষায় উস্কে দেয় এবং মস্তিষ্ককে কল্পনা বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট করে, তখন তারা বালির মূর্তিতে পরিণত হয়ে যায়। আল-আদিল একথা লিখেনি যে, খৃস্টানরা সুদানের মুসলিম অঞ্চলে চরিত্র ধ্বংস এবং নাশকতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। কিন্তু তোমরা তো খৃস্টানদেরকে জানো। তারা এই বিদ্যায় পারদর্শী। আমি জানি, সুদানীদের নিকট খৃস্টান উপদেষ্টা রয়েছে। তারা মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ধ্বংসে তৎপরতা চালাবে, তাতে সন্দেহ নেই।'

সুলতান আইউবী আল-আদিলের দূতকে আহার ও বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দেন এবং কাতেবকে ডেকে পত্রের জবাব লেখাতে শুরু করেন–

'প্রিয় ভাই আল-আদিল!

আল্লাহ তাআলা তোমাকে সাহায্য করুন। তোমার পত্র আমার নিকট সুদানের মুসলমানদের বাস্তব চিত্র স্পষ্ট করে দিয়েছে। তুমি বিচলিত হয়ো না। তুমি তো জানো, কাফিররা ইসলামের ধ্বংস কামনা করে। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা কোনো সুযোগই হাতছাড়া করছে না। আলী বিন সুফিয়ানের সুদান গমনকে আমি স্বাগত জানাই। তুমি তাকে অনুমতি দিয়ে ভালোই করেছো। আল্লাহ আলী বিন সুফিয়ানকে সাহায্য করুন। লোকটা অত্যন্ত সতর্ক ও যোগ্য গোয়েন্দা। পাথরে ভেতর থেকেও কথা বের করতে জানে। সে ফিরে এসে তোমাকে জানাবে, সেখানকার আসল পরিস্থিতিটা কী! তুমি তার দেয়া তথ্য মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।'

'তুমি জানতে চেয়েছো, সুদানের মুসলমানদের সাহায্যে কমান্ডো প্রেরণ করবে কিনা? এই আশংকাও ব্যক্ত করেছো, কমান্ডো প্রেরণ করলে সুদানীরা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যা প্রকাশ্য যুদ্ধের রূপ নিতে পারে। তুমি ভালোই করেছো যে, আমার অনুমতি নেয়া আবশ্যক মনে করেছো। কিন্তু সাবধান! কখনো যদি পরিস্থিতি গুরুতর রূপ ধারণ করে, তাহলে আমার অনুমতির অপেক্ষায় সময় নষ্ট করবে না। তুমি নিশ্চয়ই জেনেছো, সুদানের কয়েদখানার একজন সিপাহী সুদানী ফৌজের একজন কমান্ডারকে হত্যা করে মুসলমানদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তুমি এ-ও জানো যে, সুদানীরা আমাদের কয়েদীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং আমাদের ইসহাক নামক এক কমান্ডারের স্ত্রী ও কন্যাকে পর্যন্ত প্রতারণার মাধ্যমে অপহরণ করার চেষ্টা করেছে।

এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, সুদানী মুসলমানদের মাঝে কিছু গাদ্দারও আছে। এমতাবস্থায় তুমি যত দ্রুত সম্ভব কিছু কমান্ডো সেনাকে ব্যবসায়ী ও পর্যটকের বেশে সুদানী সীমান্তে পাঠিয়ে দাও।

আমার প্রিয় ভাই! এটা সত্য যে, আমাদের সেনাসংখ্যা কম এবং আমরা আরেকটি রণাঙ্গন চালু করতে অক্ষম। কিন্তু আমরা কুরআনের সেই নির্দেশনা কিভাবে উপেক্ষা করতে পারি যে, পৃথিবীর কোনো একটি ভূখণ্ডে যদি কাফেররা মুসলমানদের উপর জুলুম করে কিংবা প্রলোভন বা প্রতারণার মাধ্যমে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, তাদের জাতীয় মর্যাদা ও দ্বীন-ঈমানকে সংকটাপন্ন করে তোলে; তাহলে পৃথিবীর সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়? আমি বহুবার বলেছি, সালতানাতে ইসলামিয়ার কোনো সরহদ-সীমানা নেই। ইসলামের সুরক্ষার জন্য আমরা যে কোনো দেশের সীমানা অতিক্রম করতে পারি। তুমি জানো, আমরা সুদানী মুসলমানদেরকে কমান্ডো দিয়ে রেখেছি, যারা কৃষকের বেশে তাদের সঙ্গে অবস্থান করছে। সুদানী মুসলমানদেরকে আমরা সামরিক সরঞ্জামও দিয়েছি। তুমি যদি প্রয়োজন মনে করো, তাহলে আদেরকে আরো সাহায্য দাও।'

সুদানীরা যদি তাদের সীমান্ত নিরাপদ করার জন্য মিশরে সেনা অভিযান চালায়, তাহলে ভয় পেয়ো না। তোমরা স্বল্পসংখ্যক ফৌজ দ্বারা কয়েকগুণ বেশি ফৌজের মোকাবেলা করতে পারবে। তোমরা তাদের এক আক্রমণ নস্যাৎ করেছো, দ্বিতীয়টিও নস্যাৎ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তবে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঝুঁকি নেবে না। দুশমনকে এমন জায়গায় ঠেলে নিয়ে আসবে, যেখানে তোমরা অল্পসংখ্যক লোকে অধিক ধ্বংসসাধন করতে পারবে। কমান্ডোদের বেশি ব্যবহার করবে এবং দুশমনের রসদ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে। তোমাদের অর্ধেক যুদ্ধ আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দারা জয় করে ফেলবে। তবে আমার মনে আশা জাগছে না, সুদানীরা আক্রমণ করার মতো বোকামী করবে। তাদের খৃস্টান উপদেষ্টারা যদি জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকে, তাহলে তারা আক্রমণের পরিবর্তে তাদের পাহাড়ী এলাকায় মুসলমানদেরকে দলে ভোড়াবারই চেষ্টা করবে। মুসলমানরা যদি তাদের অফাদার হয়ে যায় এবং তাদের ফৌজে শামিল হয়ে যায়, তাহলে তারা যে কোনো ঝুঁকি মাথায় নিতে পারবে। তাই তোমাকে চেষ্টা করতে হবে, যেনো মুসলমানরা তাদের বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত না

হয়। আমি শতবার যে কথাটা বলেছি, এখনও তারই পুনারাবৃত্তি করবো। মুসলমান যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করে— পরাজিত হয় না। কিন্তু যখন তাদের মধ্যে পাশবিকতা জাগিয়ে দেয়া হয়, তখন তারা তরবারী ছুঁড়ে ফেলে। মুসলিম জাতির যখনই পতন এসেছে, এ কারণেই এসেছে। আমাদের শত্রুরা আমাদের জাতির মাঝে এই আগুনই প্রজ্বলিত করছে। এইভাবে আমরা এক সঙ্গে দু'টি রণাঙ্গনে লড়াই করছি। একটি মাটির উপরে, অপরটি নীচে। আমাদের শত্রুরা আমাদেরকে বিষমাখা তীর দ্বারা হত্যা করতে পারেনি। এখন তারা মিষ্টিমধুর ভাষার জাদুতে আমাদেরকে অকর্মন্য ও পঙ্গু করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এটি বড়ই ভয়াবহ যুদ্ধ। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এখানকার পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে। দুশমনরা পরাজিত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। আমি তাদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগই দেবো না। আল্লাহর সাহায্য অব্যাহত থাকলে আমি হাল্‌ব দখল করে ফেলবো। মোকাবেলা সম্ভবত এখনো কঠিন হবে। কিন্তু আমি ব্যবস্থা করে রেখেছি। খৃস্টানরা এখনো মুখোমুখি আসেনি। বোধ হয় আসবেও না। তারা ভাইয়ে-ভাইয়ে সংঘাতে লিপ্ত করে তামাশা দেখছে। তাদের শত্রুরা যদি আপসে লড়াই করেই যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের সামনে আসবার প্রয়োজন কী। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করুন। তুমি ভীত হয়ো না। আল্লাহ হাফেজ।'

আমর দরবেশের আস্তানায় যে তিন ব্যক্তি জনতার ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে গিয়ে চিৎ হয়ে পেছন দিকে পড়ে গিয়েছিলো, তারা এখন আমর দরবেশের তাঁবুতে উপবিষ্ট। জনতা চলে যাওয়ার সময় তারা কিছুদূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গিয়ে মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে এক একজন করে আস্তানায় ফিরে এসে আমর দরবেশের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। এরা আমরের দলেরই লোক এবং অত্র এলাকার বাসিন্দা। সুদানী সরকারের নিকট থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করছে।

'আমার ধারণা ছিলো, কাপড় জ্বলবে না'— আমর দরবেশ বলছেন— 'কাপড়টার নীচে দাহ্য পদার্থ কম রাখা হয়েছিলো এবং পানি বেশি ঢালা হয়েছিলো।'

'আপনি জানেন না, এই তেল যদি পানিতেও ঢেলে দেয়া হয়, তাতেও আগুন ধরে যায়'— যে লোকটি কাপড়ের উপর মশক থেকে পানি ঢেলে

দিয়েছিলো, সে বললো– 'আমরা আগেই পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'মানুষের উপর এর কিরূপ প্রভাব পড়লো?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করেন।

'আমরা কিছুদূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গিয়েছিলাম'– একজন জবাব দেয়– 'তারা পানিতে আগুন ধরে যাওয়াকে আপনার মোজেযা মনে করে। তারা কেউই বিশ্বাস করছে না, দুনিয়ার কোনো মানুষ পানিতে আগুন প্রজ্বলিত করতে পারে। আপনি যে ভঙ্গিতে কথা বলেছেন, তাতে আপনার সব কথা তাদের হৃদয়ে গেঁথে গেছে, খোদার কসম।'

'না দোস্ত'– আমর দরবেশ তাকে বাঁধা দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– 'খোদার নামে কসম করো না। আমরা যে খোদার বিরুদ্ধাচরণে নেমেছি, তার কসম খাওয়ার অধিকার হারিয়ে ফেলেছি।'

'মনে হচ্ছে, আপনার অন্তরে এখনো আসল খোদা বিদ্যমান'– একজন বললো– 'আমর দরবেশ! আপনি কিন্তু আপনার আসল খোদা ও ঈমানকে বিক্রি করে এসেছেন।'

অপর একজন পার্শ্বে উপবিষ্ট আশির উরুতে হাত বুলিয়ে বললো– 'আর এই মূল্যবান সম্পদটা কিভাবে পেয়েছেন, তাও স্মরণ করুন। মেয়েটি খৃস্টান রাজাদের মানিক্য, যাকে সুদানের শাসকমণ্ডলী আপনাকে দান করেছেন।'

আমর দরবেশ আশির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আশি তাঁর প্রতি একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। তাকে বিচলিত মনে হলো আমর দরবেশের কাছে। আমর দরবেশ তার ইঙ্গিত বুঝে ফেললেন। বললেন– 'নতুন বিদ্যা কিনা; তাই ভুলে গেছি। আসলেই আমি এতো মূল্যবান সম্পদের উপযুক্ত ছিলাম না। যাক গে এসব। আগামী রাতের কথা বলো।'

'সব প্রস্তুতি সম্পন্ন'– এক ব্যক্তি বললো– 'আপনি তো আমাদের যোগ্যতা দেখেছেন। দেখলেন না, আমরা কীভাবে পেছন দিকে পড়ে গেলাম?

'রাতে আপনি তূর পর্বতের জালওয়া দেখাবেন'– অন্য একজন বললো– 'কী করতে হবে, বুঝে নিন। আমাদের লোকজন সব প্রস্তুত।'

'আমাদের চলে যাওয়া উচিত'– তৃতীয় ব্যক্তি বললো– 'এখন আর আপনি তাঁবু থেকে বের হবেন না।'

তারা চলে যায়।

সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন আসতে শুরু করে। দিনের বেলা যেসব লোক আমর দরবেশের বক্তব্য শুনে গেছে এবং পানিতে আগুন

লাগানোর মোজেযা দেখেছে, তারা সর্বত্র প্রচার করে দিয়েছে যে, আমর দরবেশ নামক খোদার এক দূত আজ রাতে তূর পর্বতের সেই জালওয়া দেখাবেন, যা আল্লাহ হযরত মূসাকে (আ.) দেখিয়েছিলেন। আমর দরবেশের আস্তানায় সুদানের গোয়েন্দারাও উপস্থিত। তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও গুরুত্বের সাথে গুজব ছড়ানোর দায়িত্ব পালন করেছে। তারই ফলে সন্ধ্যার পর আমর দরবেশের তাঁবুর সম্মুখে জনতার ভিড় দিনের তুলনায় বেশি। তাঁবুর পেছনে ও ডানে-বাঁয়ে কারো দাঁড়াবার অনুমতি নেই।

আমর দরবেশ এখনো তাঁবুতে অবস্থান করছেন। বাইরে দু'টি প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপগুলো মাটিতে গেড়ে রাখা লাঠির মাথায় বাঁধা। জনতা 'খোদার দূত'কে দেখার জন্য উদগ্রীব।

তাঁবুর পর্দা নড়ে ওঠে। আশি সম্মুখে এগিয়ে আসে। তার পোশাক কালো। কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত লম্বিত ফ্রক। ফ্রকটি অভ্রখচিত যা প্রদীপের আলোতে তারকার ন্যায় মিট মিট করে জ্বলছে। আশির মাথার উপর রেশমের পাতলা রুমাল। মাথার চুলগুলোও সেই রেশমের ন্যায় সরু ও কোমল, যেগুলো তার উভয় স্কন্ধের উপর এমনভাবে পড়ে আছে যে, তার মাঝে তার উদোম স্কন্ধের শুভ্রতা তারার ন্যায় জ্বল জ্বল করছে। মেয়েটি এমনিতেই রূপসী, তদুপরি তার এই সাজ-সজ্জা, রং-ঢং তাকে এমন মোহময় করে তুলেছে যে, একজন পুরুষের পশুবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ হারাতে বাধ্য।

পাহাড়-জঙ্গলে বসবাসকারী এই লোকগুলোর নিকট এই মেয়েটি, তার চাল-চলন ও পোশাক একটি বিরল দৃশ্য। তাদের চক্ষু আটকে গেছে। মেয়েটির রূপের জাদুক্রিয়ায় তারা মোহাচ্ছন্ন।

আশির হাতে এক-দেড় গজ লম্বা এবং আধা গজের মতো চওড়া গালিচা। সেটি সে উভয় প্রদীপের মধ্যখানে বিছিয়ে দেয়। মেয়েটি উভয় বাহু বিস্তার করে আকাশের দিকে তাকায়। তাঁবুর পর্দা সরে যায় এবং আমর দরবেশ মাদকাসক্তের ন্যায় হেলে-দুলে হেঁটে এসে গালিচার উপর দাঁড়ায়। তিনিও আশির ন্যায় ডানে-বায়ে বাহু ছড়িয়ে দিয়ে আকাশপানে দৃষ্টিপাত করে বিড় বিড় করতে শুরু করে।

'হে খোদার প্রিয়পাত্র, যাকে শ্রদ্ধা করা আমাদের সকলের উপর ফরয, আমরা আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি'– সেই তিন ব্যক্তির একজন বললো– 'আপনার দিনের বক্তব্য আমাদের হৃদয়ে গেঁথে গেছে। এবার আমাদেরকে তূর পর্বতের জ্যোতি দেখান, আপনি যার ওয়াদা দিয়েছিলেন।'

'মিশর ফেরাউনদের রাষ্ট্র'– আমর দরবেশ উচ্চস্বরে বললেন– 'ফেরাউন মারা গেছে। কিন্তু খোদা মিশরের রাজত্ব যাকেই দান করেছেন, সে-ই ফেরাউন হয়ে গেছে। এটা মিশরের মাটি, পানি ও বাতাসের ক্রিয়া। যে ব্যক্তি এক সময় রাসূলের বন্দনা করতো, ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়ায় সেও ফেরাউন হয়ে গেছে। হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের মোকাবেলা করেছেন এবং নীল নদের রাস্তা তৈরি করে দেখিয়েছেন। বর্তমানে মিশর পুনরায় ফেরাউনের দখলে চলে গেছে। সেখানে এখন মদের নদী প্রবাহিত হচ্ছে এবং পর্দানশীল, সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। তোমরা মিশরকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করো। মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তূর পর্বতের জ্যোতি দর্শন লাভের সৌভাগ্য দান করেছেন।'

আমর দরবেশ দু'বাহু সম্প্রসারণ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে জ্বালাময়ী কণ্ঠে বললেন– 'হে আল্লাহ! তুমি তোমার পথহারা বান্দাদের সেই নূর দেখাও, যে নূর তুমি মূসাকে দেখিয়েছিলে।'

হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে আমর দরবেশ হাতের আঘাতে একটি প্রদীপ মাটিতে ফেলে দেন। অন্ধকার রাত। ঘোর অন্ধকারে পাহাড়-টিলা-বৃক্ষরাজি কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আলো বলতে আছে শুধু সেই প্রদীপ দু'টির কিরণমালা, যাতে শুধু আমর দরবেশ আর আশিকে দেখা যাচ্ছে। আমর দরবেশ প্রদীপটি উপরে তুলে ধরে একদিকে ইশারা করে বললেন– 'ঐদিকে দেখ। ওদিকে একটি পাহাড় আছে। তোমরা পাহাড়টাকে দেখতে পাচ্ছো না। তার জ্যোতি দেখ।'

আমর প্রদীপটা আরো উর্ধ্বে তুলে ডানে-বাঁয়ে নাড়ান। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের পাহাড় থেকে একটি শিখা ভেসে ওঠে এবং অল্প পরেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। জনতা সেই যে বিস্ময়ে হা করে তাকিয়ে ছিলো, এখনো হা করেই আছে। বিস্ময় তাদের বাক্‌শক্তি কেড়ে নিয়ে গেছে।

'তোমরা যদি খোদার এই জ্যোতিকে হৃদয়ে প্রোথিত করে না নাও, তাহলে এই শিখা তোমাদের এই সবুজ-শ্যামল ভূখণ্ডকে মরুভূমিতে পরিণত করে দেবেন'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমি তাকে প্রতিহত করতে পারবো না। সেই জ্যোতিকে তোমরাই তো ডেকে এনেছো।'

আমর দরবেশ তাঁর তাঁবুতে চলে যান। আশি জনতাকে ইঙ্গিত করে, তোমরা চলে যাও। জনতা স্থান ত্যাগ করে ফিরে যেতে শুরু করে। এখন

তারা পরস্পর কথা বলতেও ভয় পাচ্ছে। এখন আর তাদের অন্তরে কোন শোবা-সন্দেহ নেই।

তারা যখন তাঁবু থেকে বেশ দূরে চলে যায়, তখন তাদের মধ্যে থেকে এক যুবক দ্রুত হেঁটে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে সকলের প্রতি মুখ করে দাঁড়িয়ে যায়। যুবক পার্শ্ববর্তী এক গ্রামের মসজিদের ইমাম।

'একটু দাঁড়ান'– ইমাম হাত দুটো উঁচু করে বললেন– 'আপনারা আপনাদের ঈমানকে সংযত রাখুন। দরবেশ আপনাদের যা দেখিয়েছে, সবই ভেল্কি। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর না আর কোনো নবী এসেছেন, না আসবেন। আল্লাহ সেই পাপিষ্ঠকে তার জ্যোতি দেখান না, যে একটি বেহায়া মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'এটি মেয়ে নয়– জিন।' এক ব্যক্তি বললো।

'জিন মানুষের আকৃতিতে আসতে পারে না'– ইমাম বললেন– 'জিন মানুষের আনুগত্য করে না। মুসলমানগণ! আপনারা আপনাদের বিশ্বাসকে হেফাজত করুন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ফেরাউন নন। তিনি আল্লাহর সাচ্চা বান্দা। তিনি নবী হওয়ার দাবি করেননি। তিনি ধর্মের প্রহরী এবং খৃস্টানদের দুশমন।'

'সম্মানিত ইমাম!'– এক ব্যক্তি বললো– 'আপনি কি পানিতে আগুন লাগাতে পারবেন?'

'আরে বাদ দাও ওর কথা'– অপর একজন বললো– 'ইমামতি ঠিক রাখার জন্য এসব বলছে।'

'আমরা যা যা দেখেছি, পারলে আপনি সেসব দেখান'– আরেকজন বললো– 'তবেই আমরা আপনার কথা মেনে নেবো।'

'আপনারা আমার সঙ্গে সেই পাহাড়ে চলুন, যেখান থেকে শিখাটা জ্বলে উঠেছিলো'– ইমাম বললেন– 'আমি আপনাদের প্রমাণ করে দেবো, এসবই ভেল্কিবাজি। আপনারা চলুন। যদি আমার দাবি ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে আমাকে সেখানেই খুন করে ফেলুন।'

'আমরা খোদার কাজে হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস দেখাবো না।' এক ব্যক্তি বললো।

দু'-তিনজন লোক এক সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। তারাও ইমামের মতের বিপক্ষে। তারা জনতাকে এমনভাবে উত্তেজিত করে তোলে যে, সব মানুষ হাঁটতে শুরু করে এবং ইমামকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ইমাম একাকী দাঁড়িয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে যুবক ইমাম সেই পাহাড়টির দিকে হাঁটা দেন, যার উপর শিখা জ্বলে ওঠেছিলো। খুব দ্রুতপদে হাঁটছেন তিনি। একটি পাথুরে বিরান ভূমি অতিক্রম করে পাহাড়ের পাদদেশে পৌছলে তিনি টের পেলেন, দু'জন লোক তার থেকে খানিক দূরে তার পেছন দিয়ে একদিকে চলে গেলো। ইমাম পাহাড়ের কোল ঘেঁষে হাঁটছেন। পেছন দিয়ে চলে যাওয়া ব্যক্তিদ্বয় চলার গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। তাদের পায়ের শব্দ শুনে ইমাম দাঁড়িয়ে যান। লোক দু'জন আকস্মাৎ তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের মুখমন্ডল কাপড়ে আবৃত। ইমাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা কারা?' তারা কোন জবাব দেয় না। একজন ইমামের পেছনে চলে যায়। ইমাম তার দিকে মোড় ঘুরে দাঁড়ালে অপরজন ইমামকে ঝাপটে ধরে। ইমাম কোমরবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জরধারী হাতটা অপর ব্যক্তির মুঠোয় চলে যায়। গলায় ঝাপটে ধরার কারণে ইমামের শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

ইমাম আক্রমণকারীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার শেষ চেষ্টা চালান। শরীরের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেন। সম্মুখের ব্যক্তি ইমামের লাথি খেয়ে পেছনে গিয়ে ছিটকে পড়ে এবং ইমামের গলায় তার বাহুর বন্ধন শ্লথ হয়ে আসে। ইমাম আরেকটি ঝটকা মেরে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যান। এবার তিনি রক্তক্ষয়ী লড়াই করার প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। কিন্তু ইতিমধ্যে আক্রমণকারী দু'জন পালিয়ে গেছে। ইমাম তাদেরকে হাঁক দেন। কিন্তু তারা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। ইমাম আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করলেন না এবং সেখান থেকেই ফিরে আসেন।

আমর দরবেশের তাঁবুতে সেই তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট, যারা দিনের বেলায়ও এসেছিলো। তারা আমর দরবেশকে বললো– 'আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। আমরা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলাম, মানুষ সেই প্রতিক্রিয়া নিয়েই ফিরে গেছে।' তারা আমর দরবেশকে এ-ও বললো যে, আগামী রাত আপনাকে সম্মুখে অপর একটি গ্রামের নিকটে যেতে হবে এবং অন্য এক পাহাড়ের উপর তূর পর্বতের জালওয়া দেখাতে হবে।

লোক তিনজন চলে গেছে। এখন তাঁবুতে আছে আশি আর আমর দরবেশ।

'আপনি কি আপনার সাফল্যে আনন্দিত?' আশি জিজ্ঞেস করে।

'আশি!' আমর দরবেশ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আমি তোমাকে এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয় পাচ্ছি।'

'আচ্ছা, আপনি কী চাচ্ছেন? আমি খৃস্টান ও সুদানীদের হাতে খেলনা হয়েই থাকবো?' আশি বললো– 'আপনি আমার অভ্যন্তরে ঈমান জাগ্রত করে দিয়েছেন। আর এখন কিনা আমাকে বিশ্বাস করছেন না।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো তোমার কাজের উপর ভিত্তি করে'– আমর দরবেশ বললেন– 'তোমার কথার উপর ভিত্তি করে নয়।'

'বলুন, আমি কী করবো?' আশি জিজ্ঞাসা করে– 'আপনি যা বলবেন, তা-ই করবো।'

'এখনো সে কাজই করতে থাকো, যা করছো'– আমর দরবেশ বললেন– 'সময় এলেই বলবো তোমাকে কী করতে হবে।'

'হতে পারে সে সময়টা আপনি পাবেন না'– আশি বললো– 'আপনি তো দেখেছেন, আপনার চারপাশে কিভাবে গোয়েন্দার জাল ছড়িয়ে আছে। যখনই আপনার থেকে সামান্যতম সন্দেহজনক আচরণ প্রকাশ পাবে, তখন এই গোয়েন্দারা আপনাকে গুম কিংবা খুন করে ফেলবে। আর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আপনি যদি আগেই বলে রাখেন আপনার উদ্দেশ্যে কী, তাহলে আমি যথাসময়ে সাবধান হতে পারবো। তারা তো আমাকে সন্দেহাতীতরূপে তাদেরই দলের সদস্য মনে করে।'

আশি এমন সহজ-সরল ও নিষ্ঠাপূর্ণ কথাটা বললো যে, আমর দরবেশ নিশ্চিত হয়ে গেলেন মেয়েটি তাকে ধোঁকা দেবে না। তিনি বললেন– 'তোমার যোগ্যতা দেখলে মনে হয়, তুমি আমাকে ধোঁকা দেবে।'

'দক্ষতায় আপনিও কম নন'– আশি বললো– 'তাই তো আমার মনে হচ্ছে, আপনি নিজ জাতিকে ধোঁকা দেয়ার পাক্কা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।'

'আচ্ছা শোন, আমি তোমাকে আমার পরিকল্পনা বলে দিচ্ছি'– আমর দরবেশ বললেন– 'আর এ কথাও বলে রাখছি, তুমি যদি তোমার প্রতিশ্রুতি পূরণ না করো এবং আমার সঙ্গে প্রতারণা করো, তাহলে তুমি জীবিত থাকতে পারবে না। আমি খুন হওয়াকে যেমন ভয় করি না, তেমনি খুন করাকেও না। আসার পথে তোমাকে বলেছিলাম, আমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আমার আশা ছিলো, এখানে নিজ এলাকায় এসে নিজের গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহজে কামিয়াব হবো। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, সুদানীরা আমাকে গুপ্তচরদের বেঈমানীতে আবদ্ধ করে রেখেছে। আমার আরেকটি উৎকণ্ঠা হলো, আমি আমার জাতির পিঠে খঞ্জর বিদ্ধ করে ফেলেছি। মূল লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে আমি নিজেকে গোপন রাখছি বটে;

কিন্তু আমার যে কর্মকাণ্ডকে তুমি আমার দক্ষতা বলছো, তা আমার জাতির ধর্মীয় বোধ-বিশ্বাসকে বিষের ন্যায় খুন করে ফেলছে। আমি যদি আমার এই মিশন অব্যাহত রাখি, তাহলে তা সুদানী মুসলমানদেরকে আজীবনের জন্য গোলামীর শিকলে আবদ্ধ করে ফেলবে এবং তাদের জাতীয় মর্যাদা চিরদিনের জন্য নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'তুমি কী করতে চাও?' আশি জিজ্ঞেস করে।

'আমি ইসহাকের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতে চাই'– আমর দরবেশ বললেন– 'ইসহাককে চেনো তো! সেই কমান্ডার, যে যুদ্ধবন্দী হিসেবে কয়েদখানায় পড়ে আছে। তাকে ঘায়েল করার জন্য তোমাকেও এক রাতের জন্য তার নিকট প্রেরণ করা হয়েছিলো।'

'উহ! ঐ লোকটাকে আমি জীবনেও ভুলবো না'– আশি বললো– 'আমি তারও ততোটুকু ভক্ত, যতটুকু ভক্ত তোমার।'

'আমি তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে চাই'– আমর দরবেশ বললেন– 'তারপর নিজ গ্রামে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। আমি ভেবে এসেছিলাম, এখানে এসে অদৃশ্য হয়ে যাবো এবং এখানকার লোকদেরকে বলবো, তারা যেন সুদানীদের ক্রীড়নকে পরিণত না হয়।'

'আমি কয়েদখানায় নির্মম নির্যাতনের পর বের হয়েছি'– আমর দরবেশ বললেন– 'জ্ঞান বলতে এতোটুকুই ছিলো যে, কয়েদখানা থেকে বের হওয়ার এই পন্থাটা ভাবতে পেরেছি। কিন্তু এখানে এসে এখন মনে হচ্ছে, সফল হওয়া সম্ভব নয়।'

'আপনি আমাকেও ভাবতে দিন'– আশি বললো– 'আমরা যদি আল্লাহর পথে দৃঢ়পদ থাকি, তাহলে উদ্দেশ্য সফল হবে। আগামী দিন আমরা সম্মুখে যাবো। পন্থা একটা বেরিয়ে আসবে। আপাতত এখানকার কোন একজন বিজ্ঞ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন।'

এ অঞ্চলেই আমর দরবেশের তাঁবু থেকে দু'-আড়াই মাইল দূরে মিশরী ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলা এসে অবস্থান নিয়েছে। কাফেলায় চারজন পুরুষ এবং ছয়টি উট। দলনেতা লম্বা শশ্রুমণ্ডিত বুযুর্গ ধরনের ব্যক্তি। তার একটি চোখের উপর সবুজ বর্ণের একখণ্ড কাপড় ঝুলানো, যেনো চোখটি নষ্ট। কাফেলা দু'-রাত আগে সুদানের সীমান্তে প্রবেশ করেছিলো। সীমান্ত অতিক্রমে তাদেরকে কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়নি। রাতের অন্ধকারে

সুদানের সীমান্ত রক্ষীরা টের পায়নি যে, চার ব্যবসায়ী এবং ছয় উটের এই কাফেলাটি কোনো শহরের দিকে না গিয়ে সেই পার্বত্য অঞ্চলের কোনো এলাকার দিকে চলে যায়, যেখানকার বাসিন্দারা মুসলিম। অথচ ওদিকে কোনো বণিক কাফেলার যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। কারণ, সুদান সরকার মুসলমানদেরকে তরিতরকারী ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত রাখতে চাইতো।

কাফেলা রাতভর চলতে থাকে। রাত পোহালে তারা উটগুলোকে পার্বত্য এলাকায় লুকিয়ে ফেলে। সীমান্ত এখন তাদের থেকে অনেক দূরে– পেছনে। সারাদিন তারা সেখানে লুকিয়ে অতিবাহিত করে।

রাতের অন্ধকার নেমে এলে কাফেলা পুনরায় চলতে শুরু করে এবং মধ্যরাত নাগাদ পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়ে। এই এলাকাই কাফেলার গন্তব্য।

রাতের শেষ প্রহরে কাফেলা একটি গ্রামে প্রবেশ করে। দলনেতা একটি ঘরের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে দরজায় করাঘাত করেন। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে যায়। এক ব্যক্তি প্রদীপ হাতে বেরিয়ে আসে। দলনেতা তাকে কানে কানে কিছু বললেন। গৃহকর্তা 'খোশ আমদেদ' বলে বললেন– 'আপনারা সবাই ভেতরে আসুন। উটগুলোকে আমরা সামলাবো।'

চার ব্যবসায়ী ভেতরে ঢুকে পড়ে। মেজবান তার ঘরের লোকদেরকে এবং আরো দু'-তিনজন প্রতিবেশীকে জাগিয়ে তোলেন। তারা ব্যবসায়ীদের উটগুলোকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তাদের উটপালের সঙ্গে বেঁধে রাখে। মালামাল নামিয়ে মেজবানের ঘরে রাখা হলো। কাফেলা প্রধান বললেন– 'মালগুলো লুকিয়ে ফেলো।'

সবাই ধরাধরি করে মালগুলো খুললো। তার মধ্যে তরিতরকারীর স্থলে বেরিয়ে এলো তীর-তরবারী, খঞ্জর এবং তিন-চারটি চাটাইয়ে মোড়ানো দাহ্য পদার্থ ভর্তি অনেকগুলো পাতিল। মালগুলো লুকিয়ে ফেলা হলো।

'এবার আসলরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারি?' দলনেতা বললেন– 'অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।'

'কোন সমস্যা নেই'– মেজবান বললেন– 'সবাই নিজস্ব লোক।'

দলনেতা মুখের লম্বা দাড়িগুচ্ছ টান দিয়ে খুলে ফেলেন এবং চোখের সবুজ কাপড়ও সরিয়ে ফেলেন। তার আসল দাড়ি ছোট এবং পরিপাটি করে ছাটা। দৃশ্যমান দাড়ি তার কৃত্রিম ছিলো। মালপত্র এখানে-সেখানে লুকিয়ে রেখে লোকজন মেহমানদের নিকট এলে এক ব্যক্তি কাফেলার

নেতাকে দেখে চমকে ওঠে। দলনেতা মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন– 'আমাকে চেনেননি বুঝি?'

'ও, আলী বিন সুফিয়ান'– লোকটি বললো– 'আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে প্রথমে চিনতে পারিনি।' তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনি নিজে এসেছেন। এখানকার পরিস্থিতি ভালো নয়।'

'আমি সংবাদ পেয়েছি যে, সুদানের কয়েদখানার এক সিপাহী সুদানী ফৌজের দু'জন কমান্ডারকে হত্যা করে ফেলেছে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আর আমি এও জানতে পেরেছি, সুদানীরা আমাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।'

লম্বা দাড়িওয়ালা, চোখে পট্টিবাঁধা, চোগা পরিহত লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অভিজ্ঞ গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য এখানে এসেছেন। কায়রোতে বসে গোয়েন্দা মারফত যেসব তথ্য পেয়েছিলেন, তারই আলোকে এখন কথা বলছেন। যে ঘরটিতে এখন তিনি বসা আছেন, সেটিই তাঁর প্রেরিত গোয়েন্দাদের কেন্দ্র। গৃহকর্তা সুদানী নাগরিক। এরা সবাই সুলতান আইউবীর অনুগত। আলী বিন সুফিয়ানকে তারা একটি নতুন সংবাদ শোনালো–

'গুজব প্রচারিত হচ্ছে যে, আল্লাহর এক দূত এসেছেন, যিনি পানিতে আগুন লাগাতে পারেন'– মেজবান আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন– 'তিনি বলছেন, আল্লাহ আমাকে মৃতদের মধ্য থেকে তুলে এনে বলেছেন, তুমি মুসলমানদেরকে বলো, তোমরা সুদানের অনুগত হয়ে যাও। কারণ, এই মাটি তোমাদের মা।'

মেজবান আলী বিন সুফিয়ানকে আমর দরবেশ সম্পর্কিত সব কাহিনী শোনান। কিন্তু তার জানা ছিলো না যে, রাতে আমর দরবেশ তূর পর্বতের জালওয়া দেখিয়ে মানুষের অন্তরে অত্যন্ত ভয়ানক সন্দেহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

'আমি এ আশংকাই করছিলাম যে, দুশমন আমাদের বোধ-বিশ্বাসের উপর আক্রমণ করবে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'সে জন্য আমি নিজেই এসেছি। খৃস্টানরা নাশকতায় ওস্তাদ। আর আমাদের জনগণ হলো আবেগপ্রবণ। খৃস্টানরা হৃদয়গ্রাহী ভাষার ধুম্রজাল ছড়িয়ে দেয় আর আমাদের আবেগপ্রবণ আনাড়ী ভাইয়েরা তার সূক্ষ্ম সুতোয় আটকে পড়ে। যা হোক, কাল বিলম্ব না করে এক্ষুণি আমাকে এই ফেতনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আমার মনে হয় আমর দরবেশকে আমি চিনি। আমাদের

ফৌজের এক ইউনিটের কমান্ডার ছিলো। অত্র এলাকায় মিশরী গোয়েন্দা কমান্ডোও ছিলো।'

আলী বিন সুফিয়ান মেজবানকে বললেন– 'আপনি আমাদের কয়েকজন গোয়েন্দাকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করুন। এর বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।'

সকাল বেলা। এখানো সূর্য উদয় হয়নি। গোয়েন্দাদের ডেকে আনার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে। তাদের রওনা হওয়ার পরক্ষণেই একটি ঘোড়া দ্রুতবেগে ছুটে এসে ঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলে সকলে তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান।

ইনি ইমাম। সেই ইমাম, যিনি আমর দরবেশের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। কিন্তু জনতা তার কথা না শুনে তাকে ধাক্কা মেরে চলে গিয়েছিলো। পরে রাতে দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর উপর আক্রমণ করেছিলো। তিনি সেখান থেকেই ফিরে এসেছিলেন। তিনি জানতেন, এই গৃহটি মুসলমানদের গুপ্তচরবৃত্তি ও অন্যান্য তৎপরতার কেন্দ্র। পাবর্ত্য এলাকা থেকে ফিরে এসে ঘরে গিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তিনি এই গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হন। যুবক ইমাম নিশ্চিত, আমর দরবেশ একজন জাদুকর ও ভেল্কিবাজ। তিনি এখানে রিপোর্ট প্রদান এবং ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সহযোগিতা নিতে এসেছেন।

যুবক ইমাম আলী বিন সুফিয়ানকে চেনেন না। পরিচয় লাভ করার পর আমর দরবেশ কী কী ভেল্কি প্রদর্শন করেছেন এবং মুসলমান দর্শনার্থীরা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তিনি তার বিবরণ প্রদান করেন।

'আমরা যদি এই ধারা বন্ধ না করি, তাহলে মুসলমান তাদের বোধ-বিশ্বাস থেকে সরে যাবে'– ইমাম বললেন– 'তাদের আকীদা নষ্ট হয়ে যাবে। আমর দরবেশ নামক এই লোকটি আজ রাত সামনের গ্রামে যাবে এবং ভেল্কি দেখাবে।'

তারা কিছুক্ষণ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেন। একজন আমর দরবেশকে হত্যা করার প্রস্তাব দেন। আলী বিন সুফিয়ান তাতে একমত হলেন না। তিনি আস্থা জ্ঞাপন করেন– 'আমর দরবেশকে হত্যা না করেই সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যাবে এবং তারই মুখে বলানো যাবে, সে যে মোজেযা দেখিয়েছে, তা ছিলো ভেল্কিবাজি।' যুক্তি উপস্থাপন করে তিনি বললেন–

'হত্যা করা হলে মানুষ তাকে আরো বেশি সত্যাশ্রয়ী ভাবতে শুরু করবে।'

আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে বণিকবেশে আরো যে তিন ব্যক্তি এসেছিলেন, তারা মিশরী ফৌজের অতিশয় বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ লড়াকু গুপ্তচর। আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে বণিকের বেশে সঙ্গে নেন এবং নিজে মুখে লম্বা দাড়ি স্থাপন করেন ও এক চোখের উপর পট্টি বাঁধেন। নিজেরা ঘোড়ায় চড়ে আরো কয়েক ব্যক্তিকে উট-ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পেছন পেছন আসার জন্য বললেন। সকলকে জরুরী নির্দেশনা প্রদান করে তিনি ইমামের সঙ্গে আমর দরবেশের আস্তানা অভিমুখে রওনা হন।

আমর দরবেশ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সকাল সকাল পরবর্তী আস্তানা অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গীরা স্থানীয় লোকদের পোশাকে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি অপর একটি গ্রামের সামান্য দূরে এক স্থানে যাত্রাবিরতি দেন এবং তাঁবু স্থাপন করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি ও আশি প্রস্তুত হয়ে যান। তাঁবুর সম্মুখে দু'টি প্রদীপ জ্বালিয়ে গেড়ে দেয়া হলো। তার সঙ্গীরা গিয়ে এলাকাবাসীকে জানায়, তোমরা খোদার যে দূতের মোজেযার কথা শুনেছিলে, তিনি এখন তোমাদের মহল্লার অদূরে অবস্থান করছেন।

সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ছুটতে শুরু করে। একদিন আগে যারা আমর দরবেশকে দেখেছিলো, তারাও দূর-দূরান্ত থেকে এসে উপস্থিত হয়।

আমর দরবেশ প্রদীপ দু'টোর মধ্যখানে ছোট্ট গালিচাটির উপর বসে পড়েন। আশি আগের দিনকার ন্যায় আকর্ষণীয় পোশাকে সজ্জিতা। আমর দরবেশের সম্মুখে একটি কাপড় ছড়িয়ে পড়ে আছে। তিনি সেইসব ভাবভঙ্গি ও আচার-আচরণ দেখাতে শুরু করেন, যা বিগত দিন দেখিয়েছিলেন। গতকাল তাঁকে যে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, এক ব্যক্তি এবারও সেই প্রশ্ন করেন। আমর দরবেশ একই ভঙ্গিতে একই জবাব প্রদান করেন। বললেন- 'কারো কাছে পানি থাকলে এই কাপড়টির উপর ঢেলে দাও।'

আলী বিন সুফিয়ান তাঁর দলবলসহ পৌঁছে গেছেন। তিনি আমর দরবেশকে চিনে ফেলেছেন। তাঁর ভালভাবেই জানা আছে, এই লোকটি মিশরী ফৌজের এক ইউনিটের কমান্ডার ছিলো।

আলী বিন সুফিয়ানকে অবহিত করা হয়েছিলো, আমর দরবেশ পানিতে আগুন লাগাতে পারেন। কিন্তু পানিতে আগুন জ্বলে কিভাবে! বিষয়টির রহস্য উদঘাটনের জন্য তিনি ক্ষুদ্র একটি মশকে করে কতটুকু পানি সঙ্গে

করে নিয়ে আসেন। আমর দরবেশ যেই মাত্র বললেন, কারো নিকট পানি থাকলে এনে এই কাপড়টির উপর ঢেলে দাও, অমনি এক ব্যক্তি দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তার কাছে মশক ছিলো। সে কিছু পানি কাপড়টির উপর ঢেলে দেয়।

আলী বিন সুফিয়ান সামনে এগিয়ে যান। তিনি প্রদীপটি মাটি থেকে তুলে হাতে নিয়ে জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমাদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে আসো।' আলীর সঙ্গে আসা এক ব্যক্তি এগিয়ে আসে। আলী প্রদীপটি তার হাতে দিয়ে বললেন– 'এই কাপড়টায় আগুন ধরাও।' লোকটি ইতস্তত করে। আলী বিন সুফিয়ান জনতার উদ্দেশে বললেন– 'তোমাদের যে কেউ পানিতে আগুন ধরাতে পারবে।'

এগিয়ে আসা লোকটি প্রদীপটা কাপড়ের কাছে ধরামাত্রই কাপড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। এক ব্যক্তি– যে মূলত আমর দরবেশের সঙ্গী– বলে উঠলো– 'নিশ্চয় তুমি জাদু জানো। সরে যাও এখান থেকে। অন্যথায় এই বুযুর্গের অভিশাপে শেষ হয়ে যাবে।'

আমর দরবেশ বিস্মিত নয়নে চুপচাপ আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি তাকিয়ে আছেন। আলী বিন সুফিয়ান নিজের কোমরবন্ধটা খুলে আমর দরবেশের সামনে রেখে তার উপর পানি ঢেলে দিয়ে বললেন– 'তুমি যদি খোদার দূতই হয়ে থাকো, এতে আগুন লাগাও দেখি।' বলেই তিনি প্রদীপটা আমর দরবেশের দিকে এগিয়ে দেন। কিন্তু আমর দরবেশ তার মুখপানে তাকিয়েই আছেন।

জনতার মাঝে কানা-ঘুষা শুরু হয়ে গেছে। তারা আমর দরবেশের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে। সবচেয়ে উঁচু ইমামের কণ্ঠ। আমর দরবেশের লোকেরা তার পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করে। উভয় পক্ষেরই বক্তারা গোয়েন্দা। সাধারণ মানুষ নির্বাক কিংবর্তব্যবিমূঢ়। এটিও একটি যুদ্ধ। হক-বাতিলের লড়াই। আলী বিন সুফিয়ান জনতাকে ওদিকে ব্যস্ত দেখে আমর দরবেশের সম্মুখে বসে পড়েন।

'আমর দরবেশ!' আলী ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন– 'ঈমান বিক্রি করে কতো মূল্য পেয়েছো?'

'তুমি কে?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করেন।

'বহুদূর থেকে এসেছি'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তোমার সুখ্যাতি শুনে সীমান্তের ওপার থেকে এসেছি।'

আমর অস্থির চিত্তে এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন– 'আমি তোমাকে কিভাবে বিশ্বাস করবো?'

'আমার দাড়িতে হাত বুলাও'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'কৃত্রিম। ঈমান বিক্রি করে যে মূল্য আদায় করেছো, তার চেয়ে দ্বিগুণ দেবো। এই ভেল্কিবাজি বন্ধ করো। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।'

'আমি ঘাতকদের দ্বারা অবরুদ্ধ।' আমর দরবেশ বললেন।

'আমাকে অমান্য করলেও খুন হয়ে যাবে'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'এখানে আমাদের বহু মানুষ আছে। তোমার সঙ্গে ক'জন আছে?'

'আমি জানি না'– আমর দরবেশ বললেন– 'আপনার নাম কী?'

'বলা যাবে না'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আমি যা যা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দাও। তূরের জালওয়া কী? সত্য সত্য বলো। তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার।'

'উঠবার সময় ডানে-বাঁয়ে দেখে নেবেন'– আমর দরবেশ বললেন– 'উঁচু পাহাড়টির সামনে উঁচু একটি টিলা আছে। বিশাল একটি গাছ আছে। সন্ধ্যার সামান্য পরে ওখানে দু'-চারজন লোক লুকিয়ে রাখুন। যেভাবে পানিতে আগুন লাগানোর রহস্য জেনেছেন, তেমনি তূরের জালওয়ার ভেদও জেনে যাবেন। আমাকে এই তামাশাটা দেখানোর সুযোগ দিন। আপনি সেখান থেকে শিখা উঠতে দেবেন না। আমার পলায়ন ও নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার। ইসহাককে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে আনতে হবে। উঠুন, ঘোষণা করে দিন, রাতে তুর পর্বতের জালওয়া দেখানো হবে।'

আলী বিন সুফিয়ানের স্থলে অন্য কেউ হলে আমর দরবেশের এই অসম্পূর্ণ বক্তব্য বুঝতেন না। তিনি তো এই ময়দানের একজন দক্ষ খেলোয়াড়। ইশারায় অনেক কিছু বুঝবার যোগ্যতা তাঁর আছে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন– 'খোদার এই দূত আজ রাতে তূর পর্বতের জালওয়া দেখাবেন। আমি তার বুযুর্গীর প্রমাণ পেয়েছি। আপনারা এখন চলে যান। সন্ধ্যার পর আবার আসবেন।'

আলী বিন সুফিয়ান উঠে চলে যান। জনতা তাকে ঘিরে ধরে। জিজ্ঞাসা করে, হযরতের সঙ্গে আপনার কী কথা হয়েছে? তিনি উচ্চস্বরে বললেন– 'মহান মানুষটির বুকে একটি পয়গাম ও একটি ভেদ আছে। তার সঙ্গে কথা বলে আমি আমার সন্দেহ দূর করেছি। রাতে এসে আপনারা অবশ্যই তাঁর মোজেযা দেখবেন।'

একজন আমর দরবেশের কাছে গিয়ে বসে এবং জিজ্ঞেস করে, 'লোকটার সঙ্গে আপনার কী কথা হয়েছে?' আমর দরবেশ বললেন– 'আমি তাকে ভক্ত বানিয়ে ছেড়েছি।'

'কিন্তু লোকটা কে?'– আমর দরবেশ মুচকি হেসে বললেন– 'আজ রাতই আমি তার অবশিষ্ট সব সন্দেহ দূর করে দেবো।'

'লোকটা যদি রাতে আবার আসে, তাকে খুন করে ফেলবো।' অপর একজন বললো।

'এখনই নয়'– আমর দরবেশ বললেন– 'ফল উল্টোও হতে পারে। যদি রাতে সে আমার কাছে আসে, তাহলে তাঁবুতে এনে আমার নিকটে বসাবো আর তোমরা বেঁধে তাকে তুলে নিয়ে যাবে।'

'আমরা তার পিছু নিচ্ছি'– তৃতীয় একজন বললো– 'একে নজরে রাখতে হবে।'

দু'ব্যক্তি উঠে বিদায়ী জনতার সঙ্গে গিয়ে মিশে যায়। তারা আলী বিন সুফিয়ানকে খুঁজতে শুরু করে। কিন্তু তিনি জনতার মাঝে নেই। অনেককে জিজ্ঞেস করেও তারা সন্ধান পেলো না, লম্বা দাড়িওয়ালা চোখে পট্টিবাঁধা লোকটি কোথায়।

আলী বিন সুফিয়ান ঘোড়ায় চড়ে অতক্ষণে বহু দূরে চলে গেছেন।

তাঁবুতে এখন আমর দরবেশের সঙ্গে আশি ছাড়া আর কেউ নেই। আশি জিজ্ঞেস করে– 'লোকটি আসলে কে ছিলো? তোমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বললো, যেনো সে তোমার এবং তোমার ছদ্মরূপ সম্পর্কে অবগত।'

'শোনো আশি!'– আমর দরবেশ বললেন– 'আজ রাতে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আমি বলতে পারছি না, কী ঘটবে? লোকটাকে আমি চিনতে পারিনি। সে নিজের পরিচয় দেয়নি। কিন্তু সে অসাধারণ কোনো মানুষ নয়। আজ রাতে পালাবার সুযোগও পেয়ে যেতে পারি, আবার খুনও হতে পারি। আজ রাতেই তোমাকে প্রমাণ করতে হবে, তোমার শিরায় মুসলিম পিতার খুন বিদ্যমান। তুমি যদি ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করো, তাহলে আমার হাতেই তোমার জীবনের অবসান ঘটবে।'

'তুমি যদি আমাকে আরো খুলে বলো, কী ঘটবে এবং আমাকে কী করতে হবে, তাহলে আমি ভালভাবে তোমার সাহায্য করতে পারবো'– আশি বললো– 'তোমার জন্য খুন হতেও আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাতে যদি তোমার লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তাহলে আমার জীবনটাও বৃথা যাবে।'

'আচ্ছা, শোনো'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমাদের লোকদের কোনো কথা তুমি শুনবে না। তারা কখন কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, জেনে আমাকে অবহিত করার চেষ্টা করবে। রাতটায় কী যে ঘটবে, আমি ঠিক বলতে পারছি না। তুমি প্রস্তুত থাকবে।'

'তুমি একাধিকবার বলেছো, আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না'– আশি বললো– 'কিন্তু আমি এ কথা একবারও বলিনি। যাই হোক, তুমি যদি এখান থেকে মুক্তিলাভ করো, তাহলে আমাকে সঙ্গে করে নেবে কী?'

'যাবে তুমি?'

'না'– আশি ব্যথিত অথচ প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বললো– 'আমি মরে যাবো।'

'তুমি রাজকন্যা আশি'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমার সঙ্গে গেলে তোমার ভবিষ্যৎ কী হবে, তা তো আমি ভেবেই দেখিনি। নিশ্চয় বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোকে পছন্দ করবে না। আমি তোমাকে কায়রো নিয়ে যাবো। তোমাকে নিয়ে ভাববার মতো ওখানে ভালো ভালো মাথা আছে।'

'কেনো আমাকে সঙ্গে রাখবে না?' হঠাৎ চমকে উঠে আশি জিজ্ঞেস করে– 'আমাকে তোমার বউ বানাবে না?'

'তোমার এই শর্ত আমি কবুল করবো না'– আমর দরবেশ বললেন– 'মানুষ বলবে, আমি যা করেছি, তোমাকে হাসিল করার জন্য করেছি। আমার গৃহ– যেখানে আমার স্ত্রী থাকে– তোমার যোগ্য নয় আশি। আমি সৈনিক। আমার ঘর হলো যুদ্ধের ময়দান। স্ত্রীর চেহারা দেখেছি তিন বছর হয়ে গেছে। যদি তুমি এই জন্য আমার স্ত্রী হতে চাও যে, আমি তোমার পছন্দের পুরুষ, তাহলে তুমি নিরাশ হবে। তোমার ভালোবাসা আর দোআ সেই তীরকে প্রতিহত করতে পারবে না, যেটি আমার বুকে বিদ্ধ হবে। তুমি তোমার মনোবাঞ্ছা আমাকে বলে দাও।'

'আমি এই লাঞ্ছনার জীবন হতে মুক্ত হতে চাই'– আশি বললো– 'আমাকে তোমার সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রয়োজন। পরে যা হবে, সময়মত দেখা যাবে। আমি তোমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবো না।'

'আমি যদি বেঁচে থাকি, তোমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও আশ্রয় দেবো।'

'আচ্ছা, লোকটা গেলো কোথায়?'– আমর দরবেশের এক গোয়েন্দার কণ্ঠ। আমর দরবেশের তাঁবু থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আলী বিন সুফিয়ান সম্পর্কে ভাবছে সে। হতে পারে, আমর দরবেশ তার হৃদয়টা কব্জা করার পরিবর্তে নিজের হৃদয়টাই তার কব্জায় তুলে দিয়েছে। এখন আমাকে অনেক

বেশি সতর্ক হতে হবে। আমাকে তো আমর দরবেশের উপর ভরসা রাখতে নিষেধ করা হয়েছিলো।

'লম্বা দাড়িওয়ালা লোকটা আগুনের ভেদ জেনে গেছে'– অপর একজন বললো– 'এখন দেখতে হবে, আমর দরবেশ তার কাছে হার মেনেছে, নাকি সে আমরের কাছে হার মেনেছে।'

'যদি কোন ষড়যন্ত্র থাকে আর আশি তাতে জড়িত থাকে, তাহলে সিদ্ধান্ত স্পষ্ট, তাকে খুন করে ফেলতে হবে।' একজন বললো।

'এমন মূল্যবান সম্পদটাকে এভাবে নষ্ট করে ফেলবে?'– অন্য একজন বললো– 'ওকে তুলে নিয়ে যেতে হবে এবং উচ্চমূল্যের বিনিময়ে কোনো বিত্তশালী লোকের কাছে বিক্রি করে ফেলতে হবে। ওখানে গিয়ে বলবো, আশিকে খুন করে দাফন করে রেখেছি।'

তিন গোয়েন্দা পরস্পর এমনভাবে চোখাচোখি করে যেন এ প্রস্তাবে তারা সবাই একমত। একজন বললো– 'আজ রাতে আমাদেরকে তূর পর্বতের জালওয়া দেখাতে হবে। তখন দেখবো, আমর দরবেশ কিংবা ঐ লোকটির মতলব কী? রাতে আমাদের একজনকে আশির সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। মেয়েটি যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায়, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। আমর দরবেশ ও আশিকে রাতে কে কে পাহারা দেবে তারা ঠিক করে নেয়।

❖ ❖ ❖

'চারজনই যথেষ্ট'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'আমি আমর দরবেশের সঙ্গে থাকবো। যে তিন-চারজন লোক আমর দরবেশের পক্ষে কথা বলছিলো, তাদেরকে তো তোমরা চিনে রেখেছো। তারা তোমাদেরই এলাকার সেইসব মুসলমান, যারা সুদানীদের জন্য কাজ করছে। আমর দরবেশ তাদের সম্পর্কেই বলেছে যে, সে খুনী চক্রের বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ। তাদের প্রতি নজর রাখবে। প্রয়োজন হলে শেষ করে দেবে। তবে জীবিত ধরে ফেলতে পারলে ভালো হবে।

আলী বিন সুফিয়ান একটি মসজিদে উপবিষ্ট। যুবক ইমাম এ মসজিদেরই ইমাম। আলী বিন সুফিয়ানের মুখোশ খুলে রেখে দিলেন। তিনি নিজের লোকদেরকে রাত যাপনের জন্য মসজিদের বিভিন্ন কাজে জুড়ে দিয়ে বলছিলেন– 'আমার সন্দেহ ছিলো। কিন্তু লোকটা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আমি আশা করি রাতের মিশনেও আমরা সফল হবো।'

সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত। আমর দরবেশ আলী বিন সুফিয়ানকে যে

পাহাড়টি দেখিয়েছিলেন, এক ব্যক্তি তার উপর আরোহণ করছে। এমন সতর্কতার সাথে আরোহন করছে, যেনো কেউ দেখতে না পায়। তার ঠিক বিপরীত দিক দিয়ে নুয়ে নুয়ে তারই ন্যায় সন্তর্পনে চড়ছে অপর দু'ব্যক্তি। আরেক দিক থেকে উঠছে অন্য একজন। প্রথম ব্যক্তি চূড়ায় উঠে হামাগুড়ি দিয়ে বড় একটি গাছের নিকট পৌঁছে যায় এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাছটিতে চড়তে শুরু করে। দু'জন বৃহৎ একটি পাথরের পেছনে বসে পড়ে। এই জায়গাটা বৃক্ষ থেকে বেশি দূরে নয়। চতুর্থ ব্যক্তিও উপরে উঠে যায় এবং উপযুক্ত এক স্থানে লুকিয়ে যায়। প্রথম ব্যক্তি গাছে চড়ে মোটা একটি ডালের উপর যুৎসইভাবে বসে থাকে। গাছের ডাল ও পাতা এতো ঘন যে, নীচ থেকে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। খানিক পর সে অনুচ্চ কণ্ঠে পাখির মতো ডেকে ওঠে। জবাবে তার তিন সঙ্গী সাড়া দেয়।

সূর্যটা পাহাড়ের আড়ালে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে। আরো তিনজন একসঙ্গে পাহাড়ে আরোহন করছে। তাদের সঙ্গে আগুন জ্বালাবার উপকরণ ও একটি মাটির পাত্রে দাহ্য পদার্থ। প্রত্যেকের সঙ্গে লম্বা খঞ্জর।

সাঝের আলো-আঁধারি গাঢ় হতে চলেছে। এই তিন ব্যক্তির ভাবভঙ্গী এমন যেনো কোনো দিক থেকে তাদের কোনো শংকা নেই। তারা কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। তাদের কথাবার্তা আগে থেকে লুকিয়ে থাকা চার ব্যক্তি শুনতে পাচ্ছে। তারা সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে আছে। সেখান থেকে বেশ দূরে নীচে আমর দরবেশের আস্তানা। সাঝের আঁধারে আস্তানাটি দেখা যাচ্ছে না। শুধু তাঁবুর বাইরে পুঁতে রাখা দু'টি প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে।

'খোদার দূত প্রস্তুত হয়ে গেছেন'– এ তিন ব্যক্তির একজন হেসে বললো– 'মাল-মসলা বের করে প্রস্তুত রাখো।'

'আজ আমার কেনো যেনো ভয় লাগছে'– অন্য একজন বললো– 'কোনো অঘটন ঘটে যায় কিনা বলা যাচ্ছে না।'

'যে লোকটি চোখে সবুজ পট্টি বেঁধে এসেছিলো, তার জন্য আমার কেমন কেমন লাগছে'– তৃতীয়জন বললো– 'কিন্তু যাক গে, ভয় পেয়ে লাভ নেই। আমরা তূর পর্বতের জালওয়া দেখিয়ে সকলের সংশয়-সন্দেহ মুছে ফেলবো। সবাই মেনে নিলে একজনের বিরোধিতায় কিছু আসে-যায় না। তোমরা যার যার দায়িত্ব পালন করো। সময় বেশী নেই। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে।'

একজন পাত্রের মুখ খুলে তেলের ন্যায় একটা তরল পদার্থ মাটিতে ঢেলে

দেয়। জায়গাটা পাথুরে বিধায় এ পদার্থটা চুষে খায়নি। সেখান থেকে সামান্য দূরে সরে গিয়ে একজন ছোট একটি বাতি জ্বালিয়ে বড় বড় পাথরের মাঝে রেখে দেয়, যাতে দূর থেকে সেটি দেখা না যায়। তার আলোতে এই তিনজনকেও দেখা যাচ্ছে।

'এবার ওদিকে প্রদীপের প্রতি দৃষ্টি রাখো'– এক ব্যক্তি বললো– 'যখনই প্রদীপটি উপর-নীচ নড়তে শুরু করবে, তখন বাতিটি তেলের উপর ছুঁড়ে মারবে। জনতা তূর পর্বতের জালওয়া দেখতে পাবে।'

এই আয়োজনটা চলছে সেই বৃক্ষটির নীচে, যার ডালে এক ব্যক্তি বসে আছে। নীচে লোক তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। গাছের লোকটি ঝিঁঝির শব্দ করে ওঠে। বড় একটি পাথরের পেছন থেকেও ঝিঁঝির ডাক শোনা গেলো। নীচের তিন ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ গাছের উপর থেকে একজন ধপাস করে নীচে দাঁড়ানো লোকগুলোর একজনের উপর পড়ে যায়। এতে সে প্রায় চেপ্টা হয়ে যায়। অপর দু'জন ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে এদিক-ওদিক সরে যায়। পরক্ষণেই পাশে লুকিয়ে থাকা আরো তিন ব্যক্তি বেরিয়ে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা খঞ্জর বের করার সুযোগ পেলো না। লোকটি গাছের উপর থেকে যার উপর পড়েছিলো, সে ছিলো খুব শক্তিশালী। ফলে উপর থেকে পড়া লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। আলী বিন সুফিয়ান বলেছিলেন, ওদের জীবিত ধরে আনতে পারলে ভালো হবে। কিন্তু এখন এই লোকটাকে হত্যা না করে উপায় নেই। যে লোকটি তার উপরে পড়েছিলো, সে তার খঞ্জর বের করে শক্তিশালী লোকটির বুকে আঘাত হানে। অপর দু'জনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা হ্যান্ডকাপ পরিয়ে নিয়ে আসা হয়।

আমর দরবেশের তাঁবুর বাইরে জনতার ভিড়। আলী বিন সুফিয়ানও আছেন তাদের মাঝে। আছে তার মিশরী ফৌজের বেশ ক'জন কমান্ডো সেনা, যারা এই অঞ্চলে বিভিন্ন বেশ ধারণ করে বিভিন্ন পরিচয়ে অবস্থান করছিলো। দিনের বেলা একত্রিত করে তাদেরকে তাদের মিশন বুঝিয়ে দেয়া হলো। তাদের কয়েকজন ঘোড়ার পিঠে বসা। তাদের কাছে অস্ত্র আছে।

জনতার মাঝে আমর দরবেশের গতিবিধি পর্যবেক্ষণকারী ও তাকে সহায়তাকারী সুদানী গোয়েন্দাও রয়েছে। তারা পাঁচ-ছয়জনের বেশী হবে না। আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে চিনে রেখেছেন। তারাও মরা ও মারার

প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। কিন্তু তারা জানে না, তাদের প্রতিপক্ষের লোক সংখ্যা কত।

আশি তার বিশেষ তেলেসমাতী পোশাক পরিধান করে ও সাজগোজ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর কর্তব্য সম্পাদন করে। উভয় প্রদীপের মধ্যখানে ছোট গালিচাটি বিছানো। আমর দরবেশ তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন এবং মদ-মাতালের ন্যায় হেঁটে হেঁটে গালিচার উপর এসে উপবেশন করেন। উভয় বাহু প্রসারিত করে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আকাশপানে তাকিয়ে বিড় বিড় করতে শুরু করলেন। আশি তার সম্মুখে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারপর তার সম্মুখে দোজানু হয়ে বসে পড়ে।

'হে খোদার মহান দূত, যাকে সম্মান করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য ফরজ'– আশি বললো– 'এই বিপুলসংখ্যক লোক তূর পর্বতের সেই জালওয়া দেখতে এসেছে, যা মহান আল্লাহ মূসাকে দেখিয়েছিলেন। আর জিনরাও– যাদের মধ্যে আমিও একজন– তূরের জালওয়া দেখতে এসেছে।'

'তাদের কি সন্দেহ আছে, আমি খোদার যে পয়গাম নিয়ে এসেছি, তা সত্য?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করেন।

'গোস্তাখী মাফ করবেন হে খোদার দূত!'– এক ব্যক্তি বললো– 'তূর পর্বতের জালওয়া দেখিয়ে আমাদের হৃদয়ের সব সন্দেহ দূর করে দিন।'

আলী বিন সুফিয়ান সেই লোকটার প্রতি তাকান। তাকে চিনে রাখেন। আমর দরবেশের দলের লোক।

'হ্যাঁ, পবিত্র সত্তা!'– আলী বিন সুফিয়ান এগিয়ে এসে বললেন– 'আমরা সংশয়ে নিপতিত। আমাদেরকে তূর পর্বতের জালওয়া দেখান। আর এই মেয়েটি যদি জিন হয়ে থাকে, তাহলে সে কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাক। তাতে আমাদের সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।'

আমর দরবেশ পাহাড়ের প্রতি ইশারা করে বললেন– 'এদিকে তাকাও। অন্ধকারে তোমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছো না।' তিনি মাটি থেকে একটি প্রদীপ হাতে নিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'মহান খোদা! তোমার সরল ও অজ্ঞ বান্দারা সংশয়ের আঁধারে হাতড়ে ফিরছে। তুমি তাদেরকে সেই জালওয়া দেখাও, যা মূসাকে দেখিয়েছিলে এবং যা দ্বারা ফেরাউনের সিংহাসনকে ভস্ম করে দিয়েছিলে।'

আমর দরবেশ প্রদীপটি ডানে-বায়ে নাড়ান। তারপর উপরে তুলে নীচে নামান। কিন্তু পাহাড়ের উপর কোনো জ্যোতি আত্মপ্রকাশ করলো না। তিনি

পুনরায় প্রদীপটি উপর-নীচ করে নাড়ান। কিন্তু পাহাড়ে ক্ষুদ্র একটি স্ফুলিঙ্গও চমকালো না।

আমর দরবেশের তিন ব্যক্তির একজন পাহাড়ে মৃত পড়ে আছে। অপর দু'জন হ্যান্ডকাপ পরা। তারা এখন আলী বিন সুফিয়ানের লোকদের হাতে বন্দী। ওখানে তারা আমর দরবেশের প্রদীপের নাড়াচাড়া দেখতে পাচ্ছে। একজন বললো– 'আজ কেউ তূর পর্বতের জালওয়া দেখতে পাবে না।' অন্যরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

'আজ তূরের জালওয়া দেখা যাবে না'– আলী বিন সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে বললেন। তিনি আমর দরবেশকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আমর দরবেশ! আজ যদি তুমি পাহাড়ের চূড়ায় অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দেখাতে পারো, তাহলে আমি খোদার বদলে তোমার ইবাদত করবো।'

এক ব্যক্তি খঞ্জর বের করে আলী বিন সুফিয়ানের পেছন দিক দিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে যায়। কেউই দেখতে পেলো না, একজন লোক পেছন দিক দিয়ে তাঁবুতে ঢুকে পড়েছে। তাঁবুর ভেতর থেকে সে আশিকে ডাক দেয়। আশি ভেতরে ঢুকে পড়ে।

'এক্ষুণি পালাও'– লোকটি আশিকে বললো– 'আমাদের রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে। যে লোকটা বললো আজ তূর পর্বতের জালওয়া দেখা যাবে না, সে এই অঞ্চলের বাসিন্দা নয়। লোকটা মিশর থেকে এসেছে। আমাদের এক সাথী ধরা পড়েছে। এখানকার মুসলমানরা হিংস্র। তারা হয়তো আমর দরবেশকে খুন করে ফেলবে। আমরা পালিয়ে যাচ্ছি। তুমি এদের হাতে পড়ে গেলে তোমার সঙ্গে এরা পশুরন্যায় আচরণ করবে।'

'আমি যাবো না'– আশি মুচকি হেসে বললো– 'এই হিংস্র ও জংলীদের ব্যাপারে আমার কোনো ভয় নেই।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?'

'আমি পাগল ছিলাম'– আশি বললো– 'এখন আমার মাথা ঠিক হয়েছে। আমি এখন সেখানেই যাবো যেখানে আমর দরবেশ যেতে বলে।'

বাইরে আলী বিন সুফিয়ান ও যুবক ইমাম জনতাকে বলছেন– 'আসো, তোমাদেরকে সেই স্থানে নিয়ে যাবো, যেখান থেকে তূর পর্বতের জালওয়া দেখা যাওয়ার কথা ছিলো। গত রাতে তোমাদেরকে যে জালওয়া দেখানো হয়েছিলো, তার রহস্য দেখাবো।'

আলী বিন সুফিয়ানের কমান্ডাররা তিন ব্যক্তিকে এমনভাবে ধরে ফেলে

যে– 'কেউ টেরই পেলো না। পাজরে খঞ্জরের আগা ঠেকিয়ে তাদেরকে অন্ধকারে নিয়ে আটক করে রাখা হয়েছে। আমর দরবেশ এখনো ওখানেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে আছেন।'

তাঁবুর ভেতর এক সুদানী গুপ্তচর আশিকে বাঁচানোর জন্য তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। লোকটি এই ভেবে বিস্মিত যে, মেয়েটি যেতে চাচ্ছে না কেন! সে বারংবার বলছে, মুসলমান জংলী ও পশু চরিত্রের মানুষ।

আশি বললো– 'তুমি মুসলমান, আমিও মুসলমান। আমি আমার স্বজাতিকে ছেড়ে যাবো না।'

বাইরে হট্টগোল বেড়ে চলেছে। তাঁবুর ভেতরের লোকটি লম্বা একটি খঞ্জর বের করে আশিকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে সঙ্গে যেতে চাপ সৃষ্টি করছে। আশিরও তরবারী আছে। অস্ত্রটা রাখা আছে এমন জায়গায়, যেখান থেকে ঝটপট নিয়ে নেয়া যায়। আমর দরবেশ তাকে প্রতি মুহূর্তে অস্ত্র প্রস্তুত রাখতে বলে রেখেছেন। আশি মুহূর্ত মধ্যে তরবারীটা হাতে নিয়ে বললো– 'আমরা দু'জনের একজনও তোমাদের সঙ্গে যাবো না।'

একজন পুরুষের জন্য এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ যে, একটি নারী তাকে হুমকি দিচ্ছে। সে বুঝে ফেলেছে, সমস্যা একটা আছে এবং এই মূল্যবান মেয়েটা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মেয়েটিকে হত্যা করা কিংবা তুলে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক। আশি যে তরবারী চালাতে জানে, এ ধারণা সুদানী গুপ্তচরের ছিলো না। অগত্যা সে মেয়েটির উপর খঞ্জরের আঘাত হানে। আশি তরবারী দ্বারা তার আঘাত প্রতিহত করে। সুদানী গোয়েন্দার হাত থেকে খঞ্জরটা ছুটে পড়ে যায়। কিন্তু তাঁবুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অস্ত্রটি তার নিকটেই এসে পড়ে। সে খঞ্জরটা তুলে নেয়। আশি তার উপর তরবারী দ্বারা আক্রমণ করে। গোয়েন্দা অভিজ্ঞ তরবারী চালক। আশির আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। আশি বললো– 'তুমি তরবারী চালনা যার কাছে শিখেছো, তিনি এ বিদ্যায় আমারও ওস্তাদ।'

একদিকে সরে গিয়ে সে আশির আরো একটি আক্রমণ প্রতিহত করে এবং নিজেকে সামলে নিতে না নিতেই আশির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার কব্জি চেপে ধরে বললো– 'আশি! আমি তোমাকে খুন করবো না। তুমি আত্মসংবরণ করো।'

আশি ঝট করে তার নাকে একটা সঝোরে ঘুষি মারে। লোকটি পেছনে

ছিটকে পড়লে তরবারীর আঘাতে হাতের খঞ্জরটা তার পুনরায় পড়ে যায়। আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পেছন দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁবু তাকে ঠেকিয়ে দেয়। এখন আশির তরবারীর আগা সুদানী গোয়েন্দার ধমনীর উপর।

'আমি মুসলিম পিতার কন্যা'– তরবারীর আগাটা ধমনীর উপর চাপ দিয়ে আশি বললো– 'বসে পড়ো। হাত পেছনে নিয়ে যাও। আমার শক্তি হলো আমার ঈমান। আমি এখন আর কারো ক্রীড়নক নই।'

বাইরের চিত্র নিম্নরূপ–

আলী বিন সুফিয়ান একটি প্রদীপ হাতে তুলে নেন। অপরটি হাতে নেন যুবক ইমাম। চার-পাঁচজন কমান্ডোসেনা আমর দরবেশকে ঘিরে রেখেছে। আসামী হিসেবে বন্দী করা নয়– তাকে নিরাপত্তার জন্য আশ্রয়ে দিয়েছে। আশংকা হলো, যেসব সুদানী গুপ্তচর তাকে চোখে চোখে রেখেছিলো, তারা তাকে হত্যা করে ফেলতে পারে। তবে যতোটুকু মনে হচ্ছে, তাদের একজনও মুক্ত নেই। কাজটা আলী বিন সুফিয়ানের পরিকল্পনা মোতাবেক সম্পাদিত হয়েছে।

আমর দরবেশ এক কমান্ডোকে বললেন– 'তাঁবুতে একটি মেয়ে আছে। তাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। মেয়েটি মুসলমান।'

তাঁবুতে গিয়ে দেখা গেলো সেখানে অন্যরকম এক দৃশ্য বিরাজ করছে। আশি তরবারীর আগায় এক ব্যক্তিকে বসিয়ে রেখেছে। লোকটাকে গ্রেফতার করা হলো। আলী বিন সুফিয়ান আমর দরবেশকে বললেন– 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার লোকেরা ঐ পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে এবং তারাই সেখান থেকে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা প্রতিহত করেছে। ভালো হবে, যদি জনতাকে এখনই সেখানে নিয়ে দেখানো হয় তূর পর্বতের জালওয়া কিভাবে সৃষ্টি করা হয়, তাহলে তারা স্পষ্ট বুঝতে পারবে, তাদেরকে যা দেখানো হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভেল্কিবাজি।'

'আরো একটি বিষয় আছে, সেদিকে এখনই দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক'– আমর দরবেশ বললেন– 'ইসহাককে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করতে হবে। এই অঞ্চলে সুদানীদের অনেক গুপ্তচর আছে। তাদের কেউ না কেউ এখানকার পরিস্থিতির আকস্মিক ও অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন সম্পর্কে সরকার ও সেনাবাহিনীকে তথ্য দেবে। তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তারা ইসহাককে কয়েদখানার পাতাল কক্ষে নিক্ষেপ করে নিপীড়ন করে মেরে ফেলবে। আমি

সুদানী সালারকে ধোঁকা দিয়ে এসেছি যে, আমি এখানকার মুসলমানদের চিন্তাধারা বদলে দেবো। কয়েদখানায় আমি ইসহাকের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাকে বলে এসেছি, আমি সুদানীদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে নিজ এলাকায় গিয়ে দিনকয়েক তাদের মর্জিমাফিক কাজ করবো। আমার ইচ্ছা ছিলো, এখানে এসে আমি লোকদেরকে আমার আসল উদ্দেশ্যের কথা বলে দেবো এবং কায়রোর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইসহাককে মুক্ত করে আনার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু এখানে এসে আমি বুঝতে পারি যে, বহু সুদানী গুপ্তচর– যারা আমারই অঞ্চলের মানুষ– আমার চারদিকে ঘোরাফেরা করছে এবং আমি স্বাধীন নই। তবে ভাগ্য ভালো যে, শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো, আমার সঙ্গে দেয়া এই মেয়েটি মুসলমান।'

আমর দরবেশ আশির অতীত ইতিবৃত্ত শুনিয়ে বললেন– 'আমার আশা ছিলো না যে, আমি লক্ষ্য অর্জনে সফল হবো। আমি বেজায় অস্থির হয়ে পড়ি। আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা এতোই সরলমনা ও আবেগপ্রবণ যে, তারা আমার বক্তব্য ও ভেল্কিবাজিতে প্রভাবিত হতে শুরু করে। আমি কী করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি প্রতিটি মুহূর্ত সুদানী গুপ্তচরদের চোখে চোখে অতিবাহিত করেছি। আল্লাহ আমার নিয়তের কদর করেছেন। আপনাকে প্রেরণ করে তিনি ধ্বংসের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন। বাকি কথা পরে হবে। আমি ইসহাককে মুক্ত করতে চাই। আপনি আমাকে দু'জন সাহসী ও বিচক্ষণ কমান্ডোসেনা দিন।'

আমর দরবেশ আলী বিন সুফিয়ানকে তার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন। আলী বিন সুফিয়ান ভেবে-চিন্তে পরিকল্পনায় কিছু রদবদল করে তাকে বললেন– 'তুমি দু'জন কমান্ডো ও আশিকে নিয়ে এখনই রওনা হয়ে যাও এবং ইসহাককে মুক্ত করে আনো। আমি লোকগুলোকে পাহাড়ে নিয়ে দেখিয়ে আনি, তূর পর্বতের জালওয়ার হাকীকত কী ছিলো।'

আমর দরবেশ দু'জন কমান্ডো ও আশিকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে যান।

তারা তাঁবুর পেছন দিকে দিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসেন। জনতা চরম বিস্ময় ও হতাশার মধ্যে দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে কানাঘুষা করছে। আলী বিন সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'আপনারা যদি তূর পর্বতের জালওয়ার হাকীকত দেখতে চান, তাহলে আমার সঙ্গে আসুন। আপনারা জানেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর

পর নবুওতের ধারা শেষ হয়ে গেছে। তাঁর পরে আল্লাহ না কাউকে কখনো জালওয়া কিংবা মোজেযা দেখিয়েছেন, না দেখাবেন। ঐ লোকটিকে আপনাদের আকীদা নষ্ট করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিলো। আপনারা ভেবে দেখেননি, লোকটি কেবল একটি কথাই বলতো যে, তোমরা সুদানের ফৌজকে সবসময় এই এলাকা থেকে দূরে রেখেছো। তারা এবার আপনাদের হৃদয় জয় করার জন্য এই অস্ত্রটা ব্যবহার করেছে।'

'আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানগণ! দুশমন যখন এ জাতীয় হীন অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, তখন বুঝতে হবে, তারা ময়দানে আপনাদের মুখোমুখি হতে ভয় পায়। আপনারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভূখণ্ড আপনাদের। এখানে ইসলামের শাসন চলছে। কাফেররা আপনাদের অন্তর থেকে জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনা নিঃশেষ করার লক্ষ্যে মাঠে নেমেছে। আজ আপনাদেরকে তূর পর্বতের জালওয়া দেখানো হচ্ছে। কাল খৃস্টান মেয়েদের রূপ দেখিয়ে আপনাদের মাঝে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার জন্ম দেবে। আপনাদেরকে মানুষ থেকে পশুতে পরিণত করবে। তারপর টেরও পাবেন না, আপনারা ইজ্জত, আত্মমর্যাদাবোধ ও জাতীয় চেতনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে গেছেন। আপনারা কাফিরদের গোলামে পরিণত হয়ে যাবেন। সুদানের রাজা মুসলমান নন– তিনি ইসলামের শত্রু ও খৃস্টানদের বন্ধু। আচ্ছা, আপনাদের মেয়েরা খৃস্টান পুরষদের সঙ্গে মদপান করুক, অপকর্মে লিপ্ত হোক, তা কি আপনারা মেনে নেবেন? আপনারা কি মেনে নেবেন যে, আপনাদের মসজিদগুলো বিরান হয়ে যাক এবং কুরআনের অবমাননা করা হোক?'

'কাবার প্রভুর শপথ! আমরা এমনটা চাই না'– 'এক ব্যক্তি বললো– 'ঐ লোকটাকে আমাদের সামনে নিয়ে আসুন, যে নিজেকে খোদার দূত বলে দাবি করছে। বেটা গেল কোথায়?'

'না, সে নির্দোষ'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'সে আপনাদেরই একজন। এখন সে তার আসল রূপে আপনাদের সম্মুখে আসবে এবং আপনাদের অবহিত করবে, কাফেররা কিভাবে আপনাদের শিকড় কাটছে। এখন আপনারা আমার কথা শুনুন। আপনারা মুসলমান। আল্লাহ আপনাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আর কাফেররা আপনাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়।'

'আপনি কে?'– এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করে– 'আপনার বক্তব্যে পাণ্ডিত্য আছে। আপনি কি বলতে পারেন, আমাদেরকে যা কিছু দেখানো

হয়েছিলো, সেগুলো আসলে কি?'

'সেই রহস্য দেখাচ্ছি'– বলেই আলী বিন সুফিয়ান তাঁবুর ভেতর থেকে একটি থালা নিয়ে আসেন, যার মধ্যে তেলের ন্যায় তরল দাহ্য পদার্থ আছে। তিনি তেলগুলো একটি কাপড়ের উপর ঢেলে কাপড়টা মাটিতে রেখে দেন। পরে তাতে পানি ঢেলে দিয়ে প্রদীপটা কাপড়ের সঙ্গে লাগান। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি সকলকে অবহিত করেন, আমর দরবেশ যে কাপড়টিতে পানি ঢেলে আগুন ধরাতো, সেটিতে এই তেল মাখানো থাকতো।

'এবার আপনারা সেই লোকগুলোকে দেখুন, যারা তার সঙ্গী ছিলো'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন। তিনি কাউকে আওয়াজ দিয়ে বললেন– 'ওদেরকে জনতার সামনে নিয়ে আসো।'

আমর দরবেশের দলের লোকগুলোকে ধরে জনতার ভিড় থেকে কিছু দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিলো। আলী বিন সুফিয়ানের কমান্ডোরা তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। হঠাৎ হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। ঘোড়ার দৌড়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো। এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলে উঠলো– 'একজন পালিয়ে গেছে।'

এক গোয়েন্দা পালিয়ে গেছে। অন্যদেরকে জনতার আদালতে হাজির করা হলো। প্রদীপ উঁচু করে সকলকে তাদের চেহারা দেখানো হলো।

'এরা মুসলমান'– আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'এই অঞ্চলের বাসিন্দা। এরা ঈমান বিক্রেতা।'

আলী বিন সুফিয়ান এদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে বক্তব্য রাখেন।

'এদেরকে মেরে ফেলা হোক'– জনতার মধ্য থেকে কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো– 'পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হোক।'

উপস্থিত লোকগুলো তাদের দিকে ছুটে আসার চেষ্টা করে। মশালের আলোতে কতগুলো তরবারীর চমক দেখা গেলো।

'থামো'– আলী বিন সুফিয়ান মধ্যখানে এসে দাঁড়িয়ে বললেন– 'আল্লাহর আইন নিজেদের হাতে তুলে নিও না। যথাযথ কর্তৃপক্ষ এদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এদেরকে হেফাজতে নিয়ে যাও। আর আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।'

জনতা আলী বিন সুফিয়ানের পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করে। তিনি

তাদেরকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হন, যেখানে তার লোকেরা এক ব্যক্তিকে খুন করেছে এবং দু'জনকে রশি দ্বারা বেঁধে রেখেছে।

আমর দরবেশ, আশি ও দু'কমান্ডো বহু পথ এগিয়ে গেছেন। তারা সুদানের রাজধানী অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন।

'বন্ধুগণ!'– আমর দরবেশ চলন্ত ঘোড়ার উপর থেকে বললেন– 'আমদেরকে খুব দ্রুত পৌঁছতে হবে। আশি, তুমি যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ো, তাহলে আমার পেছনে এসে বসবে। সফর খুব দীর্ঘ এবং সময় খুবই অল্প। আমার ভয় হচ্ছে, কোনো শত্রু গোয়েন্দা আমাদের আগে পৌঁছে যায় কিনা।'

একজন সুদানী গোয়েন্দাও রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। সেই গোয়েন্দা, যে আলী বিন সুফিয়ানের হেফাজত থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। পেছন থেকে ধাওয়া হতে পারে এই ভয়ে সে একটি উপত্যকার পথ ধরে ছুটছে। একসময় উপত্যকা থেকে বেরিয়ে বহু পথ ঘুরে রাজধানীর পথ ধরে। এদিকে আমর দরবেশও বহুদূর চলে গেছেন।

সুদানী গোয়েন্দা কেন্দ্রকে সংবাদ পৌঁছাবে, আমর দরবেশের ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে। রিপোর্টে আমর দরবেশের উপর সন্দেহও ব্যক্ত করবে বলে তার সিদ্ধান্ত। তার উদ্দেশ্য আমর দরবেশকে পুনরায় কয়েদখানায় আবদ্ধ করানো।

অপরদিকে আমর দরবেশের পরিকল্পনা হচ্ছে, তার আগে পৌঁছে গিয়ে সুদানী সালারকে ধোঁকা দেয়া এবং ইসহাককে মুক্ত করে আনা। আশি এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত এবং সে সাক্ষী হিসেবে সঙ্গে যাচ্ছে।

প্রদীপের আলোতে জনতা পাহাড়ের উপর আরোহন করছে। আলী বিন সুফিয়ান সকলের সামনে হাঁটছেন। তার লোকেরা পাহাড়ের চূড়ায় দু'জন গুপ্তচরকে বেঁধে রেখেছে। তারা দেখতে পাচ্ছে, কয়েকটি প্রদীপ এবং কতগুলো লোক পাহাড়ে আরোহন করছে। তারা বাতি উপরে তুলে ধরে দেখার চেষ্টা করে লোকগুলো কারা এবং তাদের গন্তব্য কোথায়।

'আমাদের সঙ্গে চলো'– হ্যান্ডকাপ পরিহিত এক ব্যক্তি বললো– 'যা চাইবে তাই দেবো, আমাদেরকে ছেড়ে দাও।'

'তোমরা কি সকল মুসলমানকে ঈমান-বিক্রেতা মনে করো?'– আলী বিন সুফিয়ান এক কমান্ডোকে বললেন– 'দুনিয়ার সম্পদ আর জাহান্নামের আগুনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তোমরা স্বজাতিকে ধোঁকা দিয়েছিলে।'

'তিনি আসছেন'– অপর কয়েদী বললো– 'তিনি আমাদেরকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলবেন। আমাদেরকে অতি নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে। বলো, কী দেবো। ছেড়ে দাও, আমরা পাহাড়ের অপরদিক দিয়ে পালিয়ে যাই। হিরা-জহরত দেবো, যতো চাও ততো দেবো।'

প্রদীপগুলো যতোটুকু উপরে উঠছে, কয়েদীদের অস্থিরতা ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন বললো– 'তোমার সঙ্গে তো তরবারী আছে। তা দ্বারা এক আঘাতে আমাদের ঘাড় দ্বিখণ্ডিত করে দাও। আমাদেরকে ঐ লোকগুলো থেকে রক্ষা করো।'

'আল্লাহর নিকট গুনাহর মাফ চাও।'

প্রদীপগুলো তাদের মাথার উপর এসে দাঁড়িয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান জনতাকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। দু'জন লোককে রশিতে বাঁধা দেখে লোকগুলো বিস্মিত হয়ে যায়।

'এরাই হলো তূর পর্বতের জালওয়া প্রদর্শনকারী'– বলে আলী বিন সুফিয়ান মাটিতে চোখ বুলান। একদিকে বাতিটা ইশারা করে বললেন– এই দেখো, এখানে দাহ্য পদার্থ পড়ে আছে। তার পার্শ্বেই পড়ে আছে একটি থালা। আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'এই থালায় সেই তেল ছিলো, যা দ্বারা কাপড়ে আগুন ধরানো হতো। এ তেল এখানে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমি চার ব্যক্তিকে সন্ধ্যায় এখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমর দরবেশের প্রদীপের সংকেতে এই বাতি থেকে তেলে আগুন ধরিয়ে দেয়ার কথা ছিলো। এটিই সেই তূরের জালওয়া, যা তোমরা দেখতে পারোনি। কারণ, আমার লোকেরা আগুন জ্বালানোর আগেই এদেরকে পাকড়াও করে ফেলে।'

'এরা তিনজন ছিলো'– এক ব্যক্তি বললো– 'তৃতীয়জন আমাদের মোকাবেলা করেছিলো। তার লাশ গাছের গোড়ায় পড়ে আছে।'

আলী বিন সুফিয়ান প্রদীপের আগুন তেলের কাছে নিয়ে বললেন– 'এই দেখেন'। অমনি তেলে আগুন জ্বলে ওঠে। আগুনের শিখা উপরে ওঠে পরক্ষণেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করে। আলী বললেন– 'এরপর কি সন্দেহের কোনো অবকাশ আছে যে, আপনাদেরকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অগ্নিপূজারী বানানোর চেষ্টা চলছিলো?'

'আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন'– বন্দীদের একজন বললো– 'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'তোমরা কি এই অঞ্চলের মুসলমান নও?' আলী জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ।' দু'জনই মাথা নাড়ায়।

'খৃস্টান ও সুদানী কাফেররা কি তোমাদেরকে এ কাজের প্রশিক্ষণ দেয়নি?'

'হ্যাঁ, তারাই দিয়েছে। আমরা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।'

'তোমরা কি স্বজাতিকে ধোঁকা দেয়া এবং নিজ ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য পুরস্কার লাভ করতে না?'

'হ্যাঁ'– একজন জবাব দেয়– 'এর বিনিময়ে আমরা বড় অংকের পুরস্কার পেতাম।'

'আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন'– একজন বললো– 'আমরা আমাদের জাতি ও ধর্মের জন্য জীবন বিলিয়ে দেবো।

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ পেছন থেকে এক তোজোদীপ্ত মুসলমান তরবারী দ্বারা এতো তীব্রবেগে আঘাত হানে যে, একসঙ্গে দুজনের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

'আমি যদি খুনের অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকি, তাহলে আমাকে হত্যা করে ফেলো।' আক্রমণকারী লোকটি তরবারীটা জনতার সম্মুখে ছুঁড়ে ফেলে বললো।

'আল্লাহর কসম! এই লোকটি খুনী হতে পারে না।' যুবক ইমাম বললেন।

'এ খুন বৈধ।' জনতার মধ্য থেকে সমস্বরে রব ওঠে।

রাতের শেষ প্রহরে আমর দরবেশ ঘোড়া থামান। আশি ও কমান্ডোদের বললেন– 'কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নেই।' ঘোড়াগুলোকেও বিশ্রামের সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন ছিলো।

রাজধানীগামী গোয়েন্দা আধা রাত চলার পর বিশ্রামরে জন্য এক স্থানে থেমে যায়। তার জানা নেই। আমর দরবেশ আগে আগে যাচ্ছেন। গোয়েন্দা মাটিতে মাথাটা এলিয়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত পোহাবার পরপরই আমর দরবেশ প্রস্তুত হয়ে পুনরায় রওনা হন। তিনি সৈনিক। কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত। আশি প্রাসাদের মেয়ে। তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো বটে; কিন্তু তার সময় কাটছিলো বিলাসিতার মধ্যদিয়ে।

'আশি!'– আমর দরবেশ ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে বললেন– 'তোমার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তোমার রাত জাগার অভ্যাস নেই। আমা.. ঘোড়ায় পিঠে উঠে বসো।'

আশি মুখ টিপে হাসে। কিন্তু চোখ দুটো তার বন্ধ। আমর দরবেশ তাকে পুনরায় বললেন– 'তোমার ঘোড়াটা ছেড়ে দাও।'

আশি মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়। ঘোড়া ছুটে চলছে। আরো কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর এক কমান্ডো আমর দরবেশকে বললেন– 'মেয়েটি ঝিমুচ্ছে, ঘোড়া থেকে পড়ে যাবে।'

আমর দরবেশ নিজের ঘোড়াটা আশির নিকটে নিয়ে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন। আশি জেগে যায়। আমর দরবেশ বললেন– 'নিজের ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে আমার ঘোড়ায় চলে এসো।'

'সহায়তা নিতে চাই না'– আশি বললো– 'আমি অন্যকে সহায়তা দিতে চাই। আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে হবে। পিতা-মাতার খুন এবং নিজের সম্ভ্রমের প্রতিশোধ নিতে হবে। আমি জেগে থাকার চেষ্টা করছি।'

ঘোড়া এগিয়ে চলে। অনেক পথ এগিয়ে যাওয়ার পরও আশির ঘুমের ভাব কাটছে না। আমর দরবেশ তার পাশে পাশেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। তিনি দেখে না ফেললে আশি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়েই যেতো। তিনি ঘোড়া থামিয়ে কোন কিছু না বলে আশিকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নেন এবং সম্মুখে বসিয়ে দেন। এক কমান্ডো আশির ঘোড়ার লাগাম নিজের জিনের সঙ্গে বেঁধে নেয়। সবগুলো ঘোড়া একসাথে ছুটে চলছে।

আশি নিজের মাথাটা আমর দরবেশের বুকের উপর ছেড়ে দিয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মেয়েটির খোলা চুলগুলো আমার দরবেশের মুখের উপর উড়তে থাকে। এমন কোমল আর রেশম-সুন্দর চুলের পরশের সঙ্গে আমর দরবেশ পরিচিত নয়। কিন্তু মেয়েটির কোনকিছুই তার উপর সেই প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, যা একজন সুপুরুষ যুবকের উপর করার কথা। আশির পূর্বেকার বলা কথাগুলো তার মনে পড়তে শুরু করে।

'তোমার কোলে আমার পিতা-মাতার কোলের আনন্দ অনুভূত হয়েছিলো'– আশি কয়েকদিন আগে সেই মরু এলাকায় বসে বলেছিলো– 'আমার তো এ কথাও স্মরণ নেই যে, আমারও বাবা-মা ছিলেন। আপনি আমার অতীতটা আমার চোখের সামনে এনে দিয়েছেন।'

আমর দরবেশের মনে হতে লাগলো, যেনো আশি বাতাসের সঙ্গে ফিস ফিস করে কথাগুলো বলছে আর তিনি শুনছেন– 'আমাকে তোমার বক্ষ ও বাহুর আশ্রয়ে নিয়ে রাখো। আমি মুসলমানের কন্যা। আমাকে খৃস্টানদের হাতে তুলে দিও না। রক্ত... রক্ত...। আমি রক্ত দেখতে পাচ্ছি। এগুলো

আমার পিতার রক্ত। এগুলো মায়ের। দু'জনের রক্ত একত্রিত হয়ে বাইতুল মোকাদ্দাসের বালিতে শুকিয়ে যাচ্ছে...। আমর দরবেশ! আপনার শিরায় হাশেমের খুন প্রবাহিত হচ্ছে। আপনি সেই খুনের প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবেন না, যা বাইতুল মোকাদ্দাসের বালি চুষে নিয়েছে। ফিলিস্তিনের সম্ভ্রম আপনাকে ডাকছে। প্রথম কেবলাকে হৃদয় থেকে ফেলে দেবেন না হাশেমের পুত্র।

আমর দরবেশ ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেন। কমান্ডোদেরও নিজ নিজ ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিতে হলো। আশির এলোমেলো চুলগুলো আরো বিক্ষিপ্ত হয়ে বাতাসের তালে তালে আমর দরবেশের মুখের উপর উড়ছে।

'আমর দরবেশ'– এক কমান্ডো তার ঘোড়াটা আমর দরবেশের পাশে এনে বললো– 'সামনে কোনো চৌকি থেকে ঘোড়া বদল করে নেয়ার আশা নেই। ঘোড়াগুলোকে এভাবে মেরে ফেলো না। আরো ধীরে চলো।'

আমর দরবেশ কমান্ডোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুচকি হাসেন। তিনি ঘোড়ার গতি কিছুটা হ্রাস করে বললেন– 'মহান আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। ঘোড়া ক্লান্ত হবে না ইনশাআল্লাহ।'

আমর দরবেশের কথা বলার শব্দে আশির ঘুম ভেঙ্গে যায়। হঠাৎ চমকে উঠে খানিকটা ভয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'আমি কতক্ষণ যাবত ঘুমিয়ে ছিলাম? আমার ঘোড়া কোথায়?'

'তুমি তো ঘোড়ার পিঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলে'– আমর দরবেশ বললেন– 'কিন্তু আমার ঘুমন্ত ঈমানের শিরা জেগে উঠেছিলো। ওঠো, নিজের ঘোড়ায় গিয়ে চড়ে বসো। সন্ধ্যা নাগাদ গন্তব্যে পৌঁছে যেতে হবে।'

আলী বিন সুফিয়ান সেই গ্রামটিতে চলে যান, যাকে মুসলমানরা তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রভূমি বানিয়ে রেখেছিলো। তিনি তার কমান্ডোসেনা ও গুপ্তচরদের দায়িত্ব প্রদান করেন যে, তোমরা অঞ্চলময় ছড়িয়ে পড়ে আমর দরবেশের ভেল্কিবাজির রহস্য ফাঁস হওয়ার কথা প্রচার করে দাও। তিনি সেখানকার নেতৃবর্গকে বললেন, আপনারা লোকদের প্রস্তুত করুন।

যাই বলি না কেনো, এলাকাটা সুদানের, যেখানে মুসলমানদের স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই। সুদানী ফৌজ প্রয়োজন বোধ করলে হামলা করার অধিকার রাখে। কিন্তু তারপরও মুসলমানরা এলাকায় তাদের বি

বিধান চালু রেখেছে। তারা যে ক'জন শত্রু গোয়েন্দাকে গ্রেফতার করেছিলো,তাদেরকে নিজেদের তৈরি কয়েদখানায় ফেলে রেখেছে। তাদের শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু এই শাস্তি বিধান সুদানী আইনে অপরাধ। এই আসামীরা যা কিছু করেছে, সবই সুদানের স্বার্থে করেছে। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ান ঝুঁকি মাথায় তুলে নেন। তিনি তার কমান্ডোদের ভাগ করে দু'টি দল গঠন করে নেন।

কয়েদখানায় ইসহাককে উন্নত একটি কক্ষে রাখা হয়েছে। তাকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে উন্নত খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। তিনি ভালোভাবেই বুঝেন, তার সঙ্গে এই সদাচারণ কেনো করা হচ্ছে। আমর দরবেশ তাকে তার পরিকল্পনা পুরোপুরি বলে গিয়েছিলো। ইসহাক একাকী বসে সে নিয়েই ভাবছেন। দু'টি আশংকা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রথমত, আমর দরবেশ কয়েদখানার নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে সুদানীদের হাতে খেলতে শুরু করলো কিনা। দ্বিতীয়ত, নাকি নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন।

ইসহাক নিজের পলায়ন সম্পর্কেও ভাবছেন। কিন্তু কোনো পন্থা তার চোখে পড়ছে না। সুদানীদের জন্য তিনি একজন মূল্যবান কয়েদী, যার ফলে তার জন্য অতিরিক্ত পাহারার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। আমর দরবেশের চলে যাওয়ার পর থেকে কেউ তাকে বলেনি, তোমার সম্প্রদায়কে সুদানের অফাদার বানিয়ে দাও। যে সুদানী সালার তার পেছনে ছায়ার মতো লাগা ছিলো, সেও এ যাবত একবারের জন্যও তার সামনে আসেনি।

সূর্য ডুবে গেছে। চারটি ঘোড়া সুদানের রাজধানীতে প্রবেশ করে সোজা সেনা হেডকোয়ার্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আমর দরবেশের জানা আছে, তাকে কোথায় যেতে হবে এবং কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। চিন্তা-চেতনা বিধ্বংসী তৎপরতার প্রশিক্ষণ তিনি এখান থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রক্ষী বাহিনীর কমান্ডারকে সেই সুদানী সালারের নাম বললেন, যে তাকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সালারের বাসভবনে পৌঁছিয়ে দেয়া হলো।

'ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছো নাকি ভালো কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছো।' আমর দরবেশকে দেখেই সুদানী সালার জিজ্ঞেস করে।

'ভালো সংবাদ ওর নিকট থেকে শুনুন'— আমর দরবেশ আশির প্রতি ইশারা করে বললেন— 'আমার বক্তব্যে আপনার বিশ্বাস নাও হতে পারে।'

আশি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বদনে পালংকের উপর ধপাস করে বসে পড়ে। তার দু'ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি হাসি। সে আমর দরবেশকে উদ্দেশ করে বলে- 'বিস্তারিত ঘটনা আপনিই বিবৃত করুন এবং তাড়াতাড়ি করুন। হাতে সময় বেশী নেই।'

'আমাদের মিশন এতো দ্রুত সফল হয়ে গেলো যে, আমি তার কল্পনাও করিনি।' আমর দরবেশ বলেন। তিনি কিভাবে পানিতে আগুন লাগালেন এবং কিভাবে তূর পর্বতের জালওয়া দেখালেন, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

'আর তার কথা বলার ভঙ্গী এতো আকর্ষণীয় ছিলো যে, আমি বিস্মিত হয়ে পড়ি'- আমর দরবেশ সম্পর্কে আশি বললো- 'মানুষ তার ভেল্কিবাজিতে তেমনি প্রভাবিত হয়ে গেছে, যেমনটি হয় তার ভাষায়।'

'আচ্ছা, আমাদের ওখানকার সাফল্যের সংবাদ নিয়ে কি এখনো কেউ আসেনি?' আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করেন।

'না, কেউ আসেনি'- সালার বললো- 'আমি তো তোমাদের চিন্তায় অস্থির ছিলাম।'

শুনে আমর দরবেশ নিশ্চিত হন যে, এখনো কোনো গুপ্তচর এসে পৌঁছেনি। যে সুদানী গোয়েন্দা মুসলমানদের বন্দীদশা থেকে পালিয়ে এসেছিলো, এখনো সে এসে পৌঁছেনি। তার গতি আমর দরবেশের গতি অপেক্ষা শ্লথ। তার এসে পৌঁছতে রাত পার হয়ে যাবে। আমর দরবেশের যা করার উক্ত গোয়েন্দা পৌঁছানোর আগেই শেষ করতে হবে। সে এসে পৌঁছলেই ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবে। আমর দরবেশ তাড়াতাড়ি কার্যসিদ্ধি করে বের হতে না পারলে তাকে আবারও ভয়ংকর পরিণতি বরণ করতে হবে।

'এবার কাজের কথা বলি'- আমর দরবেশ বললেন- 'আমাদের ইসহাককে প্রয়োজন। আমি অর্ধেকেরও বেশী মুসলমানের চিন্তা-চেতনাকে ধোলাই করে ফেলেছি। তাদেরকে আমি সুদানের অফাদার হতে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছি। তাদের অন্তরে আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি। আমি প্রমাণ করে দিয়েছি, সালাহুদ্দীন আইউবী ফেরাউনদের উত্তরসূরী। এখন যদি তাদেরকে তাদের কোনো নেতা বলে দেন যে, তোমাদেরকে সুদানের আনুগত্য করতে হবে, তাহলে উক্ত অঞ্চলের সব মানুষই আপনাদের হয়ে যাবে। আমি তথ্য পেয়েছি এবং আগে থেকে নিজেও জানি, এই জননেতা ইসহাক ছাড়া আর কেউ নয়। সেখানকার মুসলমানরা তাকে পীর-পয়গম্বর বলে মান্য করে।'

'কিন্তু ইসহাককে রাজি করাবে কে'– সুদানী সালার বললেন– 'আমি তাকে এই ভূখণ্ডের ক্ষমতার লোভ দেখিয়েছি। এমন এমন নিপীড়ন করেছি, যা একটি ঘোড়াও সহ্য করতে পারে না। অশিা পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।'

'এবার আমাকে চেষ্টা করে দেখার সুযোগ করে দিন'– আমর দরবেশ বললেন– 'কয়েদখানা থেকে বের করে তাকে সেই কক্ষে পাঠিয়ে দিন, যেখানে তাকে একবার রেখেছিলেন এবং আমাকেও রেখেছিলেন। আপনি তার দুশমন, আমি বন্ধু– সহকর্মী। আমার কথা তাকে ভাবিয়ে তুলবে পারে।'

'আচ্ছা, তা না করে আশিকে দিয়ে আরেকবার চেষ্টা করে দেখবো নাকি?' সুদানী সালার জিজ্ঞেস করে।

'না'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমি তার উপর আমার ভাষার জাদু প্রয়োগ করবো। এখনই যদি আপনি তাকে উক্ত কক্ষে পাঠিয়ে দেন, তাহলে আশা করি ভোর পর্যন্ত আমি তাকে জালে আটকে ফেলতে পারবো। আমার হাতে সময় বেশি নেই। উক্ত এলাকা থেকে আমার অনুপস্থিতি দীর্ঘ না হওয়া উচিত। আপনি তো জানেন, সেখানে মিশরী গোয়েন্দাও আছে। আমি যে জাদু প্রয়োগ করে এসেছি, আমার অনুপস্থিতিতে মিশরী গোয়েন্দারা তা ব্যর্থ করে দিতে পারে।'

সুদানী সালার আমর দরবেশকে তার সঙ্গের কমান্ডো দু'জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আমর বললেন, এরা আমার রক্ষী ও ভক্ত। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আমার সঙ্গে এসেছে।

ইসহাককে একটি মনোরম ও সুদক্ষ কক্ষে নিয়ে আসা হলো। তাকে নিয়ে আসার জন্য সালার নিজে কয়েদখানায় যায়। গিয়ে তাকে বললো– 'তোমার জাতীয় চেতনা ও ঈমানী শক্তিতে আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। তোমার এক বন্ধু আমর দরবেশ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে। আমি চাই, একটি ভালো পরিবেশে তোমাদের সাক্ষাৎ পর্ব অনুষ্ঠিত হোক।'

'কয়েদখানা অপেক্ষা অধিক নোংরা ও কষ্টদায়ক কিংবা তোমার প্রাসাদ অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী ও মনোরম পরিবেশ কোনোটিই আমাকে আমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না'– ইসহাক বললেন– 'আমাকে অন্ধকার পাতাল কক্ষে নিক্ষেপ করো কিংবা বালাখানায় নিয়ে যাও, কোনো অবস্থাতেই আমি আমার ঈমান বিক্রি করবো না।'

সুদানী সালার হেসে পড়ে এবং ইসহাককে সেই কক্ষে নিয়ে যায়,

যেখানে আমর দরবেশ তার অপেক্ষায় বসে আছেন। সালার নিজেও কক্ষে অবস্থান নেয়।

'তোমার চেহারা বলছে, তুমি এই কাফেরদের নিকট নিজের ঈমানটা বিক্রি করে ফেলেছো'– ইসহাক আমর দরবেশকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'তোমার চেহারার রওনক আর চোখের চমক বলছে, তুমি দীর্ঘদিন যাবত কয়েদখানার বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছো। আমার সঙ্গে সাক্ষাতে তোমার উদ্দেশ্য কি?'

'আমি তোমার চেহারায়ও এই রওনক আর চোখে সেই চমক দেখতে চাই, যা তুমি আমার চেহারা ও চোখে দেখতে পাচ্ছো'– আমর দরবেশ বললেন– 'আমাকে একটু সময় দাও। ক্ষণিকের জন্য তোমার হৃদয় ও মস্তিষ্কটা আমাকে দিয়ে দাও। ধৈর্যের সাথে ও শান্তমনে আমার কথা শোনো।'

সুদানী সালার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সে ঝুঁকি মাথায় নিতে চাচ্ছে না। ইসহাক তার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কয়েদী। আমর দরবেশও তার কয়েদী ছিলো। এটা আমর দরবেশের প্রতারণাও হতে পারে। এই দু'জন লোককে সে এমন একটি কক্ষে একাকী ছেড়ে যেতে চাচ্ছে না, যেটি কয়েদখানার নিরাপদ কক্ষ নয়। পাহারার জন্য সে চারজন প্রহরী নিযুক্ত করে দিয়েছে। দু'জন কক্ষের সামনে আর দু'জন পেছনের দরজায়। বর্শা ও তরবারী ছাড়া তাদের কাছে তীর-ধনুকও আছে, যাতে কেউ পালাবার চেষ্টা করলেও সফল হতে না পারে। আমর দরবেশ চাচ্ছেন, সালার এখান থেকে চলে যাক। কিন্তু লোকটা এক পা-ও নড়ছে না। তার উপস্থিতিতে আমর দরবেশ ইসহাককে বলতে পারেন না তার পরিকল্পনা কী।

সুদানী সালার আশিকে খাওয়া-দাওয়ার জন্য এ ভবনেরই অন্য এক কক্ষে পাঠিয়ে দিয়েছে। সালারকে এই কক্ষ থেকে সরিয়ে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলো। কিন্তু আপাতত তার এদিকে আসবার সম্ভাবনা নেই।

যে সুদানী গুপ্তচর পরিস্থিতি জানানোর জন্য ছুটে আসছে, এখন আর সে শহর থেকে বেশী দূরে নয়। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমর দরবেশের দু'কমান্ডো সঙ্গী এই ভবনেরই বারান্দায় তার সংকেতের অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পর আশি বেরিয়ে আসে। পোশাক পরিবর্তন করে এসেছে আশি। রূপ যেনো ঠিক্‌রে পড়ছে তার। সফরের ক্লান্তিও মুখ থেকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সে কমান্ডোদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে যায়।

'সালার চলে গেছেন?' আশি কমান্ডোদের জিজ্ঞেস করে।

'না'– এক কমান্ডো জবাব দেয়– 'তিনি ভেতরে আছেন।'

'তার চলে যাওয়া দরকার।' বলেই আশি কক্ষের দিকে এগিয়ে যায়।

আশিকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে আমর দরবশের মনে আশার সঞ্চার হয়। সুদানী সালার তার প্রতি তাকিয়ে মুচকি একটা হাসি দেয়। সেই হাসি, যে হাসি আশির মতো মেয়েদের প্রতি চোখ পড়লে তার মতো পুরুষদের ওষ্ঠাধর গলে বেরিয়ে আসে।

আশি দুলতে দুলতে বিশেষ এক ভঙ্গিমায় সালারের পেছনে চলে যায়। আমর দরবেশের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকায় সে। আমর দরবেশ সুযোগ পেয়ে যান। তিনি আশিকে ইশারা করলেন, সালারকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলো।

'ইসহাক ভাই!'– আমর দরবেশ জিজ্ঞেস করে– 'আমরা কি সুদানের সন্তান নই?'

'আমরা সর্বাগ্রে ইসলামের সৈনিক'– ইসহাক জবাব দেন– 'আর আমি এখনও মিশরী কমান্ডার ও সুলতান আইউবীর অফাদার। মিশরের ভূখণ্ড যদি আমার মা হয়ে থাকে, তাহলে আমি আমার জননীকে ইসলামের শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারি না। আমর দরবেশ! আমি তোমার ন্যায় ইসলামের মর্যাদা ও নিজের ঈমান বিক্রি করতে পারবো না।'

আশি পেছন থেকে সুদানী সালারের কাঁধে নিজের উভয় বাহু রেখে মুখটা তার কানের সঙ্গে লাগিয়ে বললো– 'দিন কয়েকের মধ্যেই আপনার হৃদয়টা মরে গেছে।'

সুদানী সালার মোড় ঘুরিয়ে তাকালে আশির গাল ও বিক্ষিপ্ত চুলগুলো তার গণ্ডদেশ ছুঁয়ে যায়। আশির মুখে মুচকি হাসি। বললো– 'আমি এতো ঝুঁকিপূর্ণ ও ভয়ংকর মিশন থেকে ফিরে আসলাম, আগামীকাল আবার পাহাড়-জঙ্গলে চলে যেতে হবে, যেখানে পানি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। মদের ঘ্রাণটাও কি আমি ভুলে যাবো?'

'উহ!'– সুদানী সালার চমকে উঠে বললেন– 'আমি তো গল্প শোনায় ব্যস্ত হয়ে তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করছি। তুমি ঐ কক্ষে চলে যাও।'

'নাহ্'– আশি বললো– 'একা একা মজা হবে না। আপনিও চলুন। এখানে কোনো সমস্যা নেই। দু'দিকে সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। প্রয়োজন হলে পরে আবার আসবেন।'

আশি এই বিদ্যায় ওস্তাদ। শৈশব থেকে অদ্যাবধি প্রশিক্ষণই পেয়ে

আসছে। এবার সেই বিদ্যা নিজের বস ও গুরুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। সুদানী সালার তার হাসির ফাঁদে আটকা পড়েছে। লোকটি সবকিছু ভুলে গিয়ে আশির সঙ্গে কক্ষপানে পা বাড়ায়। বাইরে বের হয়ে সে এক কর্মচারীকে মদ আনতে বলে নিজে আশির সঙ্গে কক্ষের দিকে চলে যায়। আশি তাঁকে তার বাহু বেষ্টনীতে নিয়ে নেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ সালারের উপর যুবতী মেয়েটির জাদু ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে মদ এসে গেছে। আশি সালারকে পেয়ালার পর পেয়ালা গেলাতে শুরু করে।

'নিয়ত স্বচ্ছ হলে আল্লাহও সাহায্য করেন'– আমর দরবেশ ইসহাককে বললেন– 'আমার পরিকল্পনা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। বিস্তারিত কথা শহর থেকে বের হয়ে শোনাবো। দু'জন কমান্ডো সঙ্গে এনেছি। দু'-সান্ত্রী এদিকে দাঁড়িয়ে আছে আর দু'জন ওদিকে। আমরা যেদিক দিয়ে বের হবো, সেদিককার সান্ত্রীদের খতম করলেই চলবে। আমাদের চারটি ঘোড়া প্রস্তুত আছে। চারটি প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সান্ত্রীদের, যাতে আমরা পালিয়ে গেলে ধাওয়া করতে পারে। আমাদের ওখানে মিশর থেকে কিছু লোক এসেছেন। একজনকে খুবই বিচক্ষণ মনে হচ্ছে। তিনি নিজের নাম বলেননি। কায়রোতে ওখানকার খবরাখবর পৌঁছে গেছে। সালারকে মেয়েটি নিয়ে গেছে। আমি একটু বাইরের অবস্থাটা দেখে আসি। মেয়েটিকেও সঙ্গে নিতে হবে।'

'কেন?'– ইসহাক জিজ্ঞেস করেন– 'এই বেশ্যাটার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?'

'এখান থেকে বের হয়ে বলবো'– আমর দরবেশ বললেন– 'মেয়েটি মুসলমান।'

আমর দরবেশ কক্ষ থেকে বের হন। সান্ত্রীরা তাকে সুদানী সালারের সঙ্গে এ কক্ষে আসতে দেখেছিলো। সে কারণে তারা তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তিনি তার কমান্ডোদের নিকট গিয়ে বললেন, সান্ত্রীদের সামলানোর সময় এসে গেছে। তারপর সালারের কক্ষের দরজাটা খানিক ফাঁক করে তাকান। সালার মদের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। দরজা খোলার শব্দ পেয়ে মুদিত চোখে মাতাল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'কে?' আশি বললো– 'আমি দেখছি।' বলেই উঁকি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললো– 'বাতাস।' মেয়েটি সালারকে ঠেস দিয়ে পালংকের উপর শুইয়ে দেয়। সালার বাহু এগিয়ে দিয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে

বললো– 'তুমিও আসো। নেশা আরো বাড়িয়ে দাও।'

আশি কিছুই না বলে বিড়ালের ন্যায় পা টিপে টিপে শব্দ ছাড়া দরজা খুলে কক্ষ থেকে বের হয়ে বাইরে থেকে আলতোভাবে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। আমর দরবেশ ও আশি কমান্ডো দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে ইসহাকের কক্ষের দিকে যান।

ইতিমধ্যে সুদানী গোয়েন্দা শহরে ঢুকে পড়েছে। গন্তব্য তার গোয়েন্দা হেডকোয়ার্টার।

আমর দরবেশ দরজার বাইরে দাঁড়ানো সান্ত্রীদের বললেন– 'ভেতরে চলো, কয়েদীকে কয়েদখানায় নিয়ে যাও। সালার নির্দেশ দিয়েছেন, হাত বেঁধে নিতে হবে।'

উভয় সান্ত্রী একসঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দু'কমান্ডো একসঙ্গে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে দু'সান্ত্রীর ঘাড় দু'কমান্ডোর বাহুতে আটকে যায়। কমান্ডোদের খঞ্জর পূর্ব থেকেই বের করা আছে। তারা সান্ত্রীদের হৃদপিণ্ডে আঘাত হানে। সান্ত্রীদ্বয় সাথে সাথেই নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

সুদানী গোয়েন্দা গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। সে এক নায়েব সালারকে রিপোর্ট দিচ্ছে।

আমর দরবেশ ইসহাককে বললেন– 'বেরিয়ে পড়ুন।' বাইরে আটটি ঘোড়া দণ্ডায়মান। চারটি আমর দরবেশের, চারটি সুদানী সান্ত্রীদের। অপর দিকের সান্ত্রীরা টেরই পেলো না, ভেতরে কী ঘটছে। আমর দরবেশ ইসহাককে নিয়ে বেরিয়ে যান।

সুদানী সালারের ভবন ত্যাগ করে তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। গোটা শহর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। পলায়নকারীরা তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হাঁকালো না। আশিও আছে তাদের সঙ্গে। সুদানী সালারের রিপোর্ট শুনে নায়েব সালার তাকে সালারের নিকট নিয়ে যায়। এদিকে আসতে পথে তারা পাঁচটি ঘোড়া যেতে দেখে। পরস্পর কাছাকাছি দিয়েই অতিক্রম করে। কিন্তু অন্ধকারে কেউ কাউকে চিনতে পারেনি।

নায়েব সালার সালারের বাসভবনের সেই বারান্দাটায় এসে এদিক-ওদিক তাকায়, যেখানে একটু আগে দু'জন সান্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলো। কক্ষের দরজা খুলে সে উক্ত সান্ত্রীদের লাশ পড়ে থাকতে দেখে। ভেতরে গিয়ে পেছনের দরজাটাও খুলে। ওদিকে দু'জন সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে

যায়। এক কক্ষে সালার মাতাল অবস্থায় পড়ে থেকে আশিকে ডাকছে। নায়েব সালার তাকে ডেকে তোলে। আশি তাকে পেটপুরে খাইয়ে গেছে। তাকে জানানো হলো, দু'জন সান্ত্রী কক্ষে মৃত পড়ে আছে। এবার তার সম্বিৎ ফিরে পায়। তার কথা বলার ও কথা বুঝার মতো অবস্থা ফিরে আসে যখন, ততোক্ষণে আমর দরবেশ, ইসহাক, দু'মিশরী কমান্ডো ও আশি চলে গেছে বহুদূর। ধাওয়া করা বৃথা।

পরদিন মধ্যরাত আমর দরবেশ কাফেলাসহ পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেন। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর অপেক্ষায় অস্থিরচিত্তে প্রহর গুণছিলেন। এ মুহূর্তে ইসহাক ও আমর দরবেশকে মিশর পাঠিয়ে দেয়া আবশ্যক। কিন্তু তার আগে এ-ও প্রয়োজন যে, তারা অত্র এলাকায় ঘুরেফিরে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন, যাতে মানুষ সুদানীদের যে ভেল্কিবাজি দেখেছিলো, তার হাকীকত পুরোপুরি জানতে পারে। তবে তৎক্ষণাৎ কিছু লোককে নিযুক্ত করা হলো, যাতে সুদানীরা হামলা করলে যথাসময়ে সংবাদ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রয়োজনটি হলো, মিশরী ফৌজের আরো কিছু কমান্ডো সেনাকে এই অঞ্চলে নিয়ে আসা, যাতে সুদানীরা আক্রমণ করলে তারা পেছন দিক থেকে গেরিলা হামলা চালাতে পারে এবং সুদানী ফৌজকে অত্র অঞ্চল থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে।

এভাবে আমর দরবেশ, আলী বিন সুফিয়ান ও তাঁর কমান্ডো সেনারা শত্রুবাহিনী ও জনগণের দৃষ্টির আড়ালে থেকে একটি যুদ্ধ জয় করে ফেলে। এটি ছিলো ব্যক্তিগত লড়াই, যা ঈমান ও জাতীয় চেতনার শক্তিতে লড়া হয়েছিলো। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এই গোপন যুদ্ধ সম্পর্কে সব সময় সজাগ থাকতেন। তাঁর ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থা অত্যন্ত দক্ষ ছিলো।

যে সময়টায় সুদানী মুসলমানগণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করে, ঠিক তখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মুসলিম শাসক গোমস্তগীন, সাইফুদ্দীন ও আল-মালিকুস সালিহ'র সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও ছোট ছোট দুর্গ দখল করে নেন। তিনি হাল্‌বের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, যেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ও আল-মালিকুস সালিহ'র বাহিনীর হেডকোয়ার্টার। সুলতান আইউবী এই শহরটিকে অবরুদ্ধ করার পর অবরোধ তুলে নিয়েছিলেন। সেখানকার মুসলিম অধিবাসীরা এতো কঠিন হাতে তার মোকাবেলা করে যে, সুলতান আইউবী হাঁফিয়ে ওঠেন।

তিন তিনটি মুসলিম বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে সুলতান আইউবী তাদেরকে এমনভাবে পিছু হটিয়ে দেন যে, তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। সুলতান তাদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখেন। তাঁর অধিকতর দৃষ্টি হাল্‌বের বাহিনীর উপর নিবদ্ধ। কেননা, তারা বীর যোদ্ধা। তারা পিছপা হয়ে হাল্‌বের দিকে ফিরে যাচ্ছে। সুলতান আইউবী তাদেরকে পথেই ধ্বংস করে দিতে চাইলেন। কেননা, তাঁর সৈন্যদেরকে হাল্‌ব বাহিনীর পেছনে ধাওয়া করতে বলেননি, বরং তিনি তার বিদ্যুদ্গতিসম্পন্ন বাহিনীটিকে অন্য পথে রওনা করিয়ে কিছু কমান্ডো সেনাকে শত্রু বাহিনীর দু'পার্শ্বে পাঠিয়ে দেন।

হাল্‌বের বাহিনী ছিন্নভিন্নভাবে হাল্‌বের দিকে ছুটে চলেছে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তার কমান্ডাররা দেখতে পেলো, সুলতান আইউবীর সৈন্যরা হাল্‌বের পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে। হাসানের বাহিনী থেকে গেলো। তার সৈন্যদের যুদ্ধ করার মতো মনোবল নেই। তাদের সরঞ্জামও এখন অনেক কম। রসদও অপর্যাপ্ত। এরা থেকে গেলে সুলতান আইউবীর কমান্ডোরা গেরিলা আক্রমণ চালাতে শুরু করে। আইউবীর কমান্ডাররা ঘোষণা দেয়– 'হাল্‌বের সৈন্যরা! তোমরা অস্ত্র ত্যাগ করো।'

সুলতান আইউবী রণাঙ্গন থেকে অনেক পেছনে। তিনি সংবাদ পাচ্ছেন, হাল্‌বের সৈন্যরা অস্ত্র সমর্পণ করার পর্যায়ে এসে যাচ্ছে। তিনি বললেন– 'এই বাহিনীটি যদি খৃস্টানদের হতো, তাহলে আমি তার একজন সৈন্যকেও জীবিত ফিরে যেতে দিতাম না। কিন্তু এটা যে আমার ভাইদেরই বাহিনী। তারা অস্ত্র ত্যাগ করলে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। কিন্তু তারপরও আমি আনন্দ পাবো না। মৃত্যুর পর আমার আত্মা এই ভেবে কষ্ট পাবে যে, আমার শাসনামলে মুসলমানদের তরবারী নিজেদের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলো। আমার এই ভাইয়েরা যদি এখনো বন্ধু-শত্রু চিনতে সক্ষম হয়, তাহলে এই লজ্জাজনক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে।'

আল্লাহ সুলতান আইউবীর দু'আ কবুল করেন। পরদিন-ই তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। তিনি দেখতে পান, দু'জন অশ্বারোহী তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। একজনের হাতে সাদা পতাকা। তাদের ডানে-বাঁয়ে সুলতান আইউবীর ফৌজের দু'জন কমান্ডার। নিকটে এসে ঘোড়া দু'টি থেমে যায়। এক কমান্ডার ঘোড়া থেকে নেমে এসে সালাম করে বললো– 'হাল্‌বের শাসক আস-সালিহ সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এই দূত দু'জন যুদ্ধবিরতি ও সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছে।'

এক দূত বার্তাটি সুলতান আইউবীর হাতে দেয়। সুলতান বার্তাটি পাঠ করে বললেন– 'আস-সালিহকে বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবী যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যখন পয়গাম পাঠিয়েছিলেন, তখন তুমি ফেরাউনের ন্যায় দূতকে অপমান করে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলে। আজ আল্লাহ আমাকে বিজয় আর তোমাকে শোচনীয় পরাজয় দান করেছেন। এখন আমার এতোটুকু শক্তি আছে যে, আমি তোমার বাহিনীকে এমনভাবে পিষে মারতে পারি, যেমনি দু'পাথরের মাঝে গম পেষণ করা হয়। কিন্তু তারপরও আমি মনে করি, আমার শত্রু তোমরা নও। তুমি সেই পিতার সন্তান, যিনি খৃস্টানদেরকে আজীবন তটস্থ রেখেছিলেন। অথচ তুমি কিনা খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে পিতার ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছো। শোন দূত! তাকে বলবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। দু'আ করো, আল্লাহও যেন তোমাদের মাফ করে দেন।'

সুলতান আইউবী কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে আস-সালিহ'র প্রস্তাব মঞ্জুর করে নেন। তিনি এই শর্তে আস-সালিহ'র ফৌজকে হাল্‌ব ফিরিয়ে নেয়ার অনুমতি প্রদান করেন– 'যখন আমার ফৌজ হাল্‌ব আসবে, তখন তোমার ফৌজ আমার ফৌজের মোকাবেলা করতে পারবে না।'

এ সময় আরো একটি মজার ঘটনা ঘটে। আল-মালিকুস সালিহ তার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে যায়। সাইফুদ্দীনও পিছপা হয়ে মসুল চলে গিয়েছিলো। আর গোমস্তগীন নিজ দুর্গ হাররানের পরিবর্তে হাল্‌বের অভিমুখে রওনা হয়। সুলতান তাঁর বাহিনীকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। তুর্কমান নামক স্থানে তিনি অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করেন। একদিন হাল্‌বের এক দূত তাঁর নিকট এসে আল-মালিকুস সালিহ'রর একটি পয়গাম তার হাতে দেন। সুলতান পত্রখানা খুলে পাঠ করে চমকে ওঠেন। কারণ, এ পয়গাম তাঁর প্রতি নয়– সাইফুদ্দীনের প্রতি লেখা। আল-মালিকুস সালিহ সাইফুদ্দীন লিখেছেন–

'আপনার পত্র পেয়েছি। আমি সালাহুদ্দীনের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছি বলে আপনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আপনি যা জেনেছেন, ঠিকই জেনেছেন। কারণ, তাছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলো না। আমার ফৌজ তাঁর ফৌজের ঘেরাওয়ে পড়ে গিয়েছিলো। আমার সৈনিকরা ছিলো পরিশ্রান্ত, সন্ত্রস্ত ও আহত। এমতাবস্থায় আমার সালারগণ পরামর্শ দেয়, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে প্রতারণামূলক সন্ধি করে ফেলুন এবং

আপনার ফৌজকে এই বন-বাদাড় থেকে বের করে নিন। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর এই শর্ত মেনে নিয়েছি যে, তাঁর ফৌজ হাল্‌ব আগমন করলে আমার ফৌজ তাদের প্রতিরোধ করবে না। কিন্তু তিনি যখন আসবেন, তাঁকে অবশ্যই এমন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে, যা তাঁর কল্পনার অতীত। আপনি আপনার বাহিনীকে নতুনভাবে প্রস্তুত করে নিন। আমাদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং তাঁর সকল শক্তি নিঃশেষ করে দিতে হবে।'

পত্রে আরো অনেক কিছু লেখা ছিলো। ঐতিহাসিকগণ একমত যে, আল-মালিকুস সালিহ সত্যিই সুলতান আইউবীকে ধোঁকা দিয়েছিলো এবং সে বিষয়ে সাইফুদ্দীনের পত্রের জবাবে যে বার্তা প্রেরণ করেছিলো, সেটি ভুলক্রমে সুলতান আইউবীর হাতে পৌঁছে ছিলো। দু'জন ইতিহাসবিদ লিখেছেন, 'পত্রখানা খামে ভরে সীলমোহর করার পর ভুলে তার গায়ে সুলতান আইউবীর নাম লেখা হয়েছিলো।' কয়েকজন মুসলিম ঐতিহাসিক- যাদের মধ্যে সিরাজুদ্দীন অন্যতম- লিখছেন, 'সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ব্যবস্থা এতোই শক্তিশালী ছিলো যে, আল-মালিকুস সালিহ'র দূত মূলত তাঁরই গোয়েন্দা ছিলো। ফলে সে আল-মালিকুস সালিহ'র এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি সুলতান আইউবীর হাতে পৌঁছিয়ে দেয়।'

কাজী বাহাউদ্দীন সাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন- 'এই পত্রটি সুলতান আইউবীকে এতো বিচলিত করে তোলে যে, কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেননি। এসময় তিনি তাঁবুতে একাকী পড়ে ছিলেন। তাতে তিনি আনন্দিতও হয়েছেন যে, দুশমনের পরিকল্পনা তিনি জেনে ফেলেছেন। তিনি নির্দেশ দেন, আল-হামারা, দিয়ার ও বকর থেকে এক্ষুণি সেনাভর্তি শুরু করে দাও। সুলতান আইউবী তাঁর মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে আরেকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেন।

সত্য পথের পথিক

নুরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র আল-মালিকুস সালিহ, গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীন গাজী– এই তিন মুসলিম শাসক সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর মোকাবেলায় এসেছেন। ক্রুসেডাররা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তারা তাদেরকে উট-ঘোড়া, মটকা ভর্তি তরল দাহ্য পদার্থ ও অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছে। তারা সুলতান আইউবীকে যুদ্ধের ময়দানেই পরাজিত করা আবশ্যক মনে করে না। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, যে কোন প্রকারে হোক আইউবীকে পরাভূত করা এবং আরব ভূখণ্ড কব্জা করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা।

ফিলিস্তিন খৃস্টানদের দখলে। খৃস্টানরা মুসলমানদের তিনটি দুর্বলতা আঁচ করে নিয়েছে। তাহলো– ক্ষমতার মোহ, সম্পদের লোভ ও নারীর প্রতি আসক্তি। খৃস্টানরা ইউরোপ থেকে এই আশা নিয়ে এসেছিলো যে, তারা তাদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য, অস্ত্র ও নৌ–শক্তির বিনিময়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানদের খতম করে প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস ও খানায়ে কা'বা দখল করে নিবে এবং পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলবে।

ধর্ম এমন কোনো বৃক্ষ নয়, যাকে গোড়া থেকে কেটে দিলে তা শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। ধর্ম একটি গ্রন্থ কিংবা কতগুলো গ্রন্থের স্তূপের নামও নয়, যাকে আগুনে ভষ্মিভূত করে দেয়া যায়। ধর্ম হলো– বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির নাম, যা মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে সংরক্ষিত থাকে এবং মানুষকে নিজের অনুগত করে রাখে। একজন মানুষকে খুন করে ফেললে বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির বিলুপ্তি ঘটে না। একটি ধর্মকে বিলুপ্ত করে দেয়ার উপায় হলো, মন-মস্তিষ্কে বিলাসিতা ও ক্ষমতার মোহ ঢুকিয়ে দেয়া। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির বাঁধন যতো ঢিল হয়, মানুষ ততো স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। ইহুদী ও খৃস্টানরা মুসলমানদের জন্য এ জালই বিছিয়ে রেখেছে। আরব ভূখণ্ড ও মিশরে এই জাল বিছিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসকদের তাতে আটকাতে শুরু করে। মিল্লাতে ইসলামিয়ার দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানরা ক্ষমতা ও নারীর লোভে ঈমান বিসর্জন দিয়ে থাকে।

নুরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহুদ্দীন আইউবীর আমলে এই মধুমাখা বিষ মুসলিম শাসক ও আমীরদের শিরায় ঢুকে পড়েছিলো এবং খৃস্টানরা ফিলিস্তিন দখল করে নিয়েছিলো। কয়েকটি মুসলিম প্রজাতন্ত্র এমন ছিলো যে, সেগুলোর উপর খৃস্টানদের দখল ছিলো না বটে; কিন্তু সেগুলোর শাসকদের হৃদয়ের উপর তাদের কব্জা ছিলো। খৃস্টান ও ইহুদীরা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস করার কাজে এতো সাফল্য অর্জন করেছিলো যে, একজন মুসলিম সালার সম্পর্কেও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব ছিলো না, ইনি সালতানাতে ইসলামিয়ার অফাদার। জঙ্গী ও আইউবীর জন্য এই গাদ্দাররা একটি মহা-সমস্যার রূপ ধারণ করেছিলো। ১১৭৪ ও ১১৭৫ সালে সুলতান আইউবীও ফিলিস্তিনের মাঝে কালেমাগো ভাইয়েরাই অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। খৃস্টনরা দূরে বসে তামাশা দেখছিলো। সুলতান আইউবী প্রতিটি রণাঙ্গনে খৃস্টানদেরকে পরাজয়ের পর পরাজয় উপহার দিয়ে ফিরছিলেন। কিন্তু তারা মুসলিম আমীরদেরকেই আইউবীর মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দেয়। তার সবচেয়ে দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক ঘটনা হলো স্বয়ং নুরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র আল-মালিকুস সালিহ তাঁর ওফাতের পর সুলতান আইউবীর বিরোধী শিবিরে চলে যায়।

১১৭৫ সালের এপ্রিল মাসের ঘটনা। আল-মালিকুস সালিহ'রই এক মিত্র সাইফুদ্দীন গাজী সুলতান আইউবীর হাতে পরাস্ত হয়ে জনৈক ব্যক্তির এক ঝুঁপড়িতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁর অপর এক মিত্র হলো গোমস্তগীন। সুলতান আইউবী এই তিন রাষ্ট্রনায়কের জোট বাহিনীকে এমন লজ্জাজনকভাবে পরাজিত করেন যে, তারা তাদের হেডকোয়ার্টারের সমুদয় মালামাল ফেলে পালিয়ে যায়। সুলতান আইউবীর সৈন্যরা তাদের যেসব সৈন্যকে বন্দী করেছিলো, মুসলমান মনে করে সুলতান তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই উদারতার মাসুল সুলতানকে কড়ায়-গণ্ডায় গুনতে হয়েছে। এই বন্দীরা ফিরে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় সংগঠিত হয়ে যায়।

যুদ্ধের ময়দান থেকে আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন গাজী ও গোমস্তগীনের পলায়ন ছিলো একটি বিস্ময়কর ঘটনা। তাদের একজনের কাছে অপরজনের খবর ছিলো না। গোমস্তগীন ছিলো হাররানের দুর্গপতি, যা ছিলো বাগদাদের খেলাফতের অধীন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা দেয়। রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে সে হাররানের পরিবর্তে আল-মালিকুস সালিহ'র রাজধানী হাল্‌বে চলে গিয়েছিলো। সুলতান আইউবী

ধাওয়া করে ধরে ফেলতে পারেন, এই ভয়ে সে নিজ এলাকা হাররান যাওয়ার সাহস পেলো না।

সাইফুদ্দীন অপর এক শহর মসুল ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের সম্রাট ছিলেন। শুধু সম্রাটই নন, তিনি একজন সেনা অধিনায়কও ছিলেন। রণাঙ্গনের কূটকৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন তিনি। ছিলেন লড়াকু সৈনিক। কিন্তু তিনি নিজের ঈমান বিক্রি করে ফেলেছিলেন, যা কিনা মুমিনের ঢাল-তরবারী। যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত তিনি হেরেমের বাছা বাছা মেয়ে ও নর্তকীদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। মদের মটকা ছাড়াও তার সঙ্গে থাকতো সুন্দর সুন্দর পাখি। এই সকল বিলাস সামগ্রী তিনি রণাঙ্গনে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে পলায়নকারীদের মধ্যে তার নায়েব সালার এবং একজন কমান্ডার ছিলো। যাবেন মসুল। কিন্তু সুলতান আইউবীর গেরিলারা দুশমনের পেছন থেকে ধাওয়া করছিলো। তারা দুশমনের ছত্রভঙ্গ সৈন্যের জন্য পিছু হটাও অসম্ভব করে তুলেছিলো।

সুলতান আইউবীর গেরিলারা সাইফুদ্দীন ও তার সঙ্গীদেরকে সম্ভবত দেখে ফেলেছিলো। তাদের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তারা মসুলের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরেছিলো। অঞ্চলটা কোথাও বালুকাময়, কোথাও পার্বত্য, কোথাও সবুজ-শ্যামল। ফলে লুকাবার জায়গা বিস্তর।

সাইফুদ্দীন এখন মসুল থেকে সামান্য দূরে। গভীর রাত। চাঁদের আলোতে তিনি কয়েকটি ঘর দেখতে পান। তিনি প্রথম গৃহটির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে দরজায় করাঘাত করেন। সাদা শশ্রুমণ্ডিত এক বৃদ্ধ বেরিয়ে আসেন। তার সম্মুখে তিনজন অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে। লোকগুলো হাঁপাচ্ছে। বৃদ্ধ বললেন- 'সম্ভবত তোমরাও মসুলের ফৌজের সৈনিক এবং পালিয়ে এসেছো। দু'দিন যাবত আমি সৈনিকদের এই পথে যেতে দেখছি। তারা এখানে এসে পানি পান করার জন্য দাঁড়ায়। তারপর মসুল চলে যায়।'

'মসুল এখান থেকে কত দূরে?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'তোমাদের ঘোড়ার দেহে যদি দম থাকে, তাহলে রাতের শেষ প্রহর নাগাদ পৌঁছে যাবে'- বৃদ্ধ বললেন- 'এ গ্রামটা মসুলেরই অংশ।'

'আমরা কি রাতটা আপনার এখানে কাটাতে পারি? জায়গা হবে?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'অন্তর প্রশস্ত হলে জায়গার অভাব হয় না'- বৃদ্ধ বললেন- 'ঘোড়া থেকে নেমে এসো, ভেতরে চলো।'

❖❖❖

তিন আগন্তুক একটি কক্ষে গিয়ে বসে। কক্ষে বাতি জ্বলছে। বৃদ্ধ তাদের পোশাক নিরিক্ষা করে দেখেন।

'আমাদেরকে চেনার চেষ্টা করছেন?' সাইফুদ্দীন মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করেন।

'আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা সিপাহী নও'– বৃদ্ধ বললেন– 'তোমাদের পদমর্যাদা সালারের নীচে হবে না।'

'ইনি মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন গাজী'– নায়েব সালার বললেন– 'আপনি যেনতেন লোককে আশ্রয় দেননি। আপনি এর পুরস্কার পাবেন। আমি নায়েব সালার আর ইনি কমান্ডার।'

'আমরা হয়তো আপনার গৃহে অনেকদিন থাকবো'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমরা দিনের বেলা বাইরে বের হবো না, যাতে কেউ জানতে না পারে আমরা এখানে আছি। যদি কেউ জেনে ফেলে, তার শাস্তি আপনাকে ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি আপনি গোপনীয়তা রক্ষা করেন, তাহলে পুরস্কার পাবেন– যা চাইবেন তা-ই দেবো।'

'মসুলের শাসনকর্তাকে আমি আমার আশ্রিত ভাবতে পারি না'– বৃদ্ধ বললেন– 'আপনি বিপদে পড়ে, পথ ভুলে গরীবালয়ে এসে পৌঁছেছেন। যতোদিন ইচ্ছা থাকবেন, আমি আপনার সাধ্যমতো সেবা করবো। আমার এক পুত্র আপনার ফৌজের সৈনিক। আপনাকে আমি অবহেলা করতে পারি না।'

'আমরা তাকে পদোন্নতি দেবো।' নায়েব সালার বললেন।

'আপনি যদি তাকে বাহিনী থেকে অব্যাহতি দান করেন, তবে আমার জন্য তা-ই হবে বড় পুরস্কার।' বৃদ্ধ বললেন।

'ঠিক আছে'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমরা আপনার পুত্রকে অব্যাহতি দিয়ে দেবো। সব পিতাই কামনা করে তার পুত্র বেঁচে থাকুক।'

'না'– বৃদ্ধ বললেন– 'তার শুধু বেঁচে থাকা আমার কাম্য নয়। ফৌজে ভর্তি করিয়ে আমি তাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেছিলাম। আমিও সৈনিক ছিলাম। আমি যখন ফৌজে ভর্তি হই, আপনার তখন জন্মও হয়নি। আল্লাহ আপনার পিতা কুতুবুদ্দীনকে জান্নাত দান করুন। আমি তাঁর আমলে সৈনিক ছিলাম। আমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। কিন্তু আমার ছেলেটাকে আপনি ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করেছেন। আমি তার শাহাদাতের পিয়াসী ছিলাম– অপমৃত্যুর নয়।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী নামের মুসলমান'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'তার

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েযই নয়, ফরযও বটে।'

'জনাব!'– নায়েব সালার বললেন– 'বিষয়টা আপনি বুঝবেন না। আমরা ভালোভাবেই জানি কে মুসলমান, আর কে কাফের।'

'বৎস!'– বৃদ্ধ বললেন– 'বয়সে আপনারা আমার পুত্রের সমান। অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আমার বয়স পঁচাত্তর বছর। আমার পিতা নব্বই বছর বয়সে মারা গেছেন। দাদা পঞ্চাশ বছর বয়সে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছেন। দাদাজান আমার পিতাকে তার আমলের কাহিনী শোনাতেন। পিতার নিকট থেকে আমি সেসব শুনেছি। এই সূত্রে আমি দাবি করতে পারি, আমি যতোটুকু জানি, আপনারা ততোটুকু জানেন না। রাজত্বের মোহ যাকেই পেয়েছে, যে ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়েছে, সে-ই একদিন না একদিন কোনো না কোনো গরীবের ঝুঁপড়িতে গিয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। আপনাদের আগে যারা অতীত হয়েছে, তাদেরও এই একই পরিণতি ঘটেছিলো। আপনাদের তিন তিনটি বাহিনীকে সালাহুদ্দীন আইউবীর একটি মাত্র বাহিনী পরাজিত করেছে। আর তাও এমন শোচনীয়ভাবে যে, আমি তা দু'দিন যাবত অবলোকন করছি। আপনাদের যদি দশটি বাহিনীও থাকতো, তবুও এভাবেই আপনাদের পালাতে হতো। যারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তারাই জয়লাভ করে। কখনো পরাজিত হলে তারা লেজ তুলে পালায় না। তাদের লাশ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুলে নেয়া হয়; তারা আত্মগোপন করে না।'

'তোমাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক মনে হচ্ছে'– সাইফুদ্দীন কিছুটা ক্ষোভ মেশানো কণ্ঠে বললেন– 'তোমার উপর তো আমাদের আস্থা রাখা চলে না।'

'আমি আপনার সমর্থক'– বৃদ্ধ বললেন– 'আমি ইসলামের সহযোগী। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি যে, আপনি আপন ভাইদের শত্রুকে বন্ধু ভেবে বসেছেন। আপনি বুঝতে পারছেন না, তারা আপনার ধর্মের শত্রু। আপনার পরাজয়ের কারণ এটাই। আপনি নিশ্চিন্তে আমার উপর আস্থা রাখুন। সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ যদি আকস্মিকভাবে এখানে এসে পড়ে, আমি আপনাকে লুকিয়ে রাখবো, ধোঁকা দেবো না।'

ইত্যাবসরে একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে খাবার নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। তার পেছনে তদপেক্ষা খানিক বেশি বয়সের আরেক যুবতী। সাইফুদ্দীনের দৃষ্টি প্রথম মেয়েটির উপর নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। তারা খাবার রেখে চলে গেলে তিনি

বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করেন– 'এরা কারা?'

'ছোটটা আমার কন্যা'– বৃদ্ধ জবাব দেন– 'আর বড়টা পুত্রবধূ– আমার সেই ছেলের স্ত্রী, যে আপনার ফৌজে কাজ করছে। আমার মনে হচ্ছে, বউটা আমার বিধবা হয়ে গেছে।'

'আপনার পুত্র যদি মারা যায়, তাহলে আমি আপনাদের বিপুল অর্থ দান করবো'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আর মেয়ের ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না। এই মেয়ে কোনো সৈনিকের স্ত্রী হয়ে কোনো ঝুঁপড়িতে যাবে না। আমি তাকে আমার স্ত্রী হিসেবে পছন্দ করে ফেলেছি।'

'আমি না আমার পুত্রকে বিক্রি করেছি, না কন্যাকে বিক্রি করবো'– বৃদ্ধ বললেন– 'কুঁড়েঘরে লালিত একটি মেয়েকে একজন সৈনিকের কুঁড়ে ঘরেই ভালো মানায়। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, আমাকে প্রলোভন দেখাবেন না। আপনি আমার মেহমান। আমাকে আতিথেয়তার দায়িত্ব পালন করতে দিন।'

'আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনার উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমি এই জন্য আনন্দিত যে, আমার রাজ্যে আপনার ন্যায় স্পষ্টবাদী ও নীতিবান লোক আছে।' সাইফুদ্দীন বললেন।

বৃদ্ধ চলে যান। সাইফুদ্দীন তার সঙ্গীদের বললেন– 'এ ধরনের মানুষ ধোঁকা দেয় না। আচ্ছা, তোমরা কেউ মেয়েটাকে ভালোভাবে দেখেছিলে?'

'চমৎকার এক মুক্তা।' নায়েব সালার বললেন।

'পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হোক, এই মুক্তা আমার হেরেমে যাবে।' সাইফুদ্দীন ক্রুর হাসি হেসে বললেন। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নায়েব সালারকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমরা মসুলের সংবাদ নাও। বাহিনীকে একাট্টা করো। সালাহুদ্দীন আইউবীর তৎপরতা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করো এবং আমাকে তাড়াতাড়ি জানাও, আমি এখনই মসুল চলে আসবো, নাকি আরো অপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে। তারপর কমান্ডারকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আমি কোথায় আছি, হাল্‌ববাসীকে জানিয়ে দাও। নিজে যাও কিংবা কাউকে পাঠাও।'

নায়েব সালার ও কমান্ডার রওনা হয়ে যায়। সাইফুদ্দীন– যিনি মদমত্ত হয়ে রূপসী নারী নিয়ে প্রাসাদে ঘুমাতে অভ্যস্ত– বৃদ্ধের কুঁড়েঘরের এক কক্ষের মেঝেতে শুয়ে পড়েন।

তার একদিন আগের ঘটনা। এক সৈনিক রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে মসুল যাচ্ছিলো। লোকটি কখনো দ্রুতবেগে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে, কখনো ধীরে ধীরে চলছে, আবার কখনো বা দাঁড়িয়ে থাকছে। মাঝে-মধ্যে ঘোড়া থামিয়ে সন্ত্রস্ত মনে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সাধারণ রাস্তা ত্যাগ করে অন্য পথে চলছে সে। স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে, লোকটি ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নিজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। এক স্থানে ঘোড়া থামিয়ে নেমে কেবলামুখী হয়ে লোকটি নামায পড়তে শুরু করে। নামায শেষে দু'আর জন্য হাত তুলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। দু'আ শেষে সেখান থেকে না ওঠে মাথানত করে বসে থাকে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে পরাজয়বরণ করে বাহিনীগুলো যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটে যায়, তখন সুলতান আইউবীর কয়েকজন গুপ্তচর তাদের সঙ্গে মিশে যায়। সুলতান আইউবীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের নিয়মই ছিলো, দুশমন যখন পিছপা হতো, তখন কিছু গুপ্তচর পলায়নপর সৈনিক কিংবা যুদ্ধকবলিত গ্রামগুলোর মুহাজিরদের বেশ ধারণ করে দুশমনের অঞ্চলে চলে যেতো এবং শত্রুপক্ষের পুনর্বিন্যাস, সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এসে তথ্য সরবরাহ করতো।

আল-মালিকুস সালিহ যখন তাঁর দলবলসহ দামেস্ক থেকে পলায়ন করেছিলেন, তখনও বিপুলসংখ্যক গোয়েন্দা ফৌজ ও পলায়নপর নাগরিকদের সঙ্গে চলে গিয়েছিলো। এভাবে সুলতান আইউবী অর্ধেক যুদ্ধ গোয়েন্দা ব্যবস্থার মাধ্যমেই জয় করে নিতেন। গুপ্তচরবৃত্তির জন্য যে লোকদের নির্বাচন করা হতো, তারা অস্বাভাবিক বিচক্ষণ, স্থির ও শান্ত মেজাজের অধিকারী হতো। তারা হতোউপস্থিত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারঙ্গম ও আত্মবিশ্বাসী লড়াকু সৈনিক।

১১৭৫ সালের এপ্রিল মাসে যখন সুলতান আইউবী তাঁর মুসলমান শত্রুদের বাহিনীকে পরাস্ত করেন, তখন তাঁর ইন্টেলিজেন্স প্রধান হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর সুপ্রশিক্ষিত গোয়েন্দাদেরকে দুশমনের ছত্রভঙ্গ বাহিনীতে লুকিয়ে দিয়ে হাল্‌ব, মসুল ও হাররান গিয়ে দুশমনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। তাদের কেউ ছিলো শত্রুসেনার পোশাকে, কেউ সাধারণ পল্লীবাসীর লেবাসে। তাদের এই যাওয়া ছিলো নেহায়েতই জরুরী। কেননা, দুশমন পুনঃ সংগঠিত হয়ে পাল্টা আক্রমণ করবে, এই আশংকা প্রতি মুহূর্তেই বিরাজমান। সুলতান আইউবী দুশমনের যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছিলেন, তাতে তাঁর ধারণা

ছিলো, পুনর্গঠনে দুশমনের বেশ সময় লেগে যাবে।

দুশমনের বাহিনী তিনটি। প্রতি বাহিনীর আকাংখা ছিলো, সুলতান আইউবীকে পরাজিত করে সে সালতানাতে ইসলামিয়ার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও রাজা হয়ে যাবে। তারা পরস্পর বৈরি ভাবাপন্নও ছিলো। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা প্রত্যেকে সুলতান আইউবীকে সকলের শত্রু বিবেচনা করছে। সে কারণে তারা পুনর্গঠিত হয়ে তিনটি বাহিনীকে এক বাহিনীর রূপ দিয়ে পাল্টা আক্রমণ করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

সুলতান আইউবী জানতেন, বিলাস-পাগল মানুষ যুদ্ধের ময়দানে টিকতে পারে না। কিন্তু পাশাপাশি তাঁর এও জানা ছিলো যে, তাঁর শত্রুরা ক্রুসেডারদের সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করছে এবং তাদের কাছে খৃস্টান উপদেষ্টাও রয়েছে। তাছাড়া মুসলিম সালারদের মধ্যে দু'-তিনজন এমন ছিলেন, যারা নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখতো। তন্মধ্যে মুজাফফর উদ্দিন ইবনে যাইনুদ্দীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সুলতান আইউবীর ফৌজের সালার ছিলেন। সেই সূত্রে সুলতান আইউবীর কলাকৌশল তার জানা ছিলো। খৃস্টান উপদেষ্টাবৃন্দ ও মুজাফফর উদ্দীনের ন্যায় সালারগণ সুলতান আইউবীকে অত্যন্ত চৌকান্না করে দিয়েছিলো।

সুলতান আইউবীর ফৌজের অবস্থা সন্তোষজনক হলেও এই মুহূর্তে পুনরায় যুদ্ধ করার অবস্থা তাদের নেই। তারা দুশমনকে পরাজিত করেছিলো বটে; কিন্তু তার জন্য অল্পবিস্তর মূল্যও তাদের পরিশোধ করতে হয়েছিলো। এসব কারণে সুলতান আইউবীর মনে খানিকটা অস্থিরতা বিরাজ করছে। তাঁর একটি সমস্যা এই ছিলো যে, এখন তার কার্যক্রম মূল ঠিকানা থেকে অনেক দূরে। সঙ্গে রসদ আছে ঠিক; কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘ হলে সংকটও দেখা দিতে পারে। সুলতান পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকে সেনাভর্তি শুরু করে দিয়েছিলেন। মানুষ সোৎসাহে ভর্তি হচ্ছিলো। তাদের অধিকাংশ লোক তরবারী চালনা, তীরান্দাজী ও অশ্বারোহনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। কিন্তু নিয়মিত সেনা হিসেবে যুদ্ধ করানোর জন্য তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিলো।

প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি সুলতান আইউবী অগ্রযাত্রাও অব্যাহত রেখেছেন, যাতে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো দখলে চলে আসে। কিছু কিছু অঞ্চলে প্রতিরোধ ছাড়াই তাঁর হস্তগত হয়। তিনি এমন একস্থানে পৌঁছে যান, যেখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সবুজ-শ্যামলিমা আর পানির প্রাচুর্য বিরাজমান। তাঁর ফৌজ ও পশুপাল পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। এখন তাঁর হালে পানি এসে গেছে।

সুলতান আইউবী সেখানেই তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন। পর্যবেক্ষক ইউনিটগুলো বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। গোয়েন্দারা চলে গেছে আগেই। সুলতান আইউবীর নির্দেশ ছাড়াই সব কাজ সম্পাদিত হয়ে যায়। ব্যবস্থাপনা তাঁর এতোই সুশৃংখল যে, মিশন তাঁর মেশিনের ন্যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই যে স্থানটিতে সুলতান আইউবী অবস্থান গ্রহণ করছেন, সেটি তুর্কমান নামে খ্যাত। পুরো নাম হুবাবুত তুর্কমান বা তুর্কমানের কূপ।

'ভর্তি আরো জোরদার করো'– সুলতান আইউবী তাঁর কেন্দ্রীয় কমান্ডের প্রথম কনফারেন্সে বললেন– 'সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণের তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দাও। আল্লাহ তোমাদের উপর করুণা করেছেন যে, তোমাদেরকে তিনি অতিশয় বোকা শত্রুর মুখোমুখি করেছেন। তাদের যদি ন্যূনতম বুঝ-বুদ্ধিটুকুও থাকতো, তাহলে তারা পিছপা হয়ে এখানে সমবেত হতো। যুদ্ধের পশু ও সৈনিকদের জন্য এ স্থানটি জান্নাত অপেক্ষা কম নয়। এখানে তোমাদের পশুগুলো এতো ঘাস খেতে পারবে যে, দশদিন পর্যন্ত আর খাওয়া ছাড়া লড়াই করতে পারবে। আমার বন্ধুগণ! শত্রুকে তুচ্ছ মনে করো না। বাহিনীকে বিশ্রামের সুযোগ দাও। কিন্তু সর্বদা প্রস্তুত অবস্থায় রাখতে হবে। ডাক্তারদের বলে দাও, যেনো তারা রাতে না ঘুমায়। আহতদের খুব দ্রুত সুস্থ করে তুলতে হবে এবং রুগ্নদের দিন-রাত তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। আর স্মরণ রেখো, আমাদের উদ্দেশ্য আপন ভাইদের হত্যা কিংবা তাদের ধিক্কার-সমালোচনা করা নয়। আমাদের গন্তব্য ফিলিস্তিন। আমরা যদি নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধে ব্যস্ত থাকি, তাহলে খৃষ্টানরা তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়ে যাবে। দৃষ্টি ফিলিস্তিনের উপর নিবদ্ধ রাখো এবং পথের প্রতিটি বাঁধা পদদলিত করে এগিয়ে যাও।'

ঠিক এ সময়ই সুলতান আইউবীর নিকট আল-মালিকুস সালিহ'র উক্ত পয়গামটি এসে পৌঁছায়। সুলতান শর্ত সাপেক্ষে সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেন। তাতে তিনি নিশ্চিত হন যে, তাঁর দুশমন অস্ত্র সমর্পণ করেছে। তিনি উদারতা প্রদর্শন করে বন্দি সেনাদেরকে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কেননা, তাঁর মতে তাঁর মুসলিম ভাইয়েরা তাঁর শত্রু নয়। আল-মালিকুস সালিহ'র সন্ধিপত্রে সীল-স্বাক্ষর করার সময়ও সুলতান আইউবী কঠিন কোনো শর্ত আরোপ করেননি। তিনি তার মুসলিম ভাইদেরকে বুঝাতে চাচ্ছিলেন, তোমাদের শত্রু আমি নই– খৃষ্টানরা।

কিন্তু উক্ত বার্তাটি তাকে যে স্বস্তি দান করেছিলো, তা দু'-তিন দিনের বেশী স্থায়ী হয়নি। আল-মালিকুস সালিহ'র অপর এক বার্তা তাকে পুনরায় পেরেশান করে তোলে। তাঁর নামে আসা পত্রখানি খুলে দেখতে পান, সেটি তাঁকে নয়– সাইফুদ্দীন গাজীকে লেখা। দূত ভুলবশত সেটি সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে আসে। পত্রটি প্রমাণ করে, সাইফুদ্দীন আল-মালিকুস সালিহকে লিখেছিলেন, আপনি আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করে ভুল করেছেন এবং তা জোটের অংশীদার শক্তির সঙ্গে প্রতারণার শামিল। তার জবাবে আল-মালিকুস সালিহ লিখেছেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে সন্ধির নামে ধোঁকা দিয়েছি, যাতে তিনি অপ্রস্তুত অবস্থায় পুনরায় আমাদের উপর আক্রমণ না করে বসেন। আমি জানি, সালাহুদ্দীন আইউবীর দৃষ্টি হাল্‌বের উপর। তার বাহিনীও এখনই আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত নয়। আমি কালক্ষেপণের জন্য সন্ধির ফাঁদ পেতেছি। আপনারা নিজ নিজ বাহিনীকে সংগঠিত করে ফেলুন। খৃস্টান উপদেষ্টাগণ আমার বাহিনীকে সংগঠিত ও প্রস্তুত করছে। আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, আমরা এখনই যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত নই।

আল-মালিকুস সালিহ নুরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র। তার বয়স মাত্র তের বছর। নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর প্রশাসন ও ফৌজের স্বার্থপর পদস্থ কর্মকর্তাগণ আল-মালিকুস সালিহকে নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্থলাভিষিক্ত করে তাকে 'সুলতান' অভিধায় ভূষিত করে। তারপর তাকে তাদের ক্রীড়নকে পরিণত করে। সালতানাতে ইসলামিয়া ভেঙ্গে খান খান হতে শুরু করে। সুলতান আইউবী মিশর থেকে দামেস্ক চলে গেছেন। আল-মালিকুস সালিহ ও তার সাঙ্গরা দামেস্ক শহরটিকে দারুস সালতানাত ঘোষণা করে। সাঙ্গপাঙ্গরা আল-মালিকুস সালিহকে ব্যবহার করে চলে। তারা তাদের খৃস্টান উপদেষ্টাদের পরামর্শেই সুলতান আইউবীকে সন্ধির ধোঁকা দিয়েছিলো। কিন্তু বার্তাটি সাইফুদ্দীনের পরিবর্তে সুলতান আইউবীর হাতে এসে পড়ে। এটি সে যুগের ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, দূত ভুলবশত বার্তাটি সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু মুসলিম ঐতিহাসিকগণ– সিরাজুদ্দীন যাদের অন্যতম– দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছেন, 'এই দূত সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা ছিলো।

বার্তাটি সুলতান আইউবীকে পেরেশান করে তোলে। কিন্তু আবেগতাড়িত হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ রওনা ও হামলা করার নির্দেশ দেননি। দুশমনের ন্যায় তাঁকেও তাঁর ফৌজকে সুসংগঠিত করার প্রয়োজন ছিলো। তার দৃষ্টিতে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শত্রুবাহিনীর অবস্থান তাদের মূল ঠিকানার কাছে। আর তিনি তাঁর ঠিকানা থেকে অনেক দূরে। তাঁর রসদ সরবরাহের পথ অনেক দীর্ঘ ও অনিরাপদ। তাছাড়া তিনি এলোপাতাড়ি অগ্রযাত্রার পক্ষপাতী নন। গোয়েন্দাদের নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট ছাড়া তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন না। তদস্থলে তিনি দুশমনকে সম্মুখে এগিয়ে আসবার সুযোগ দিয়ে থাকেন। তাই তিনি হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে বললেন, তুমি আরো কিছু গোয়েন্দা দুমশনের এলাকায় পাঠিয়ে দাও। তারা অতি দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসুক। এসব ছাড়াও তিনি আরো কিছু আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তিনি তার কেন্দ্রীয় কমান্ডকে জানিয়ে দিলেন, তিনি হামলা করবেন না। বরং তিনি দুশমনের আক্রমণ করার সুযোগ দেবেন, যাতে তারা তাদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে দূরে চলে আসে। এসব নির্দেশনার পর তিনি নীরিক্ষা করতে শুরু করেন, দুশমনকে কোন্ স্থানে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা যায়।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মসুলের দিকে যাচ্ছিলো সৈনিকটি। সে সাইফুদ্দীন গাজীর ফৌজের সৈনিক। এই বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক একত্রে পিছপা হয়েছিলো। ক্ষুদ্র দলের সৈনিকরা বিক্ষিপ্ত হয়ে একা একা পলায়ন করছিলো। এই সৈনিকও একাকী পলায়নকারীদের একজন। লোকটি অতিশয় পেরেশান। সে একস্থানে ঘোড়া থামিয়ে নামায পড়ে। তারপর দু'আ করতে করতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শেষ পর্যন্ত দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুজিয়ে বসে থাকে। এভাবে কিছু সময় কেটে যায়। হঠাৎ এক অশ্বারোহী তার সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়ে যায়। সৈনিক কল্পনার জগতে এতোই বিভোর যে, একটি ধাবমান ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি তাকে সজাগ করতে পারেনি। আরোহী ঘোড়া থেকে অবতরণ করে ধীর পায়ে আরো এগিয়ে এসে সিপাহীর মাথায় হাত রাখে। এবার সৈনিক চকিত হয়ে মাথা তুলে উপর দিকে তাকায়।

'আমি জানি, তুমি রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছো'– আরোহী তার পাশে বসতে বসতে বললো– 'কিন্তু তুমি এভাবে বসে আছো কেন? আহত হলে বলো, আমি তোমাকে সাহায্য করবো।'

'আমার দেহে কোন জখম নেই'– সিপাহী জবাব দেয় এবং নিজের বুকের উপর হাত রেখে বললো– 'তবে হৃদয়টা আমার ক্ষত-বিক্ষত।'

আগন্তুক অশ্বারোহী সুলতান আইউবীর সেই গোয়েন্দাদের একজন, যাদেরকে দুশমনের পিছপা হওয়ার সুযোগে শত্রু এলাকায় প্রেরণ করা

হয়েছিলো। লোকটার নাম দাউদ। প্রশিক্ষণ অনুযায়ী সে সৈনিককে গভীরভাবে নীরিক্ষা করতে শুরু করে। বিচক্ষণ গোয়েন্দা বুঝে ফেলে, এই সৈনিক মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং এটা পরাজয়ভীতির প্রতিক্রিয়া। সে সিপাহীর সঙ্গে এমন সব কথা বলে যে, সিপাহী হৃদয়ের সব বাস্তব কথা খুলে বলতে শুরু করে।

'সৈনিকগিরি আমার বংশের পেশা'– সিপাহী বললো– 'আমার পিতা সৈনিক ছিলেন। দাদাও সৈনিক ছিলেন। এই পেশা আমার উপার্জনের মাধ্যম এবং আত্মার খোরাক। আমি আল্লাহ'র সৈনিক। আমি নিজ ধর্ম ও জাতির জন্য লড়াই করি। আমি জানতাম, খৃস্টানরা আমাদের ধর্মের ঘৃণ্যতম শত্রু। আমি এও জানি যে, আমাদের প্রথম কেবলা খৃস্টানদের কব্জায়। আমার পিতা আমাকে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ইতিহাস শুনিয়েছেন। আমি ইসলামী চেতনা নিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে শুনতে শুরু করলাম, সুলতান আইউবী ইসলামের শত্রু, খৃস্টানদের বন্ধু এবং পাপিষ্ট মানুষ। অথচ তার আগে আমরা শুনতাম, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী খৃস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, খৃস্টানরা তাকে ভয় করে এবং তিনি প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাসকে খৃস্টানদের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধ করছেন।'

'আমি আমাদের রাজ্যের শাসক সাইফুদ্দীন গাজীকে সত্য ভেবে আসছিলাম। একদিন আমাদের ফৌজ অভিযানে রওনা হওয়ার নির্দেশ লাভ রে। আমরা এখানে আসলাম। যুদ্ধ হলো। যুদ্ধ চলাকালে জানতে পারলাম, আমরা মুসলমান ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করছি এবং আমাদের প্রতিপক্ষ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ। সে ফৌজের সৈনিকরা আল্লাহু আকবার স্লোগান দিয়ে বলছিলো– 'তোমরা মুসলমান! তোমরা সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করো না। তোমাদের শত্রু আমরা নই। শত্রু তোমাদের খৃস্টানরা। তোমরা পক্ষ ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে চলে আসো। প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করো। তোমরা বিলাসী শাসকগোষ্টির জন্য যুদ্ধ করো না।'

আমি সেই ফৌজের সৈনিকদের হাতে কালেমা খচিত পতাকা দেখেছি। আমি সেই সৈনিকদের যেভাবে যুদ্ধ করতে দেখেছি, তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন– অগ্নিশিখা কোথা থেকে উত্থিত হচ্ছিলো, আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

মৃত্যুর নয়- আল্লাহর ভয়ে আমি এমনভাবে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম যে,

আমার বাহুদ্বয় শক্তিহীন হয়ে পড়লো। আমি তরবারীর ওজনটাও বহন করতে পারছিলাম না। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেললাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কয়েকটি টিলা দেখতে পেলাম। আমি ঘোড়াসহ টিলাগুলোর অভ্যন্তরে ঢুকে লুকিয়ে গেলাম। আমি কাপুরুষ নই। কিন্তু তখন আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিলো। বাইরে দু'পক্ষের তরবারীর সংঘাত চলছিলো। ঘোড়ার ডাক-চিৎকার শোনা যাচ্ছিলো। আমি আহ্বান শুনতে পাচ্ছিলাম– 'রমযান মাসে নিজ ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না।' আমার মনে পড়ে গেলো, আমাদেরকে বলা হয়েছিলো, যুদ্ধের সময় রোযা রাখতে হয় না। আমরা রোযাদার ছিলাম না। আমি বুঝতে পারলাম, সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈনিকরা রোযাদার। ততক্ষণে আমি তাদের তিনজন সৈনিককে হত্যা করে ফেলেছি। তাদের রক্ত আমার তরবারীতে জমাট হয়ে আছে। সৈনিকরা নিজ তরবারীতে রক্ত দেখে আনন্দিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমি আমার তরবারীর প্রতি তাকাতে ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ, আমার তরবারীতে আমার ভাইয়ের খুন লেগে আছে।'

আমার মধ্যে ওখান থেকে বের হওয়ার ও যুদ্ধ করার সাহস ছিলো না। আমি সেখানেই জড়সড় হয়ে লুকিয়ে থাকি। সালাহুদ্দীন আইউবীর এক অশ্বারোহী সৈনিক আমাকে দেখে ফেলে। সে আমাকে বেরিয়ে আসার জন্য হাঁক দেয়। সে আমার প্রতি বর্শা তাক করে। আমি রক্তমাখা তরবারীটা ঘোড়ার পায়ের উপর ফেলে দিয়ে বললাম– 'আমি তোমাদের মুসলমান ভাই। আমি যুদ্ধ করবো না।' ঘোরতর যুদ্ধটা সেখান থেকে খানিক দূরে চলছিলো। এই আরোহী সম্ভবত কমান্ডোসেনা ছিলো এবং লুকিয়ে থাকা শত্রুসেনাদের সন্ধান করছিলো। সে এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো– 'সত্যিই কি তুমি বুঝতে পেরেছো, তুমি প্রকৃত মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করছো?' আমি আমার অপরাধ স্বীকার করে বললাম– 'এই অপরাধ আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে।' সে আমার বর্শাটা নিয়ে নেয়। তরবারী আগেই ফেলে দিয়েছিলাম। সে একদিকে ইঙ্গিত করে বললো– 'আল্লাহর নিকট পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং ওদিকে পালিয়ে যাও। পেছন দিকে তাকাবে না। আমি তোমাকে জীবন দান করলাম।'

'আমার বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় কান্না এসে পড়েছিলো। যুদ্ধের ময়দানে দুশমন জীবন দান করে না। আমি ঘোড়া হাঁকাই এবং তিনি যে পথ দেখিয়েছিলেন, সে পথে ছুটে চলি। পথটা নিরাপদ ছিলো। আমি রণাঙ্গন

থেকে অনেক অনেক দূরে চলে আসি। রাতে এক স্থানে অবতরণ করে শুয়ে পড়ি। যে তিন সেনাকে হত্যা করেছিলাম, তাদের স্বপ্নে দেখি। তাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরছিলো। তারা আমার চার পার্শ্বে ঘোরাফেরা করতে থাকে। তাদের সঙ্গে অস্ত্র ছিলো না। তারা আমার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। ভয়ে আমার গা ছমছম করে ওঠে। আমার জীবনটা বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আমি শিশুর ন্যায় চিৎকার করতে শুরু করলাম। তারপরই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। প্রচণ্ড শীতের রাতে আমার দেহ থেকে ঘাম ঝরতে শুরু করে। আমি ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম। কম্পিত দেহে উঠে ওজু করে নামায পড়তে শুরু করলাম। আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করে।'

আজ তিন-চার দিন যাবত আমি দিগ্বিদিগ ঘুরে ফিরছি। রাতে ঘুমাতে পারি না। দিনে কোথাও শান্তি পাই না। বহু কষ্টে দু'চোখের পাতা বন্ধ করলেই সুলতান আইউবীর সেই তিন সৈনিককে দেখতে পাই, যারা আমার তরবারীর আঘাতে নিহত হয়েছিলো। দিনের বেলা মনে হয় এই বিজন এলাকায় তারা আমার চারপার্শ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে অশ্বারোহী আমাকে টিলার অভ্যন্তরে লুকায়িত অবস্থায় দেখেছিলো, সে যদি আমাকে হত্যা করে ফেলতো, তাহলে ভালো হতো। লোকটা প্রাণভিক্ষা দিয়ে আমার উপর বড় জুলুম করেছে। সঙ্গে তরবারী থাকলে আমি নিজেই নিজেকে খুন করে ফেলতাম। আমি আমার রাসূলের তিনজন মুজাহিদকে হত্যা করেছি।

'তুমি বেঁচে থাকবে'– দাউদ বললো– 'আল্লাহর মর্জিতে তুমি মরবে না। যুদ্ধের ময়দান থেকে তুমি জীবিত বেরিয়ে এসেছো। তোমার সঙ্গে আত্মহত্যা করার কোন অস্ত্র নেই। এতেই প্রমাণিত হয় আল্লাহ তোমার দ্বারা ভালো কোন কাজ নেয়ার জন্য তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ তোমাকে পাপের কাফফারা আদায় করার সুযোগ দিয়েছেন।'

'তুমি বলো, সালাহুদ্দীন আইউবী সম্পর্কে আমাকে যেসব মন্দ কথা শোনানো হয়েছিলো, সেসব সত্য না মিথ্যা?' সিপাহী জিজ্ঞাসা করলো।

'সম্পূর্ণ মিথ্যা'– দাউদ জবাব দেয়– 'সালাহুদ্দীন আইউবী খৃস্টানদের বিতাড়িত করে এই ভূখণ্ডে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন আর সাইফুদ্দীন ও তার দোসররা নিজ নিজ রাজত্ব ধরে রাখার জন্য যুদ্ধ করছে। তারা খৃস্টানদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে নিয়েছে এবং তাদের মদদে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে।'

সালাহুদ্দীন আইউবী কেমন মানুষ এবং কী তার লক্ষ্য, দাউদ বিস্তারিতভাবে

সিপাহীকে অবহিত করে। সে মসুলের শাসক সাইফুদ্দীন সম্পর্কে সিপাহীকে জানালো, লোকটা এতো বিলাসী যে, যুদ্ধের ময়দানে পর্যন্ত তিনি বিলাস-সামগ্রী নিয়ে এসেছিলেন।

'বলো, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর সেই তিন মুজাহিদের রক্তের মূল্য কিভাবে পরিশোধ করবো?'– সিপাহী দাউদকে জিজ্ঞেস করে– 'হৃদয় থেকে এই বোঝা সরাতে না পারলে আমি শান্তি পাবো না। আমি শান্তিতে মরতে পারবো না। তুমি সম্মতি দিলে আমি মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনকে হত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করবো।'

'এতো বড় ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজন নেই'– দাউদ বললো– 'তুমি বললে আমি তোমার সঙ্গী হয়ে যাবো।'

'তুমি কে?' সিপাহী জিজ্ঞেস করে– 'তোমার নাম কী? কোথা থেকে এসেছো, কোথায় যাচ্ছো, কিছুই তো জানা হয়নি।'

'আমার নাম হারিছ। আমার গন্তব্য মসুল'– দাউদ অসত্য বললো– 'সেখানেই আমার বাড়ি। যুদ্ধের কারণে অন্য পথে যাচ্ছি। তোমার বাড়িটা যদি পথে পড়ে, তাহলে সেখানে বেড়াবো।'

'আমার গ্রাম বেশী দূরে নয়'– সিপাহী বললো– 'জোর করে হলেও আমি তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাবো। তুমি আমার বিক্ষত আত্মাকে শান্তি দিয়েছো। এমন ভালো কথা আমি কখনো শুনিনি। আমি বাড়িতেই চলে যাবো। আর কখনো মসুলের ফৌজে যোগ দেবো না। আমি আশা করি, তুমি আমাকে মুক্তির পথ দেখাতে পারবে।'

❖ ❖ ❖

বৃদ্ধের কুঁড়ে ঘরের মেঝেতে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন। একটানা কয়েক রাত জাগ্রত থাকার পর তিনি এখন এতো গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছেন যে, গৃহের বাইরের দরজার করাঘাতেও তার চোখ খোলেনি। রাতের অর্ধেকটা কেটে গেছে। বৃদ্ধ গৃহকর্তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তার কন্যা এবং পুত্রবধূও জেগে ওঠেছে। বৃদ্ধ বিরক্ত কণ্ঠে বললেন– 'মনে হচ্ছে, সালাহুদ্দীন আইউবীর তাড়া খেয়ে মসুলের আরো কোনো কমান্ডার কিংবা সিপাহী এসেছে। রাস্তার পাশে বাড়ি না হওয়াই ভালো।'

বৃদ্ধ দরজা খুললেন। বাইরে দু'টি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। আরোহীগণ আগেই নেমে গেছে। হারিছ সালাম দিয়ে এগিয়ে গেলে বৃদ্ধ তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন– 'বাবা! আমি এই জন্য আনন্দিত যে, তুমি হারাম মৃত্যু থেকে বেঁচে

এসেছো। অন্যথায় আমাকে জীবনভর শুনতে হতো, তোমার পুত্র ইসলামী ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো।' বৃদ্ধ পুত্রের সঙ্গী দাউদের সঙ্গে মুসাফাহা করে কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

দাউদ কথা বলতে উদ্যত হলে বৃদ্ধ ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে তাকে থামিয়ে দেন। পরে তার কানের কাছে গিয়ে বললেন– 'তোমাদের রাজা ও প্রধান সেনাপতি সাইফুদ্দীন ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। তোমরা ঘোড়াগুলোকে একদিকে নিয়ে বেঁধে রেখে ভেতরে চলে এসো। কোনো শব্দ হয় না যেন।'

'সাইফুদ্দীন?'– হারিছ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে– 'তিনি এখানে কীভাবে আসলেন?'

'পরাজয়বরণ করে'– বৃদ্ধ ফিসফিস করে বললেন– 'তোমরা ভেতরে চলো।'

ঘোড়াগুলোকে এদিকে সরিয়ে নিয়ে আড়ালে বেঁধে রাখা হলো। বৃদ্ধ দাউদ ও হারিছকে ভেতরে নিয়ে যান। হারিছ-ই তার সেই পুত্র, যার কথা তিনি সাইফুদ্দীনকে বলেছিলেন। হারিছ পিতার নিকট দাউদকে পরিচয় করিয়ে দেয়– 'এর নাম দাউদ। এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বিতীয়জন হতে পারে না।'

'তোমরাও কি পালিয়ে এসেছো?' বৃদ্ধ দাউদকে জিজ্ঞেস করেন।

'আমি সৈনিক নই'– দাউদ জবাব দেয়– 'আমি মসুল যাচ্ছি। যুদ্ধ আমাকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। পথে হারিছকে পেয়ে তার সঙ্গ নিলাম।'

'বলুন, মসুলের শাসনকর্তা আমাদের ঘরে কীভাবে আসলেন?' হারিছ পিতাকে জিজ্ঞেস করে।

'আজ রাতে এসেছে'– বৃদ্ধ জবাব দেয়– 'তার সঙ্গে এক নায়েব সালার ও একজন কমান্ডার ছিলো। তাদেরকে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার কানে যে শব্দগুলো এসেছে, তাহলো, বাহিনীকে একত্রিত করো, তারপর আমাকে জানাও, আমি মসুল আসবো নাকি কিছুদিন লুকিয়ে থাকবো। আমি সেসময় কক্ষের দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'তাদের কথাবার্তা থেকে কি আপনি এই বুঝেছেন যে, মসুলের ফৌজকে একত্রিত করে তিনি এখনই পুনরায় যুদ্ধ করতে চান?' দাউদ জিজ্ঞেস করে।

'লোকটা এখানো এতোই সন্ত্রস্ত যে, আমাকে বলছিলেন, কেউ যেনো টের না পায়, আমি এখানে আছি'– বৃদ্ধ জবাব দেন– 'আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা তার অবশ্যই আছে। কমান্ডারকে তিনি মসুলের স্থলে অন্য একদিকে প্রেরণ করেছেন।'

'আমি তাকে খুন করে ফেলবো'– হারিছ বললো– 'লোকটা মুসলমানকে

মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত করেছে। তারই চক্রান্তে এক আল্লাহু আকবার ধ্বনি দানকারী অপর আল্লাহু আকবার ধ্বনি দানকারীর রক্ত ঝরিয়েছেন। লোকটা আমাকে পাগল বানিয়েছে।'

হারিছ ক্ষোভে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। দেয়ালের সঙ্গে তার পিতার তরবারীটা ঝুলছিলো। ঝট করে সেটা হাতে নিয়ে নেয়।

পেছন থেকে বৃদ্ধ ছেলেকে ঝাপটে ধরে। দাউদ তার বাহু ধরে ফেলে। হারিছ আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ পিতা তাকে বললো– 'আগে আমার কথা শোনো। তারপর যা খুশী করো।' দাউদও তাকে থামিয়ে বললো, 'এ জাতীয় কাজ করার আগে ভেবে নিলে ভালো হয়। আমরা তাকে খুন করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো। কিন্তু তার আগে নিজেরা যুক্তি-পরামর্শ করে পরিকল্পনা ঠিক করে নিতে হবে।'

পিতা ও বন্ধু দাউদের কথায় হারিছ আপাতত নিবৃত্ত হয়েছে বটে; কিন্তু তার তর্জন থামেনি। ক্ষোভের আতিশয্যে তার চোখ দু'টো রক্তজবার ন্যায় লাল হয়ে ওঠেছে।

'তাকে হত্যা করা কঠিন কাজ নয়'– বৃদ্ধ তার ক্ষুব্ধ পুত্রকে বসিয়ে বললেন– 'তিনি গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। এখন আমার এই শক্তিহীন বাহুও তাকে হত্যা করতে পারবে। তার লাশটাও লুকিয়ে ফেলা সম্ভব। কিন্তু তার যে দু'জন সঙ্গী চলে গেছে, তারা আমাদেরকে ছেড়ে দেবে না। তারা সন্দেহভাজন হিসেবে আমাদেরকে গ্রেফতার করবে। তোমার যুবতী স্ত্রী ও তরুণী বোনের সঙ্গে অসদাচরণ করবে। আমরা যদি বলি, তিনি মসুল চলে গেছেন, তারা বিশ্বাস করবে না। কারণ, তিনি তাদেরকে এখানে আসতে বলেছেন।'

'মনে হচ্ছে, আপনি সাইফুদ্দীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করছেন'– হারিছ বললো– 'আপনি মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের লড়াইকে বৈধ মনে করছেন।'

'এখানে এসে ওঠার পর আমি তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, আমি তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করি না'– বৃদ্ধ বললেন– 'নিজের ঘরে তাকে হত্যা না করার এও একটি কারণ। তিনি আমাকে বলেছেন, তোমাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক বলে মনে হচ্ছে। তিনি আমাকে এই প্রলোভনও দিয়েছেন যে, তোমার পুত্র যদি যুদ্ধে নিহত হয়, বিনিময়ে আমাকে প্রচুর অর্থ দান করবেন। আমি তাকে বলেছি, আমি পুত্রের শাহাদাত কামনা করি– অন্যায় পথে মৃত্যু কিংবা অর্থ নয়। সাইফুদ্দীন আমার মনোভাব বুঝে ফেলেছেন। এখন যদি আমরা তাকে হত্যা করে লাশ গুমও করে ফেলি, তবু তার নায়েব এসে নির্দ্বিধায়

আমাকে ধরে ফেলবে এবং বলবে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক বলে মসুলের শাসনকর্তাকে হত্যা করেছো।'

'দাউদ ভাই!'– হারিছ দাউদকে উদ্দেশ করে বললো– 'তুমিই বলে দাও, আমি কী করবো। তুমি আমার আবেগময় অবস্থাটা দেখেছো। তুমি বলেছিলে, আল্লাহ আমাকে আমার গুনাহের কাফফারা আদায় করার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেই শাসনকর্তাকে খুন করা, যিনি হাজার হাজার মুসলমানকে মুসলমানদের হাতে খুন করিয়েছেন। আমি তোমাকে বুদ্ধিমান লোক মনে করি। ভেবে-চিন্তে তুমি আমাকে সঠিক পরামর্শ দাও।'

'এই একজন মানুষকে হত্যা করলে কিছু অর্জিত হবে না'– দাউদ বললো– 'তার সাঙ্গপাঙ্গরা আছে, তারা হাল্‌বেও আছে, হাররানেও আছে। তাদের অনেক সালার আছে। আছে তাদের তিন-তিনটি ফৌজ। কাজেই সাইফুদ্দীন খুন হলেই তারা সালাহুদ্দীন আইউবীর সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করবে না। অস্ত্র সমর্পণ করার জন্য পন্থাও আছে। তা হলো, এদেরকে যুদ্ধের ময়দানে এমনভাবে অসহায় করে ফেলতে হবে, যেনো তারা অস্ত্র সমর্পণ করতে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর শর্ত সম্পূর্ণ মেনে নিতে বাধ্য হয়।'

'এ কাজটা সালাহুদ্দীন আইউবী ছাড়া আর কে করতে পারেন'– হারিছ বললো– 'আমার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলে উঠেছে, তা কিভাবে নিভবে? ইসলামের তিনজন মুজাহিদের রক্তের প্রায়শ্চিত্ত আমি কীভাবে আদায় করবো?'

মসুলের শাসনকর্তাকে এখানে পেয়ে গেছে বলে দাউদ বেজায় খুশি। হারিছ ও তার পিতাকে নিজের গোয়েন্দা পরিচয়টা দিতে ইতস্তত করছে সে। আবেগ-তাড়িত হয়ে গোয়েন্দারা নিজের পরিচয় ফাঁস করে না। কিন্তু এ মুহূর্তে পরিচয় গোপন রেখে তার কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। তার সিদ্ধান্ত, সাইফুদ্দীন যেখানে যাবে, সে তার পিছু নেবে এবং তার তৎপরতা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবে। কিন্তু ততোদিন পর্যন্ত হারিছের ঘরে অবস্থান করাও সম্ভব মনে হচ্ছে না। তার পিতা-পুত্রের সাহায্যের প্রয়োজন। তাই পরিকল্পনা ঠিক করে সে মোতাবেক কথাবার্তা বলতে শুরু করে দাউদ।

'আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে এমন একটা পন্থা বলে দেই, যার ফলে সাইফুদ্দীন ভবিষ্যতে উঠে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলবে, তাহলে কি আপনি আমার সঙ্গ দেবেন?' দাউদ হারিছের পিতাকে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি যদি আমার পুত্রের ন্যায় আবেগতাড়িত হয়ে না ভাবো, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে আছি।' হারিছের পিতা বললেন।

'আমি কিন্তু খুন ছাড়া আর কোন পরিকল্পনার কথা শুনতে প্রস্তুত নই।' হারিছ বললো।

'আপনারা যদি নিজেদের বিবেক ও আবেগের লাগাম আমার হাতে তুলে দেন, তাহলে আপনাদের হাতে আমি এমন কাজ করাবো, যা আপনাদের আত্মাকে শান্তিতে ভরে দেবে।' দাউদ গম্ভীর দৃষ্টিতে পিতা-পুত্রের প্রতি তাকায়। হারিছের স্ত্রী ও বোন খানিক দূরে বসে তাদের কথোপকথন শুনছিলো। দাউদ তাদের প্রতিও গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে বললো- 'আমাকে একখানা কুরআন দিন।'

হারিছের বোন উঠে গিয়ে একখানা কুরআন হাতে নিয়ে তাতে চোখ লাগিয়ে চুমো খেয়ে এনে দাউদের দিকে এগিয়ে দেয়। দাউদ কুরআনখানা হাতে নিয়ে তাতে চুম্বন করে। তারপর কুরআন খুলে একস্থানে আঙ্গুল রেখে পড়তে শুরু করে, যার মমার্থ হলো ঃ

'শয়তান তাদেরকে তাদের কব্জায় নিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহর স্মরণ তাদের মস্তিষ্ক থেকে উদাও হয়ে গেছে। ওরা শয়তানের দল। তোমরা শুনে রাখো, শয়তানের দলের ক্ষতি অবধারিত। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা লাঞ্ছিত হবে।'

কুরআন খোলামাত্র সূরা হাশরের এই আঠার ও ঊনিশতম আয়াত দু'টি বেরিয়ে আসে। দাউদ বললো- 'এটি আল্লাহ পাকের বাণী। আমি নিজের মর্জিতে এই পাতাটা খুলিনি। এই আয়াতগুলো আপনা আপনি আমার সামনে এসে পড়েছে। এটি আল্লাহ পাকের ঘোষণা ও তাঁর সুসংবাদ। কুরআন আমাদেরকে বলে দিয়েছে, এরা শয়তানের সৈনিক। কুরআন ঘোষণা করেছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা লাঞ্ছিত হবে। কিন্তু তারা ততোক্ষণ পর্যন্ত লাঞ্ছিত হবে না, যতোক্ষণ না আমরা চেষ্টা চালিয়ে তাদের অপমানের পথ সৃষ্টি করবো। তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করা আমাদের কর্তব্য।'

দাউদ কুরআনখানা দু'হাতের তালুতে রেখে সম্মুখে এগিয়ে ধরে বললো- 'আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ডান হাতখানা এই কুরআনের উপর রেখে বলুন, আমরা আমাদের গোপনীয়তা ফাঁস করবো না এবং দুশমনকে পরাজিত করতে নিজের জীবন কুরবান করে দেবো।'

সকলেই- যাদের মধ্যে দু'জন মহিলাও রয়েছে- কুরআনের উপর হাত রেখে শপথ করে। কুরআন তাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা তাদের

চেহারায় ভেসে ওঠে। কক্ষে পিনপতন নীরবতা নেমে আসে। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়া নেই। দাউদ প্রতিক্রিয়াটা গভীরভাবে লক্ষ্য করে।

'আপনারা কুরআনে হাত রেখে শপথ করেছেন'– দাউদ বললো– 'আল্লাহ্ তাআলা কুরআনকে আপনাদের ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। এই পবিত্র গ্রন্থটির প্রতিটি শব্দ আপনারা বুঝেন। কৃত অঙ্গীকার থেকে যদি আপনারা সরে যান, তাহলে তার শাস্তিও কুরআনে লেখা আছে। তখন আপনারা সেই লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার হবেন, যা শয়তানের বাহিনীর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।'

'তুমি কে?' বৃদ্ধ বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'তোমাকে তো বড় আলেম বলে মনে হচ্ছে।'

'আমার মধ্যে কোন ইলম নেই'– দাউদ বললো– 'আমার নিকট আছে আমল। আমি কুরআনের নির্দেশে জীবন হাতে নিয়ে এ পর্যন্ত এসেছি। এই পাঠ আমাকে কোনো আলিম নয়, সালাহুদ্দীন আইউবী শিক্ষা দিয়েছেন। মসুলের নয়, আমি দামেস্কের বাসিন্দা। আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রেরিত গোয়েন্দা। এই সেই গোপন তথ্য, যা ফাঁস করবেন না বলে আপনারা শপথ করেছেন। আমাকে আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাকে নিশ্চয়তা দিন, আমি যা বলবো, আপনারা বিনা বাক্য ব্যয়ে তা পালন করবেন।'

'আমরা শপথ করেছি'– বৃদ্ধ বললেন– 'তুমি তোমার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা ব্যক্ত করো।'

'আল্লাহ্ আমার প্রতি মুখ তুলে তাকিয়েছেন'– দাউদ বললো– 'যার পক্ষ থেকে তথ্য বের করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট পৌঁছানোর কথা, তিনি এখন সেই ছাদের তলে শায়িত, যে ছাদের নীচে আমি বসা আছি। মহান আল্লাহ্ ফেরেশতাদের মাধ্যমে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আমাকে জানতে হবে, সাইফুদ্দীন ও তার বন্ধুদের পরিকল্পনা কী? তারা যদি পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে সংকল্পবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে প্রস্তুতি গ্রহণের আগেই কিংবা প্রস্তুতি গ্রহণ অবস্থায় ধ্বংস করে দিতে হবে। সময়ের আগেই তাদের পরিকল্পনা জানতে হবে। হতে পারে, সুলতান আইউবী প্রস্তুত থাকবেন না আর এরা হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে। আপনারা জানেন, এমনটি হলে পরিণতি কী হবে।'

'যারা প্রতারণার মাধ্যমে নিজেদের বাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায়, আমি তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি পেতে পারি কী?' হারিছ জিজ্ঞেস করে।

‘শোন বন্ধু!’ দাউদ বললো– ‘কোনো কোনো পরিস্থিতিতে হাতের কাছে পেয়েও শত্রুকে বধ না করা কল্যাণকর হয়ে থাকে। প্রতিটি কদম তোমাকে বুঝে-শুনে ঠাণ্ডা মাথায় ফেলতে হবে। সাইফুদ্দীনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাকে ধাওয়া করতে হবে। ইনি এখানে এসে যেভাবে আত্মগোপন করেছেন, তেমনি আমি ও হারিছ লুকিয়ে থাকবো এবং দেখবো লোকটা কী করে।’

উক্ত গৃহের এক কক্ষে গভীর নিদ্রায় শুয়ে আছেন সাইফুদ্দীন। ভোর হলো। বৃদ্ধ উঁকি দিয়ে তাকান। সাইফুদ্দীন এখনো শুয়ে আছেন। সূর্যটা বেশ উপরে উঠে আসার পর তার চোখ খোলে। হারিছের বোন ও স্ত্রী তার সম্মুখে নাস্তা এনে হাজির করে। তিনি হারিছের বোনের প্রতি কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন– ‘তোমরা আমাদের যে সেবা করেছো, আমরা তার এমন প্রতিদান দেবো, যা তোমরা কল্পনাও করোনি। আমরা তোমাদেরকে অট্টালিকায় রাখবো।’

‘আমরা যদি আপনাকে এই ঝুপড়িতেই রেখে দেই, তাহলে কি আপনি খুশি হবেন না?’ মেয়েটি হেসে জিজ্ঞেস করে।

‘আমরা বনে-জঙ্গলেও থাকতে পারি’– সাইফুদ্দীন বললেন– ‘কিন্তু তোমরা তো ফুল দ্বারা সাজিয়ে রাখার মতো বস্তু।’

‘আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনার কপালে পুনরায় মহলে যাওয়া লেখা আছে?’ মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

‘এমনটা বলছো কেন?’ সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করে।

‘আপনার অবস্থা দেখে’– মেয়েটি বললো– ‘রাজার ঝুপড়িতে আত্মগোপন করা প্রমাণ করে তার রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তার বাহিনী তাকে ত্যাগ করেছে।’

‘ফৌজ আমার সঙ্গ ত্যাগ করেনি’– সাইফুদ্দীন বললেন– ‘আমি একটুখানি বিশ্রাম নেয়ার জন্য এখানে যাত্রাবিরতি দিয়েছি। মহল শুধু আমার নসীবেই নয়, তোমাদেরও ভাগ্যে লেখা আছে। যাবে না আমার সঙ্গে?’

হারিছের স্ত্রী কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। বোন সাইফুদ্দীনের কাছে বসে কথা বলতে শুরু করে– ‘আপনার স্থলে যদি আমি হতাম, তাহলে সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত না করে মহলের নামও উচ্চারণ করতাম না। আপনি যদি আমাকে পছন্দ করেই থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি,

আপনার এই পলায়ন ও আত্মগোপন করা আমার মোটেই পছন্দ নয়। যুদ্ধকুশলী রাজার ন্যায় বেরিয়ে পড়ুন। বাহিনীকে একত্রিত করুন এবং সুলতান আইউবীর উপর হামলা করুন।'

মেয়েটি সরল প্রকৃতির মানুষ। তবে তার সরলতায় সৌন্দর্য আছে। সাইফুদ্দীন বিমোহিত নয়নে তার প্রতি তাকিয়ে আছে। ঠোঁটে তার মুচকি হাসি। সেই হাসিতে যেমন আছে ভালোবাসা, তেমনি কু-পরিকল্পনাও।

'আমি রাজকন্যা নই'- মেয়েটি বললো- 'এই পার্বত্য এলাকায় জন্ম এবং এখানেই বড় হওয়া। আমি সৈনিকের কন্যা, সৈনিকের বোন। আপনার সঙ্গে আমি প্রাসাদে নয়, যুদ্ধের ময়দানে যাবো। আপনি কি আমার সঙ্গে তরবারী চালনার প্রতিযোগিতা করবেন? পাহাড়ের নীচ থেকে উপরে, উপর থেকে নীচে আমার সঙ্গে ঘোড়া দৌড়াবেন?'

'তুমি শুধু রূপসীই নও, যোদ্ধাও'- সাইফুদ্দীন মেয়েটির মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন- 'এমন মায়াবী চুল আমি এই প্রথম দেখলাম।'

মেয়েটি সাইফুদ্দীনের বেয়াড়া হাতটা সযত্নে সরিয়ে দিয়ে বললো- 'চুল নয়, বাহু। এই মুহূর্তে আপনাকে চুলের নয়, আমার বাহুর প্রয়োজন। আমাকে বলুন, আপনার ইচ্ছে কী?'

'তোমার পিতা একজন ভয়ংকর মানুষ'- সাইফুদ্দীন বললেন- 'তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সমর্থক এবং সম্ভবত আমাকে পছন্দ করেন না। আমার আশংকা, তিনি আমাকে ধোঁকা দেবেন।'

'আব্বাজান বৃদ্ধ মানুষ'- মেয়েটি মুখে হাসি টেনে বললো- 'আপনার সঙ্গে তিনি কী কথা বলেছেন, তা অবশ্য আমার জানা নেই। আমাদের সামনে তো আপনার ভূয়সী প্রশংসাই করলেন। তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর নামটাই শুনেছেন। তার সম্পর্কে আর কিছু জানেন না। আপনার তাকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। একজন দুর্বল বৃদ্ধ মানুষ আপনার কিইবা ক্ষতি করতে পারবে। আপনি আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন।'

সাইফুদ্দীন মেয়েটির প্রতি হাত বাড়ায়। মেয়েটি পেছনে সরে গিয়ে বলতে শুরু করে- 'আপনাকে আমি আমার দেহ থেকে বঞ্চিত করবো না। নিজেকে আপনার হাতে তুলে দেবো। কিন্তু তখন দেবো, যখন আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করে ফিরে আসবেন। এ মুহূর্তে আপনি বিপদগ্রস্ত। আপাতত আমার থেকে দূরে থাকুন। বলুন, আপনার পরিকল্পনা কী?'

সাইফুদ্দীন বিলাসী ও নারীপূজারী পুরুষ। রূপসী নারী তার জন্য

অভিনব কিছু নয়। কিন্তু এই মেয়েটির মধ্যে বিস্ময়কর যে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করলেন, তাহলো মেয়েটি তার সম্মুখে অবনত হচ্ছে না। এর আগে তো যে কোনো মেয়ে প্রশিক্ষিত জন্তুর ন্যায় তার আঙ্গুলের ইশারায় নেচে বেড়াতো। কিন্তু এই মেয়েটি তার উপর এমনভাবে আঘাত হানলো যে, তার আত্মমর্যাদা জেগে ওঠেছে।

'শোন রূপসী'– সাইফুদ্দীন বললো– 'তুমি আমার পৌরুষের পরীক্ষা নিতে চেয়েছো। শপথ নিলাম, আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমার গায়ে হাত দেবো না, যতোক্ষণ না সালাহুদ্দীন আইউবীর তরবারী আমার হাতে চলে আসবে এবং আমি তার ঘোড়ায় সওয়ার হবো। আমাকে ওয়াদা দাও, তুমি আমার কাছে চলে আসবে।'

'আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে চলুন।' মেয়েটি বললো।

'না'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমাকে এখনো বাহিনী প্রস্তুত করতে হবে। আমি এক ব্যক্তিকে মসুল পাঠিয়ে দিয়েছি। তাকে বলে পাঠিয়েছি, তোমরা ফৌজকে একত্রিত করো এবং অবিলম্বে সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর আক্রমণ করো, যাতে তিনি আমাদের শহর অবরোধ করতে আসতে না পারেন। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার প্রেরিত উভয় ব্যক্তি ফিরে আসার কথা। তখন জানা যাবে, হাল্‌ব ও হাররানের ফৌজ কী অবস্থায় আছে। আমরা পরাজয় মেনে নেবো না। পাল্টা আক্রমণ করবো এবং অবিলম্বে করবো।'

সাইফুদ্দীন এখন ব্যক্তিত্বহারা মানুষ। নারীপূজা ও ঈমান বিক্রি তার চরিত্রকে এমনই ফোকলা করে দিয়েছে যে, সহজ-সরল একটি মেয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের গোপন তথ্য ফাঁস করতে শুরু করেছে। মেয়েটি তার হাতে চুমো খেয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

❖ ❖ ❖

'সাইফুদ্দীনের সঙ্গে যে লোকটি এসেছিলো, তাদের একজনকে তিনি মসুল পাঠিয়ে দিয়েছেন, অপরজনকে হাল্‌ব'– হারিসের বোন পিতা, ভাই ও দাউদকে বললো– 'তাঁর পরিকল্পনা হচ্ছে, তিনটি বাহিনীকে একত্রিত করে অবিলম্বে সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করা, যাতে তিনি অগ্রসর হয়ে শহর অবরোধ করতে না পারেন। যে দু'ব্যক্তিকে তিনি প্রেরণ করেছেন, তারা এসে জানাবে, ফৌজ যুদ্ধ করার অবস্থায় আছে কিনা।'

সাইফুদ্দীন হারিছের বোনকে যা যা বলেছেন, মেয়েটি তার পিতা, ভাই হারিছ ও দাউদকে সব শোনায়।

মেয়েটির নাম ফাওজিয়া। গাঁয়ের সরজ-সরল মেয়ে। আল্লাহ্ তাকে দিয়ানত ও জযবা দান করেছেন। দাউদ তাকে সাইফুদ্দীনের বক্ষ থেকে তথ্য বের করার দায়িত্ব অর্পন করেছিলো। কৌশলও বুঝিয়ে দিয়েছিলো মেয়েটিকে। বলেছিলো, লোকটা বিলাসী ও অসৎ। তাই তার ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। ফাওজিয়া অত্যন্ত চমৎকারভাবে কর্তব্য পালন করে। সে সাইফুদ্দীনের হৃদয় থেকে যেসব তথ্য বের করে এনেছে, তাতে দাউদ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সাইফুদ্দীনের পিছু নেয়া আবশ্যক।

মধ্যরাতের খানিক আগে বৃদ্ধের চোখ খুলে যায়। তিনি দরজায় করাঘাতের শব্দ ও ঘোড়ার হেষ্রাধ্বনি শুনতে পান। শয্যা ত্যাগ করে উঠে দরজা খোলেন। বাইরে সাইফুদ্দীনের নায়েব সালার দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ তার ঘোড়াটা একদিকে সরিয়ে নিয়ে যান। নায়েব সালার ভেতরে চলে যায়। বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করে নায়েব সালারের খাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞেস করে। নায়েব সালার প্রযোজন নেই বলে জবাব দেয়। বৃদ্ধ তার সঙ্গে ভৃত্যের ন্যায় আচরণ করেন। সাইফুদ্দীন বললেন, ঠিক আছে, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। বৃদ্ধ প্রজার ন্যায় আদবের সাথে বেরিয়ে যান। তিনি দাউদকে জাগিয়ে তোলেন এবং দু'জনে দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে যান।

'গোমস্তগীন সম্পর্কে জানতে পেরেছি, তিনি হাল্‌বে আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে আছেন'– নায়েব সালার বললো– 'মসুলে যে পরিস্থিতি দেখেছি, তা এতো খারাপ নয় যে, আমরা যুদ্ধ করতেই পারবো না। সালাহুদ্দীন আইউবী তুর্কমানে থেমে গেছেন। খৃস্টান গোয়েন্দারা জানিয়েছে, আইউবী আল-জাযিরা, দিয়ার, বকর ও আশপাশের অঞ্চলগুলো থেকে লোকদেরকে ফৌজে ভর্তি করছেন। মনে হচ্ছে, তিনি এক্ষুণি সম্মুখে অগ্রসর হবেন না। তবে তিনি অগ্রসর হবেন অবশ্যই, যা হবে ঝড়ের ন্যায়। তার ফৌজের তাঁবু বলছে, তিনি সেই স্থানে অনেক দিন অবস্থান করবেন। সম্ভবত তিনি এই আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত যে, আমরা যুদ্ধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের যে ফৌজ মসুল গিয়ে পৌঁছেছে, তাদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের অনেক কম। অন্যরা মৃত্যুবরণ করেছে। অনেকে নিখোঁজ রয়েছে।'

'তাহলে কি এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'শুধু আমাদের ফৌজ হামলার জন্য যথেষ্ট নয়'– নায়েব সালার জবাব দেয়– 'আল মালিকুস সালিহ ও গোমস্তগীনকে সঙ্গে নিতে হবে। আমাদের

উপদেষ্টাগণ (খৃস্টানরা) এ পরামর্শই প্রদান করেছে।'

'তুমি কি তাদেরকে বলেছো, আমি কোথায় আছি?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'না, আমি এ জায়গার কথা বলিনি'– নায়েব সালার জবাব দেয়– 'আমি তাদেরকে বলেছি, আপনি তুর্কমানের উপকণ্ঠে ঘোরাফেরা করছেন এবং নিজ চোখে সালাহুদ্দীন আইউবীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করছেন। আমার পরামর্শ, তিন-চার দিন পর আপনাকে মসুল চলে যাওয়া উচিত।'

'তার আগে হাল্‌বের খবরাখবর জানতে হবে'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'কমান্ডার কাল সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসবে। তুমি তো জানো, গোমস্তগীন শয়তান চরিত্রের মানুষ। তাকে তার দুর্গে (হাররানে) চলে যাওয়া উচিত ছিলো। লোকটা হাল্‌বে কী করছে? আমি মসুল যাওয়ার আগে হাল্‌ব যাবো। গোমস্তগীন আমার জোট সদস্য বটে; কিন্তু আমি তাকে বন্ধু ভাবতে পারি না। আল-মালিকুস সালিহ'র সালারদেরকে মতে আনতে হবে, সালাহুদ্দীন আইউবীর এ গড়িমসিকে কাজে লাগাতে হবে এবং সময় নষ্ট না করে হামলা করতে হবে। এখন আমি এ পরামর্শও দেবো যে, তিনটি ফৌজ একটি কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং তার একজন প্রধান সেনাপতি থাকা আবশ্যক। আমরা শুধু এ জন্য পরাজয়বরণ করেছি যে, আমাদের বাহিনীগুলোর কমান্ড পৃথক পৃথক ছিলো। এক বাহিনীর অপর বাহিনীর পরিকল্পনা ও কৌশল জানা ছিলো না। অন্যথায় মুজাফফর উদ্দীন সালাহুদ্দীন আইউবীর পার্শ্বের উপর যে হামলা করেছিলো, তা ব্যর্থ হওয়ার কথা ছিলো না।'

'তখন কেন্দ্রীয় কমান্ড আপনার হাতে থাকতে হবে।' নায়েব সালার বললো।

'আর আমাদেরকে বন্ধুদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে'– সাইফুদ্দীন বললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন– 'আচ্ছা, খৃস্টানরা কি আমাদেরকে সাহায্য করবে?'

'তারা সৈন্য তো দেবে না'– নায়েব সালার জবাব দেয়– 'উট-ঘোড়া ও অস্ত্র ইত্যাদি সরবরাহ করবে। আচ্ছা, এখানে আপনি কোনো সমস্যা অনুভব করছেন কি?'

'না'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'বৃদ্ধকে নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে। তার মেয়ে আমার ফাঁদে এসে গেছে। কিন্তু মেয়েটি আবেগপ্রবণ। বলছে, সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করে তার তরবারী নিয়ে নাও। তারপর তার ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে আসো। আমি তোমার সঙ্গে চলে যাবো।'

নায়েব সালার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। হারিছ, তার পিতা ও দাউদ

দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে তাদের কথোপকথন শুনছে। সাইফুদ্দীন ও তার নায়েব সালারের ফেরেস্তারাও জানে না, এ গৃহে একজন বৃদ্ধ ও দু'টি মেয়ে ছাড়া দু'জন যুবক মুজাহিদও আছে, যারা যে কোন উপযুক্ত সময়ে তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে পারে। সাইফুদ্দীনের মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে, তিনি ফাওজিয়াকে ফাঁদে ফেলেননি, বরং তিনিই ফাওজিয়ার জালে আটকা পড়েছেন।

দাউদ ও হারিছ ঘরে অবস্থান করছে। সাইফুদ্দীন ও তার নায়েব সালার দেউড়ি সংলগ্ন কক্ষে লুকিয়ে আছে। দিনের বেলা ফাওজিয়া তিন-চারবার উক্ত কক্ষে যাওয়া-আসা করছে। মেয়েটি যেহেতু সাইফুদ্দীনের কাছে গেলেও দু'হাত দূরে থাকছে, সে কারণে তার প্রতি সাইফুদ্দীনের আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি ফাওজিয়াকে বললেন– 'তোমার ভাই আমার ফৌজের সৈনিক। আমি তাকে বাহিনীর কমান্ডার বানিয়ে দেবো।'

'তিনি জীবিত আছেন নাকি মারা গেছেন, আমরা তাও তো জানি না'– ফাওজিয়া বললো– 'যদি মারাই গিয়ে থাকেন, তাহলে আমরা আশ্রয়হীন হয়ে পড়বো।'

'তাই যদি হয়, তাহলে আমি তোমার পিতা এবং ভাবীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।' সাইফুদ্দীন বললেন।

ফাওজিয়ার পিতাও সাইফুদ্দীনের নিকট আসা-যাওয়া করছেন। তিনি কাজে-আচরণে সাইফুদ্দীনকে নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি তার অফাদার।

রাতে পুনরায় দরজায় করাঘাত পড়ে। বৃদ্ধ দরজা খোলেন। বাইরে সাইফুদ্দীনের সেই কমান্ডার দাঁড়িয়ে, যাকে তিনি হাল্‌ব পাঠিয়েছিলেন। বৃদ্ধ তাকে সাইফুদ্দীনের কক্ষে পাঠিয়ে দেন। তার ঘোড়াও অন্য ঘোড়াগুলোর সঙ্গে বেঁধে রেখে ঘরে গিয়ে কমান্ডারের খাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চান। কমান্ডার অনেক দ্রুত এসেছে। পথে কোথাও দাঁড়ায়নি। ফলে পথে খাওয়া সম্ভব হয়নি। বৃদ্ধ খাবার আনার জন্য ভেতরে গেলে ফাওজিয়া বললো– 'আপনার যেতে হবে না, আমি নিয়ে যাচ্ছি।' তার উদ্দেশ্য, এই সুযোগে কমান্ডারের নিয়ে আসা তথ্যও সে সংগ্রহ করবে।

ফাওজিয়া খাবার নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। বক্তব্যরত কমান্ডার তাকে দেখেই থেমে যায়। সাইফুদ্দীন বললেন– 'অসুবিধা নেই, বলো, ও আমাদেরই মেয়ে।' ফাওজিয়া কমান্ডারের সামনে খাবার রেখে সাইফুদ্দীনের পাশে বসে

পড়ে। এই প্রথমবার মেয়েটি সাইফুদ্দীনের এতো কাছে গিয়ে বসলো। সাইফুদ্দীন তার একটি হাত নিজের মুঠোয় নেয়। ফাওজিয়া হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করেনি। অন্যথায় খৃস্টানদের এই বন্ধু তার হাতছাড়া হয়ে যেতো। এই লম্পট শাসককে মুঠোয় রাখার এ এক মোক্ষম অস্ত্র।

'হাল্‌বের বাহিনীর জযবা প্রশংসার দাবীদার'– কমান্ডার বলা শুরু করে। ফাওজিয়া সাইফুদ্দীনের আঙ্গুলে পরিহিত একটি আংটিতে হাত রেখে নাড়াচাড়া করছে এবং হিরার এই আংটিটার প্রতি শিশুসুলভ আকর্ষণ নিয়ে তাকিয়ে আছে। যেনো কমান্ডারের বক্তব্যের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। কিন্তু কান দুটো তার সেদিকেই খাড়া আছে। কমান্ডার বললো– 'আল মালিকুস সালিহ সালাহুদ্দীন আইউবীকে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন।'

'সন্ধির প্রস্তাব?' সাইফুদ্দীন চমকে ওঠে জিজ্ঞেস করেন।

'জ্বি হ্যা, সন্ধির প্রস্তাব।'– কমান্ডার বললো– 'কিন্তু আমি তথ্য পেয়েছি, তিনি আইউবীকে ধোঁকা দিয়েছেন। তার খৃস্টান বন্ধুরা তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিচ্ছে এবং তাকে উস্কানি দিচ্ছে, যেনো তিনি মসুল ও হাররানের বাহিনীকে একক কমান্ডে নিয়ে এসে অবিলম্বে সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করেন। আইউবী যদি সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়ে যায় এবং নতুন ভর্তি দিয়ে সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করে, তাহলে তাকে প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। গুপ্তচর সংবাদ নিয়ে এসেছে, সালাহুদ্দীন আইউবী তুর্কমানের সবুজ-শ্যামল অঞ্চলে দীর্ঘ সময়ের জন্য ছাউনী ফেলেছেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করছেন। আল-মালিকুস সালিহ'র সালারেরও একই অভিমত যে, তুর্কমান এলাকায়ই সালাহুদ্দীনের উপর এখনই হামলা করা উচিত।

আমি হাল্‌বের বাহিনীর এক খৃস্টান উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছিলাম। আমি তাকে বললাম, আমরা এখনই সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করাতে সক্ষম নই। তিনি বললেন, এটা তোমাদের বিরাট সামরিক ত্রুটি বলে বিবেচিত হবে। সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করার উদ্দেশ্য, তাকে এখনই পরাজিত করা নয়। উদ্দেশ্য হলো, তাকে সুযোগ দেয়া যাবে না। তাকে তুর্কমানের এলাকাতেই অস্থির করে রাখতে হবে এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ ধরে রাখতে হবে। এই যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে আইউবীরই ধারায়– 'আঘাত করো', 'পালিয়ে যাও', 'গেরিলা হামলা করো' ধরনের। চেষ্টা করতে হবে, তুর্কমানের

যেখানেই পানি আছে, আইউবীকে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে, যাতে খানা-পানির অভাবে সে সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।'

'বড় ভালো বুদ্ধি তো'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'এমন যুদ্ধ আমার সিপাহসালার মুজাফফর উদ্দীন লড়তে পারে। দীর্ঘদিন যাবত সে সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে থেকে এসেছে। তিন ফৌজের একক কমান্ড যাতে আমার হাতে চলে আসে। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে মরু শিয়ালের ন্যায় ধোঁকা দিয়ে মারবো।'

ফাওজিয়া সাইফুদ্দীনের তরবারীটা কোষ থেকে বের করে হাতে নিয়ে দেখতে শুরু করে। মেয়েটা একেবারে অবুঝ শিশুর মতো বসে আছে।

'আমি আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেছি'– কমান্ডার বললো– 'কিন্তু সালার ও কর্মকর্তারা তাকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, তা সম্ভব হলো না। এসব তথ্য আমি তার সালারদের থেকে সংগ্রহ করেছি।'

'তোমাকে আজ পুনরায় হাল্ব যেতে হবে'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আল মালিকুস সালিহকে বার্তা দিয়ে আসবে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছো। তুমি আইউবীর সাহস বাড়িয়ে দিয়েছো। তার হাত শক্ত করে দিয়েছো। সে আমাদের কাউকেই ক্ষমা করবে না। তুমি এখনো বালক। তুমি ভয় পেয়ে গেছো কিংবা তোমার সালারগণ যুদ্ধ এড়ানোর জন্য তোমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে।'

সাইফুদ্দীন এতদ্বিষয়ে দীর্ঘ বার্তা দিয়ে কমান্ডারকে বললেন– 'তুমি রাত পোহাবার আগেই আলো-আঁধারীতে রওনা হয়ে যাবে। দিনের বেলা যেনো এ এলাকায় কেউ তোমাকে দেখতে না পায়।'

কিছু সময় বিশ্রাম নেয়ার পর কমান্ডার রওনা হয়ে যায়।

ফাওজিয়া যা কিছু শুনলো, দাউদকে বলে দিলো। এসব তথ্যও কাজের। হারিছ ও তার পিতা ঘুমিয়ে পড়েছে। দাউদ কি এক কাজে ঘর থেকে বের হয়। ফাওজিয়াও পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে। দাউদ তার ঘোড়ার নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ফাওজিয়াও সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়।

'আমাকে এর চেয়ে আরো বড় কাজ করতে দিন'– ফাওজিয়া বললো– 'আপনার জন্য আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি।'

'আমার জন্য নয়, নিজ জাতি ও ধর্মের জন্য জীবন দিতে হবে'– দাউদ বললো– 'তুমি যে কাজটা করেছো, এটা অনেক বড় কাজ। আমরা যারা গোয়েন্দা, আমরা এ কাজেই নিজেদের জীবন বিলিয়ে থাকি। তোমার দ্বারা যে কাজটা

করাচ্ছি, তা মূলত আমার কাজ। আমি তোমাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিলাম।'

'কেমন ঝুঁকি?'

'তুমি এতোটা চতুর নও'– দাউদ বললো– 'সাইফুদ্দীন রাজা। এ কুঁড়েঘরেও রাজা।'

'তা রাজা আমাকে খেয়ে ফেলবে নাকি?'– ফাউজিয়া বললো– 'আমি চালাক না হতে পারি, সোজাও নই।'

'রাজত্বের চমক দেখলে তোমার চোখ বুজে আসবে'– দাউদ বললো– 'এই মানুষগুলো সেই চমকেই অন্ধ হয়ে ঈমান বিক্রি করেছে এবং ইসলামের মূলোৎপাটন করছে। আমার ভয় হচ্ছে, পাছে তুমিও সেই ফাঁদে আটকা পড়ে যাও কিনা।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'আমার কোনো ঠিকানা নেই'– দাউদ বললো– 'আমি গুপ্তচর ও গেরিলা। যেখানে দুশমনের হাতে পড়বো, সেখানেই মারা যাবো। আর যেখানে মারা যাবো, সেটাই হবে আমার মাতৃভূমি। শহীদের রক্ত যে ভূখণ্ডে পতিত হয়, সেই ভূখণ্ড সালতানাতে ইসলামিয়ার হয়ে যায়। সেই ভূখণ্ডকে কুফর থেকে পবিত্র করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয হয়ে যায়। আমাদের মা ও বোনেরা আমাদেরকে প্রতিপালন করে আল্লাহর হাতে তুলে দিয়েছেন। তারা নিজেদের অন্তরে পাথর বেঁধে রেখেছেন এবং আমরা পুনরায় তাদের কোলে ফিরে যাবো।'

'আপনার অন্তরে বাড়ি যাওয়ার, মাকে দেখার এবং ভাই-বোনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্খা জাগে নিশ্চয়ই।' ফাওজিয়া আপ্লুত কণ্ঠে বললো।

'মানুষ যখন কামনার গোলাম হয়ে যায়, তখন কর্তব্য অসম্পাদিত থেকে যায়'– দাউদ বললো– 'ইসলামের একজন সৈনিককে জীবন কুরবান করার আগে আবেগ কুরবান করতে হয়। এই কুরবানী তোমাকেও দিতে হবে।'

ফাওজিয়া দাউদের আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বললো– 'আপনি কি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন?'

'না।' দাউদের সুস্পষ্ট জবাব।

'দিন কয়েক আমার কাছে থাকতে পারবেন?' ফাওজিয়া জিজ্ঞেস করে।

'আমার কর্তব্য যদি প্রয়োজন মনে করে, তাহলে পারবো'– দাউদ জবাবে দেয়– 'তা আমাকে কাছে রেখে কী করবে?'

'আপনাকে আমার ভালো লাগে'– ফাওজিয়া বললো– 'আপনার মুখ থেকে

এমন আবেগমাখা মূল্যবান কথা শুনেছি, যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। আমার মন চায় আপনার সঙ্গে থাকি আর...'

'আমার পায়ে শিকল বেঁধো না ফাওজিয়া'– দাউদ বললো– 'নিজেকেও আবেগের শিকল থেকে মুক্ত রাখো। আমাদের সামনে বড় কঠিন পথ। পরস্পর হাতে হাত ধরে একসঙ্গে চলতে হবে বটে, একজন অপরজনের বন্দী হবো না।' দাউদ খানিক চিন্তা করে বললো– 'ফাওজিয়া! তুমি বেশী দূর আমার সঙ্গ দিতে পারবে না। আমার কাছে তোমার ইজ্জতটা বেশী মূল্যবান। পুরুষদের কাজ পুরুষরাই করবে। তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।'

সহসা ফাওজিয়ার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। দাউদকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক নজর দেখে নিয়ে কোন কথা না বলে মোড় ঘুরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। দাউদ ফাওজিয়ার বাহুতে হাত রাখে এবং তাকে কাছে টেনে চোখে চোখ রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ফাওজিয়া তার গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যায় এবং আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলে– 'যে কাজ পুরুষদের, তা নারীরাও করতে পারে। আমার সম্ভ্রম তো কাচ নয় যে, সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে যাবে। আমি তোমাকে আমার সম্ভ্রম পেশ করছি না। তোমাকে আমার ভালো লাগে। তোমার কথাগুলো ভালো লাগে। আমাকে তুমি যে পথ দেখিয়েছো, তাও আমার কাছে ভালো লেগেছে। আমি তোমার গা-ঘেঁষে এ জন্য দাঁড়িয়েছি, যাতে আমার ছোঁয়ায় তুমি তোমার মা কিংবা বোনের ঘ্রাণ লাভ করতে পারো। তুমি বড্ড ক্লান্ত দাউদ ভাই। আমার ভাবী আমাকে অনেক জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পুরুষরা যখন ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে, তখন নারী ছাড়া কেউ তাদের ক্লান্তি দূর করতে পারে না। নারী না থাকলে পুরুষের আত্মা নির্জীব হয়ে যায়। আমার ভয় হচ্ছে, আপনার আত্মা যদি নির্জীব হয়ে যায়, তাহলে...।'

দাউদ হেসে ওঠে এবং ফাওজিয়ার গালে আলতো হাত বুলিয়ে বললো– 'তোমার এই সরল-সহজ কথাগুলো আমার আত্মাটাকে সজীব করে তুলেছে।'

'আমার কোনো কথা আপনার অপছন্দ হয়নি তো'– ফাওজিয়া বললো– 'ভাইয়াকে বলবেন না কিন্তু।'

'না, বলবো না'– দাউদ বললো– 'তোমার ভাইকে এ ব্যাপারে কিছুই বলবো না। আর তোমার কোনো কথায় আমি কষ্ট পাইনি।'

'আপনার-আমার গন্তব্য একই'– ফাওজিয়া বললো– 'মনের কথা কিভাবে বলতে হয়, আমার জানা নেই।'

'তুমি তোমার মনের কথাই বলে দিয়েছো ফাওজিয়া'– দাউদ বললো– 'আর আমিও বুঝে ফেলেছি, তুমি ঠিকই বলেছো, আমাদের গন্তব্য এক। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, পথে রক্তের নদী আছে, যার উপর কোনো পুল নেই। তুমি যদি চিরদিনের জন্য আমাকে পেতে চাও, তাহলে আমাদের বিয়ে হবে রক্তাক্ত প্রান্তরে। তারপর যদি আমাদের লাশ দুটো একটি অপরটি থেকে দূরে থাকে, তবু আমরা একত্রিত হবো। সত্য পথের পথিকদের বিয়ে পৃথিবীতে নয়, আকাশে হয়ে থাকে। তাদের বরযাত্রী পথ অতিক্রম করে ছায়াপথে। তাদের বিয়ের উৎসবে সমস্ত আকাশকে তারকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়ে থাকে।'

দাউদের সঙ্গে কথোপকথনের শেষে ফাওজিয়া যখন ফিরে যেতে উদ্যত হয়, তখন তার ঠোঁটে হাসির ঝলক দেখা যায়, যে হাসিতে আনন্দের তুলনায় প্রত্যয়ের প্রতিক্রিয়া অধিক বেশী পরিস্ফুট।

আল-মালিকুস সালিহ'র নামে সাইফুদ্দীনের বার্তা নিয়ে যাওয়া কমান্ডার দু'দিন পর ফিরে আসে। আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি। ফলে বার্তা পৌঁছিয়ে তার লিখিত জবাব পাঠিয়ে দিতে বলে আসে সে। সাইফুদ্দীন কোথায় আছেন এবং যে গৃহে অবস্থান করছেন, সেখানে কিভাবে আসতে হবে, বলে এসেছে কমান্ডার। সাইফুদ্দীন তার পত্রের জবাবের অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। কিন্তু জবাব আসছে না। তার অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। চারদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি অত্যন্ত পেরেশেন হয়ে পড়েন।

'নাকি আমি নিজেই হাল্‌ব যাবো'– সাইফুদ্দীন তার নায়েব সালারকে বললেন– 'হাল্‌বের বাহিনী যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সমঝোতা করেই ফেলে, তাহলে নিজেদের ব্যাপারে ভাবতে হবে। গোমস্তগীনের উপর কোনো ভরসা রাখা যায় না। আমরা একা তো লড়াই করতে পারবো না। তখন খৃস্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অন্য কোনো পরিকল্পনা করতে হবে।'

'আচ্ছা, আল-মালিকুস সালিহ সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে যে সন্ধি করেছেন, তা থেকে কি তিনি ফিরে আসতে পারবেন?' নায়েব সালার জিজ্ঞেস করেন।

'তা পারবেন'– কমান্ডার বললো– 'আমি তাদের যে ক'জন সালার ও কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা বলেছে, আল মালিকুস সালিহ সালাহুদ্দীন আইউবীকে ধোঁকা দিয়েছেন। যদি ধোঁকা নাও দিয়ে থাকেন, তবু অধিকাংশ সালার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা এই সন্ধিকে সমর্থন করে না। খৃস্টান উপদেষ্টারা

তো এক্ষুণি আক্রমণ করার পক্ষপাতী।'

'আপনাকে হাল্‌ব চলে যাওয়া উচিত'– নায়েব সালার বললেন– 'আমি মসুল চলে যাই।'

'তুমি পুনরায় হাল্‌ব চলে যাও'– সাইফুদ্দীন কমান্ডারকে বললেন– 'গিয়ে আল-মালিকুস সালিহকে বলো, আমি আসছি। তুমি আজই রওনা হয়ে যাও। কাল রাতে আমিও রওনা হবো। তিনি হয়তো আমাকে সাক্ষাৎ দিতে রাজি হবেন না। নগরীর বাইরে আল-মাবারিক নামক স্থানে যে কূপটি আছে, আমি সেখানে অবস্থান করবো। আল-মালিকুস সালিহকে বলবে, তিনি যেনো আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। যদি তিনি সাক্ষাৎ করতে সম্মত না হন, তাহলে সেখানে এসে তুমি আমাকে অবহিত করবে।'

'আপনার একা যাওয়া কি ঠিক হবে?' নায়েব সালার জিজ্ঞেস করেন।

'এসব এলাকায় কোনো ভয় নেই'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমি রাতে রওনা হবো। কেউ জানবে না যে, মসুলের শাসনকর্তা যাচ্ছেন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা ও গেরিলাদের ফাঁদে পড়ার আশংকা আছে'– নায়েব সালার বললেন– 'আমাদের এক ইঞ্চি ভূখণ্ডও তাদের থেকে নিরাপদ নয়।'

'আমাকে যেতেই হবে'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'ঝুঁকি নিতেই হবে। তুমি আজই মসুল রওনা হয়ে যাও। আমি আগামী রাতে হাল্‌বের উদ্দেশ্যে রওনা হবো।'

যে সময় সাইফুদ্দীন ও তার সঙ্গীদের মাঝে এসব কথোপকথন চলছিলো, তখন দাউদ ও হারিছের কান দরজার সঙ্গে লাগা ছিলো। এবার তারা সেখান থেকে সরে নিজ কক্ষে চলে আসে। দাউদ চিন্তায় পড়ে যায়। তাকে সাইফুদ্দীনের পিছু নিতে হবে। কিন্তু কিভাবে? দীর্ঘ ভাবনার পর তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে।

'আমরা সাইফুদ্দীনের দেহরক্ষী সেজে তার সঙ্গে হাল্‌ব চলে যাবো'– দাউদ হারিছকে বললো– 'আমরা আকস্মিকভাবে তার সামনে গিয়ে হাজির হবো এবং বলবো, আমরা আপনার ফৌজের সিপাহী।'

'তিনি যদি বলে ফেলেন, তোমরা মসুল চলে যাও, তাহলে কি করবো?' হারিছ জিজ্ঞেস করে।

'আমি আমার জাদু চালানোর চেষ্টা করবো।' দাউদ জবাব দেয়।

'এই কৌশলও যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে?' হারিছ প্রশ্ন করে।

'তারপরও আমরা হাল্ব যাবো না'– দাউদ বললো– 'আল-মালিকুস সালিহ যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করেই থাকে, তাহলে সাইফুদ্দীন সেই সন্ধিকে বাতিল করানোর জন্য হাল্ব যেতে পারবে না।' দাউদ হারিছকে বুঝিয়ে দেয় তাকে কী করতে হবে।

সেই রাত। সাইফুদ্দীন রুদ্ধ কক্ষে তার নায়েব সালার ও কমান্ডারের নিকট বসে তাদেরকে শেষবারের মতো নির্দেশনা প্রদান করছেন। রাতের প্রথম প্রহর। সর্বপ্রথম কমান্ডার সেখান থেকে বের হয়। হারিছের পিতা তার ঘোড়ার বাঁধন খুলে দেয়। কিছুক্ষণ পর নায়েব সালারও বেরিয়ে যায়। সাইফুদ্দীন এখন একা। তিনি শুয়ে পড়েন। হঠাৎ কক্ষের দরজাটা প্রবলবেগে খুলে যায়। তিনি ভয় পেয়ে উঠে বসেন। বিস্ফারিত নয়নে তাকান। ফাওজিয়া আপাদমস্তক উল্লসিত হয়ে ঢুকেই সাইফুদ্দীনের পাশে বসে এবং তার হস্তদ্বয় ঝাঁপটে ধরে।

'ভাইয়া এসে পড়েছেন'– ফাওজিয়া আনন্দে পাগলপারা হয়ে বললো– 'সঙ্গে তার এক বন্ধু এসেছেন।'

'তুমি কি তাদেরকে বলেছো, আমি এখানে আছি?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ'– ফাওজিয়া বললো– 'আমি বলে দিয়েছি। শুনে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। তারা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।'

'নিয়ে আসো।' সাইফুদ্দীন বললেন।

দাউদ ও হারিছ সাইফুদ্দীনের কক্ষে প্রবেশ করে তাকে সামরিক কায়দায় সালাম জানায়। সাইফুদ্দীন ইঙ্গিতে তাদেরকে তার পাশে বসতে বলেন। তারা বসে পড়ে দাউদ ও হারিছ পোশাক ও মুখমণ্ডলে ধূলি মেখে এসেছে। তারা এমনভাবে শ্বাস ফেলছে, যেনো দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার দরুন ক্লান্ত। সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন– 'তোমরা কোন্ ইউনিটের সদস্য ছিলে?'

হারিছ যেহেতু তারই ফৌজের সৈনিক, তাই সে-ই সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। দাউদ চুপচাপ বসে থাকে। তার তো কিছুই জানা নেই।

'তোমরা এতোদিন কোথায় ছিলে?' সাইফুদ্দীন জিজ্ঞেস করেন।

'আমাদের ফৌজ কিভাবে পিছপা হয়েছে, বলতে লজ্জা লাগছে'– দাউদ মুখ খুলে– 'আমাদের পিছপা হওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু একে সঙ্গে নিয়ে আমি একটি পাথর খণ্ডের পেছনে লুকিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। আমরা লক্ষ্য রাখি, আইউবীর বাহিনী আমাদের ধাওয়া করতে আসছে, নাকি কোথাও ছাউনী ফেলছে। আমি

গোয়েন্দাগিরি করতে শুরু করি। আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে, খৃস্টান উপদেষ্টাদের দ্বারা আপনি গেরিলা বাহিনী গঠন করেছিলেন। আমিও এক বাহিনীতে ছিলাম। আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। যুদ্ধের সময় এই প্রশিক্ষণ বেশ কাজে আসে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমি আমার এই যোগ্যতাকে কাজে লাগাই। ভাবলাম, পালাতেই যদি হয়, তাহলে আপন ফৌজের জন্য দুশমনের কিছু তথ্যও নিয়ে যাবো। ইতিমধ্যে হারিছ ভাইকে পেয়ে গেলাম। তাকে সঙ্গে রেখে দিলাম। সালাহুদ্দীন আইউবীর ফৌজ অগ্রসর হতে থাকে আর আমরা তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। সে সময় যদি আমাদের সঙ্গে জনাদশেক সৈন্যও থাকতো, তাহলে কমান্ডো হামলা চালিয়ে আমরা তাদের অনেক ক্ষতি করতে পারতাম।'

'আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীকে তুর্কমান অঞ্চলে ছাউনী ফেলতে দেখেছি। তারা যেভাবে তাঁবু স্থাপন করেছে, তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে, সেখানে তারা দীর্ঘ সময় অবস্থান করবে। আমার আফসোস লাগছে যে, আমাদের বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে এসেছে। আপনি একে জিজ্ঞেস করুন, আমরা শত্রু বাহিনীর যে লাশ দেখেছি, তার সংখ্যা কয়েক হাজার হবে। আর আহতদের তো কোনো হিসেবই নেই। আমরা রাতে তাদের ছাউনীর নিকটে গিয়ে দেখেছি। আল্লাহু আকবার! জখমীদের আর্তনাদ সহ্য করার মতো নয়। আমাদের মনে হলো, তাদের অর্ধেক সৈন্যই যেনো আহত।

আমীরে মোহতারাম! আল্লাহ আপনার মর্যাদা বুলন্দ করুন। এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী– আপনিই ভালো জানেন। আমরা আপনার দাসানুদাস– যা আদেশ করবেন, তাই পালন করবো। আমার বিশ্বাস, সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী এ মুহূর্তে পুনরায় যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। আপনি যদি এক্ষুণি আপনার বাহিনীকে একত্রিত করে হামলা করেন, তাহলে আইউবীকে দামেস্ক তাড়িয়ে নিতে সক্ষম হবেন।'

সাইফুদ্দীন মনোযোগ সহকারে দাউদের রিপোর্ট শ্রবণ করেন। পরাজিত বিধায় তিনি এমন সব সান্ত্বনাদায়ক কথাবার্তা শুনতে উদগ্রীব ছিলেন যে, তিনি আসলে পরাজিত হননি কিংবা পলায়ন করেননি। দাউদ তার সেই চাহিদাটাই পূরণ করছে। সাইফুদ্দীনের দুর্বলতাই বলতে হবে যে, দাউদের বক্তব্যে তার হৃদয়ে স্বস্তি ও শান্তি ফিরে আসে।

'আমরা মসুল যাচ্ছিলাম'– দাউদ বললো– 'হারিছের গ্রামটা পথে বিধায় ও ...লা, ক্ষণিকের জন্য বাড়িতে ঢুকে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাবো। কিন্তু

এখানে এসেই শুনতে পেলাম আপনি এখানে আছেন। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। বিষয়টা এতোই অবিশ্বাস্য যে, আপনাকে দেখার পর এখনও যেনো বিশ্বাস হচ্ছে না, আপনি এখানে। রিপোর্ট আপনাকে অবহিত করা প্রয়োজন ছিলো। ভাগ্য ভালো যে, আপনাকে এখানেই পেয়ে গেলাম।'

'তোমাদের বক্তব্য শুনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি'– সাইফুদ্দীন রাজকীয় ভঙ্গীতে বললেন– 'এই বীরত্বের জন্য তোমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।'

'আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে যে, আমরা আপনার পাশাপাশি বসে আপনার সঙ্গে কথা বলছি'– হারিছ বললো– ' আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারলেই আমরা ধন্য হবো।'

'জানতে পারলাম, এখানে আপনার সঙ্গে আরো লোক আছে।' দাউদ বললো।

'তারা চলে গেছে'– সাইফুদ্দীন জবাব দেন– 'আমিও চলে যাবো।'

'বেআদবী মাফ করলে জিজ্ঞেস করবো, আপনি এখানে কতদিন থাকবেন'– হারিছ বললো– 'এবং কোথায় যাবেন? আমি লজ্জিত যে, আমার স্বজনরা আপনাকে এই ভাঙ্গা কক্ষে থাকতে দিয়েছেন এবং মেঝেতে বসিয়ে রেখেছেন।'

'এটাই আমার কামনা ছিলো'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'এখানে আমি আরো দিন কয়েক কাটাতে চাই। তোমরা কিন্তু কাউকে বলবে না, আমি এখানে আছি।'

'আপনি কোথায় যাবেন?' দাউদ জিজ্ঞেস করে।

'আমি হাল্‌ব যাবো'– সাইফুদ্দীন জবাব দেন– 'সেখান থেকে মসুল চলে যাবো।'

'কিন্তু আপনি যে একা'– দাউদ বললো– 'আপনার তো দেহরক্ষী প্রয়োজন।'

'এই অঞ্চলে কোনো আশংকা নেই'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'একা একাই যেতে পারবো।'

'গোস্তাখী মাফ করবেন'– দাউদ বললো– 'এই অঞ্চলকেও আপনি শত্রুমুক্ত ভাববেন না। আমি যা জানি, আপনি তা জানেন না। সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডোরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কেউ যদি আপনাকে চিনে ফেলে, তাহলে আমাদের দু'জনকে আজীবন আক্ষেপ করতে হবে, কেনো আমরা আপনার সঙ্গে গেলাম না। আমরা এখানে ঘটনাক্রমে এসে পড়েছি। আমাদের সঙ্গে ঘোড়া আছে, অস্ত্রও আছে। আপনি বললে আমরা আপনার সঙ্গ দিতে পারি।

তাছাড়া একজন শাসকের একাকী সফর করা বেমানানও বটে।'

সাইফুদ্দীনের দেহরক্ষীর প্রয়োজন আছে বটে। মুখে যাই বলুন, অন্তরটা তার ভয়ে কাঁপছে। দাউদ তাকে আরো ভীত করে তোলে। তিনি বললেন– 'ঠিক আছে, তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। আমরা আগামী রাতে রওনা হবো।'

দাউদ ও হারিছ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। সাইফুদ্দীন ফাওজিয়ার অপেক্ষায় বসে আছেন। কিন্তু আজ আর ফাওজিয়া তার কক্ষে এলো না। দিনে দাউদ ও হারিছ তাকে খাবার খাওয়ায়। দিন শেষে রাত আসে।

আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগীন যে স্থানে বসে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, সেখান থেকে খানিক দূরে খৃস্টান কমান্ডার ও সম্রাটদের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। তারা আল-মালিকুস সালিহ, সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগীনের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় নিয়ে পর্যালোচনা করছে। এদের প্রায় সকলেই সুলতান আইউবীর মোকাবেলায় পরাজিত সৈনিক।

'এই তিনটি মুসলিম ফৌজের পরাজয় মূলত আমাদেরই পরাজয়'– রেমন্ড বললেন– 'আমি যতটুকু জানি, সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীতে সৈন্য বেশী ছিলো না।'

'আপনার মতের সঙ্গে আমি একমত নই'– ফরাসী সম্রাট রেজিনাল্ট বললেন– 'আমাদের উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, মুসলমানরা যখন পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হবে, তখন তাদের কোনো পক্ষ জয়ী কিংবা পরাজিত হবে। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমান পরস্পর লড়তে থাকবে এবং তাদের একটি পক্ষ আমাদের হাতে খেলতে থাকবে। আমাদের ঘৃণ্য ও ভয়ংকর শত্রু হলেন সালাহুদ্দীন আইউবী। আমরা চাই তার মুসলমান ভাইয়েরা তার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকুক এবং তার শক্তি বিনষ্ট করতে থাকুক। তার মুসলমান প্রতিপক্ষের শক্তিও যদি নষ্ট হয়, হতে থাকুক। এমনও হতে পারে, সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাস্ত করে তার প্রতিপক্ষ মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে।'

'আমি আপনাদের মুসলিম অঞ্চলসমূহ ও শাসকদের পূর্ণ বিবরণ শোনাতে চাই, যা আমাদের উপদেষ্টাগণ প্রেরণ করেছেন'– এক কমান্ডার বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতিপক্ষ তিনটি বাহিনীর অবস্থা হলো, সৈন্যদের মাঝে যুদ্ধ করার স্পৃহা আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। তাদের

ব্যাপক দৈহিক ক্ষতি হয়েছে এবং বিপুলসংখ্যক অস্ত্র ও মালপত্র খোয়া গেছে। তারা তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিলো না। আমরা তাদেরকে যে উপদেষ্টা দিয়ে রেখেছি, তারা বড় কষ্টে মুসলিম শাসকদেরকে সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছেন। সালাহুদ্দীন আইউবী হুবাবুত তুর্কমানের একটি মনোরম জায়গায় ছাউনী ফেলে সেখানে অবস্থান করছেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রযাত্রা স্থগিত রেখেছেন। আমাদের খৃস্টান উপদেষ্টা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন, হাল্‌ব, হররান ও মসুলের বাহিনী যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, কাল বিলম্ব না করে পুনরায় আক্রমণ করুক। আমি আশাবাদী, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে অসতর্ক অবস্থায় ঘায়েল করে ফেলতে সক্ষম হবেন। আইউবীকে হত্যা করার এ মুহূর্তে এটাই উপযুক্ত পন্থা।'

'আর এই পন্থা সম্ভবত সফল হবে না'— ফিলিপ অগাস্টাস বললেন— 'কেননা, আইউবী কখনো বেখবর বসে থাকে না। তার গোয়েন্দা বিভাগ সর্বক্ষণ সজাগ ও তৎপর থাকে। যে ঘটনা বা যে হামলা দু'দিন পরে সংঘটিত হবে, তার সংবাদ তিনি দু'দিন আগেই পেয়ে থাকেন। আমাদের যেসব উপদেষ্টা মুসলমানদের সঙ্গে আছেন, তাদেরকে জোরালোভাবে বলে দেয়া প্রয়োজন, যেনো তারা তাদের গোয়েন্দা তৎপরতা তীব্রতর করে। গোয়েন্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তাদেরকে দায়িত্ব অর্পণ করুন, যেনো তারা সমগ্র অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় এবং আইউবীর গোয়েন্দাদের ধরে ফেলে। মুসলমান সৈন্যরা যখন হামলার জন্য যাত্রা করবে, তখন যেনো আমাদের গুপ্তচর ও গেরিলা সৈন্যরা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। কোথাও সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে যেনো ধরে ফেলে। পথচারীদেরকে ধরে ফেলতে হবে। উদ্দেশ্য থাকবে, আইউবী যেনো হামলার সংবাদ তখন পায়, যখন তার মুসলমান ভাইয়ের ঘোড়া তার ছাউনী এলাকায় ঢুকে তার সৈন্যদের যমের হাতে তুলে দিতে শুরু করবে।'

'এ সংবাদও এসেছে যে, সালাহুদ্দীন আইউবী তার অধিকৃত এলাকাগুলো থেকে সেনাভর্তি নিচ্ছেন। মানুষ দলে দলে তার বাহিনীতে ভর্তি হচ্ছে'— অপর এক কমান্ডার বললো— 'এই ধারা প্রতিহত করতে হবে। তার একটি পন্থা হলো, যা আমরা পূর্ব থেকেই প্রয়োগ করে আসছি যে, কালবিলম্ব না করে তার উপর হামলা চালাতে হবে, যাতে তিনি প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ না পান। দ্বিতীয় পন্থা হলো, ঐসব এলাকায় চরিত্র বিধ্বংসী সেই অভিযান পরিচালনা করতে হবে, যা আমরা মিশরে পরিচালনা করেছিলাম। এটা সত্য যে, এ ধরনের

অভিযানে আমাদের বহু পুরুষ ও কয়েকটি মূল্যবান মেয়ে ধরা পড়েছিলো এবং মারা গিয়েছিলো। কিন্তু এই কুরবানী তো দিতেই হবে। আমরাও তো মারা যাচ্ছি। ক্রুশের খাতিরে প্রয়োজন হলে আমাদেরকে জীবন দিতে হবে এবং আমাদের সন্তানদেরও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামাতে হবে। যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে হোক, মুসলমানদের চেতনার উপর আঘাত হানতেই হবে। আমি স্বীকার করছি, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে এই ভূখণ্ড থেকে বেদখল করতে পারবো না। লোকটা মিশরেও ঝেঁকে বসেছে এবং এই ভূখণ্ডেও এসে পৌঁছেছে। তার সাফল্যের এক কারণ তো এই যে, তিনি রণাঙ্গনের শাহসাওয়ার। দ্বিতীয় কারণ, তিনি বিচক্ষণ ও দক্ষ সেনানায়ক। তৃতীয় মৌলিক কারণটি হলো, তিনি তার সৈনিকদের মাঝে জাতীয় চেতনা ও ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে রেখেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে তারা পবিত্র ধর্মীয় কাজ মনে করে। সে কারণেই তার কমান্ডো সেনারা আমাদের বাহিনীর উপর সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের এই বিশ্বাস ও উন্মাদনাকে ধ্বংস করতে হবে।'

'আমরা বরাবরই মানুষের সেই দুর্বলতা থেকে উপকৃত হয়েছি, যাকে পলায়নপরতা ও বিলাসপ্রিয়তা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে'– ফিলিপ অগাস্টাস বললেন– 'যেসব মুসলমানের কাছে বিত্ত আছে, তারা শাসক হতে চায়। আমরা তাদের এই দুর্বলতাটাকেই কাজে লাগিয়েছি। আমাদের নতুন কোনো পন্থা আবিষ্কার করার প্রয়োজন নেই। তবে আমাদেরকে আরো একটি অভিযান শুরু করতে হবে। তাহলো, আইউবীর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির অভিযান। যতোসব অবমাননাকর দুর্নাম আছে, তার নামে প্রচার করতে হবে। কিন্তু এ কাজটা তোমরা করবে না; মুসলমানদের দ্বারা করতে হবে। প্রতিপক্ষ এবং শত্রুপক্ষের দুর্নাম করতে হলে নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা করা চলবে না। সবসময় নিজেদের স্বার্থকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমার শত্রু মর্যাদা ও খ্যাতির দিক থেকে যতো উঁচু মানের, তার বিরুদ্ধে ততো নিচ ও হীন অপবাদ আরোপ করতে হবে। শতজনের মধ্য থেকে কমপক্ষে পাঁচজন তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে।'

'এই ফাঁকে তোমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি অব্যাহত রাখো'– এক কমান্ডার বললো– 'আমরা প্রচুর সময় পেয়ে গেছি। আপনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে মুসলমানদের মাঝে ক্ষমতাপূজার ব্যাধি সৃষ্টি করে তাদেরকে পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত করিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি মুসলমানদের মাঝে আমাদের বন্ধু তৈরী

না করতাম, তাহলে আজ সালাহুদ্দীন আইউবী ফিলিস্তিনে অবস্থান করতেন। আমরা তারই স্বজাতিকে তার পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি।'

'আমি বিস্মিত'– রেমন্ড বললেন– 'যে, এই মুসলমানরাই আবার আইউবীর বাহিনীর সৈনিক। তারা এক একজন আমাদের দশজন সৈনিকের মোকাবেলায়ও শক্তিশালী। আবার এই মুসলমানরাই আইউবীর প্রতিপক্ষ বাহিনীতে যোগ দিয়ে এমন কাপুরুষে পরিণত হয়ে যায় যে, শোচনীয় পরাজয়বরণ করে তারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়। বিষয়টা আমার কাছে সত্যিই বিস্ময়কর।'

'এটা বিশ্বাস ও চেতনার কারসাজি, যাকে মুসলমানরা ঈমান বলে থাকে'– রেজিনাল্ট বললেন– 'যে সৈনিক বা সেনাপতি নিজের ঈমান নিলাম করে দেয়, তার যুদ্ধ করার স্পৃহা নিঃশেষ হয়ে যায়। জীবন আর সম্পদই তার অধিকতর প্রিয় হয়ে থাকে। এ কারণেই আমরা মুসলমানদের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করাকে বেশী আবশ্যক মনে করি। তাদের মধ্যে যৌনতা ও নেশার অভ্যাস সৃষ্টি করে দাও। দেখবে, তোমাদের সব কেল্লা জয় হয়ে যাবে।'

এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তিনটি মুসলিম বাহিনীকে হালবে একত্রিত করে একক কমান্ডে রাখা হবে। তবে কৌশলে তাদের মাঝে পরস্পর বিরোধও জিইয়ে রাখা হবে। তাদেরকে আবশ্যক পরিমাণ সাহায্য সরবরাহ করা হবে।'

রাতের দ্বিতীয় প্রহর। হারিছের গ্রামের সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তার ঘর থেকে তিনটি ঘোড়া বের হয়। একটির আরোহী সাইফুদ্দীন, একটিতে হারিছ ও অপরটিকে দাউদ। হারিছ ও দাউদের হাতে বর্শা। তাদের বিদায় জানানোর জন্য হারিছের পিতা, বোন ও স্ত্রী ঘরের দরজায় দণ্ডায়মান। সাইফুদ্দীনের দৃষ্টি ফাওজিয়ার উপর নিবদ্ধ। কিন্তু ফাওজিয়ার দৃষ্টি দাউদের প্রতি। সাইফুদ্দীন ও নিজ ভাইয়ের উপস্থিতি উপেক্ষা করে দাউদের প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফাওজিয়া। কিছুক্ষণের মধ্যে উভয় দিক থেকে 'আল্লাহ হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ' শব্দ ভেসে আসে। তিনটি ঘোড়া সম্মুখপানে চলতে শুরু করে।

ঘোড়াগুলো অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। ফাওজিয়া তাদের পায়ের শব্দ শুনতে থাকে। ধীরে অশ্বক্ষুরধ্বনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। পাশাপাশি ফাওজিয়ার কানে দাউদের কণ্ঠ উঁচু হতে শুরু করে– 'সত্য পথের পথিকদের বিবাহ আকাশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে...।'

ফাওজিয়া দরজা বন্ধ করে নিজ কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার আশপাশে দাউদের কণ্ঠ গুঞ্জরিত হয়েই চলেছে। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগে– 'আচ্ছা, আমি কি সত্যিই দাউদকে বিয়ে করতে চাই?' লজ্জায় মাথাটা নুয়ে পড়ে ফাওজিয়ার। নিজের প্রতি রাগ আসে তার। দাউদের বক্তব্য মনে পড়ে যায়– 'পথে রক্তের নদীও আছে, যার উপর কোনো সেতু নেই।' ফাওজিয়ার হৃদয় সাগরে রক্তের ঢেউ শুরু হয়ে যায়। বিয়ে-কল্পনা একটা অর্থহীন ভাবনায় পরিণত হয়ে মাথা থেকে উবে যায়।

সাইফুদ্দীন ও তার দেহরক্ষীরা রাতটা সফরে অতিবাহিত করে। এখন ভোর। সাইফুদ্দীন আগে আগে চলছেন। দাউদ ও হারিছ এতোটুকু পেছনে যে, তাদের কথাবার্তা সাইফুদ্দীনের কানে পৌঁছছে না।

'জানি না, তুমি আমাকে কেনো বারণ করছো?'– হারিছ ঝাঝালো কণ্ঠে বললো– 'এখানে যদি আমরা তাকে খুন করে লাশটা কোথাও পুঁতে রাখি, কেউ টেরও পাবে না।'

'তাকে জীবিত রেখে আমরা তার গোটা বাহিনীকে হত্যা করতে পারবো'– দাউদ বললো– 'ইনি মারা গেলে এর বাহিনীর কমান্ড অন্য কেউ হাতে তুলে নেবে। আমাকে তথ্য জানতে হবে। তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখো।'

বেলা দ্বি-প্রহর। হালবের মিনার দেখা যাচ্ছে। খানিক দূরে প্রাকৃতিক কূপসমৃদ্ধ আল-মাবারিকের সবুজ-শ্যামল এলাকা। কাফেলা সে স্থানে পৌঁছে যায়। সাইফুদ্দীন তার যে কমান্ডারকে আল-মালিকুস সালিহ'র নিকট প্রেরণ করেছিলেন, সে ছুটে এসে জানালো, আল-মালিকুস সালিহ আপনার অপেক্ষা করছেন। আল-মাবারিকের শ্যামলিমায় প্রবেশ করামাত্র সাইফুদ্দীনকে স্বাগত জানানোর জন্য পূর্ব থেকে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন সালার এগিয়ে এসে তাকে অভিবাদন জানায়। সাইফুদ্দীন আশংকা ব্যক্ত করেন, আমার তাঁবুটা কূপের পাড়ে স্থাপন করা হোক। আমি এখানেই অবস্থান করবো। তিনি আল-মালিকুস সালিহ'র মহলে যেতে কেনো অনীহ ছিলেন, ইতিহাসে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। দাউদ ও হারিছকে তিনি নিজের সঙ্গে রাখেন। তার জন্য অত্যন্ত মনোরম ও প্রশস্ত তাঁবু স্থাপন করা হলো। চাকর-বাকরও এসে পড়েছে। প্রাসাদের চিত্র ফুটে ওঠে তার তাঁবুতে। আল-মালিকুস সালিহ তাকে নৈশভোজের জন্য কেল্লায় নিমন্ত্রণ জানান এবং সেখানেই দু'জনের সাক্ষাৎ স্থির হয়।

সন্ধ্যার পর সাইফুদ্দীন ও আল-মালিকুস সালিহ'র সাক্ষাৎ ঘটে। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তার রোজনামচায় এই সাক্ষাতের বিবরণ এভাবে উল্লেখ করেছেন–

'অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, আল-মালিকুস সালিহ ও সাইফুদ্দীনের সাক্ষাৎ হবে। সাক্ষাৎ হলো দুর্গে। আল-মালিকুস সালিহ সাইফুদ্দীনকে স্বাগত জানান। সাইফুদ্দীন বালক রাজা আল-মালিকুস সালিহকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠেন। সাক্ষাতের পর সাইফুদ্দীন আল-মাবারিকের কূপের পাড়ে নির্মিত তাঁর তাঁবুতে চলে যান। সেখানে তিনি অনেক দিন অবস্থান করেন।'

দু'জন ঐতিহাসিক লিখেছেন, সাইফুদ্দীন আল-মালিকুস সালিহকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি আমার পত্রের জবাব দিলেন না কেনো? কিন্তু প্রশ্ন শুনে আল-মালিকুস সালিহ বিস্মিত হন, না তো, আমি তো পরদিনই আপনার পত্রের লিখিত জবাব পাঠিয়ে দিয়েছি! তাতে আমি লিখেছি, আপনি চিন্তা করবেন না। এই সন্ধিচুক্তি স্রেফ প্রতারণা। সময় নেয়ার জন্য আমি আইউবীর সঙ্গে এই প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করেছি।'

'আমি আপনার কোনো পত্র পাইনি'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমি তো এই ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম যে, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করে ভুল করেছেন এবং আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন।'

আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে তার দু'জন সালারও ছিলো। যার মাধ্যমে বার্তাটি প্রেরণ করা হয়েছিলো, তারা তৎক্ষণাৎ তাকে ডেকে পাঠায়। সে এসে কোন্ দূত পত্র নিয়েছিলো, তার নাম জানায়। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে জানা গেলো, সে যেদিন বার্তা নিয়ে গিয়েছিলো, সেদিনের পর থেকে আর তাকে দেখা যায়নি। তুমুল দৌড়-ঝাঁপ ও ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু দূতের কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না। লোকটির বাড়ি কোথায় কেউ জানে না। এখানে যে জায়গায় থাকতো, সেখানে তার বিছানাপত্র পড়ে আছে। কিন্তু নিজে নেই। সে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে পৌঁছিয়ে দিতে পারে, এমন কল্পনাও কারো মনে ছিলো না।

বিষয়টি আল-মালিকুস সালিহ'র খৃস্টান উপদেষ্টাকে অবহিত করা হলো। তারা অভিমত ব্যক্ত করে– দূত হয়তো সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর ছিলো কিংবা সাইফুদ্দীনের নিকট যাওয়ার পথে সে আইউবীর গেরিলাদের হাতে ধরা পড়ে গেছে এবং তারা তাকে হত্যা করে ফেলেছে। তবে ঘটনা যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে, এই ঘটনার পর সালাহুদ্দীন আইউবী তার যুদ্ধ প্রস্তুতি নিশ্চয় তীব্র করে তুলেছেন। এমনও হতে পারে, এখন তিনিই আগে হামলা করে

বসবেন। এর মোকাবেলায় আমাদের সবক'টি বাহিনীর যতো দ্রুত সম্ভব একত্রিত করে আইউবীর উপর আক্রমণ চালাতে হবে।'

খৃস্টানদের এটাই কামনা যে, মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক। একই দিনে মসুল ও হাররানে বার্তা প্রেরণ করা হলো যে, বাহিনী যে অবস্থায় থাকুক না কেনো, এক্ষুণি হাল্‌ব পাঠিয়ে দেয়া হোক। হাররানের শাসনকর্তা গোমস্তগীন কিছুটা ইতস্তত করলেও বৈঠকে বসে সকলের মঝে প্রকাশ্য বিরোধিতা করলেন না। এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হলো যে, সবক'টি বাহিনী এক হাই কমান্ডের অধীনে কাজ করবে এবং সুপ্রিম কমান্ডার থাকবেন সাইফুদ্দীন। গোমস্তগীন তার বাহিনীকে পাঠিয়ে দিলেন বটে; কিন্তু নিজে হালবে বসে থাকাই ভালো মনে করলেন। তিনি সাইফুদ্দীনের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারলেন না।

দু'-তিন দিনে বাহিনীত্রয় হাল্‌ব এসে একত্রিত হয়ে যায়। খৃস্টানরা অস্ত্র ও অন্যান্য সামানপত্র পাঠিয়ে দেয়। তারা প্রয়োজন অনুপাতে আরো সাহায্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাহিনী রওনা করিয়ে দেয়। তাড়াহুড়ো করে আক্রমণের পরিকল্পনা ঠিক করা হয়। এই অভিযানের সংবাদ গোপন রাখার জন্য রাতে পথচলা এবং দিনে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য বিপুলসংখ্যক কমান্ডোসেনা পথের ডানে-বাঁয়ে এই বলে ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, কোনো পথিকও যদি চোখে পড়ে, ধরে হাল্‌ব পাঠিয়ে দেবে। যাতে অভিযানের সংবাদ গোপন থাকে।

রওনা হওয়ার প্রাক্কালে সাইফুদ্দীন, দাউদ ও হারিছকে ডেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন– 'তোমরা বিপদের সময় আমার সঙ্গ দিয়েছো। যুদ্ধের পর তোমাদের পদোন্নতি দেয়া হবে এবং পুরস্কারও পাবে।' তিনি হারিছকে বললেন– 'আমার মাথার উপর তোমার বোনের একটি কর্তব্য আছে। আমি তার সম্মুখে তখন যাবো, যখন আমি এই কর্তব্য আদায় করার যোগ্য হবো।' হারিছকে বিস্মিত হতে দেখে তিনি বললেন– 'ফাওজিয়া বলেছিলো, আপনি যদি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তরবারী নিয়ে এবং তার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আসতে পারেন, তখন আমি আপনার সঙ্গে চলে যাবো...। হারিছ! আমি যদি জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারি, তাহলে তোমার বোন মসুলের রাণী হবে।'

'ইনশাআল্লাহ'– হারিছ বললো– 'আমরা আপনাকে বিজয়ী বেশেই ফিরিয়ে আনবো। আচ্ছা, তিন বাহিনী কি একত্রে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ'– সাইফুদ্দীন জবাব দেন– 'আর আমি এই সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি থাকবো।'

'জিন্দাবাদ'– দাউদ স্লোগান দিয়ে ওঠে– 'এবার পালাবার পালা আইউবীর।'

দাউদ ও হারিছ ভৃত্যসুলভ কথাবার্তা বলে। সাইফুদ্দীনকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এবং বারবার ফাওজিয়ার নাম উল্লেখ করে তার থেকে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও গতিবিধি জেনে নেয়।

'তোমরা তোমাদের বাহিনীতে চলে যাও'– সাইফুদ্দীন বললেন– 'আমার রক্ষী বাহিনী এসে গেছে। আমি তোমাদেরকে আজীবন স্মরণ রাখবো।'

রাতের একটা উপযুক্ত সময়ে রওনা হয় তিন বাহিনী। দাউদ ও হারিছ মসুলের একটি ইউনিটে গিয়ে যোগ দেয়। হারিছ অনেকেরই পরিচিত। আগে সে এ বাহিনীতেই কাজ করেছে। দাউদকে কেউ চেনে না। হারিছ তাকে মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের প্রেরিত লোক বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। ব্যস্ততার কারণে কেউ দাউদকে যাচাই করে দেখার সুযোগ পায়নি।

তিন সারিতে সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে তিন বাহিনী। মধ্যরাত পর্যন্ত চলার পর বাহিনী একটি পার্বত্য এলাকায় এসে উপনীত হয়। ফলে সৈন্যদের সারি বিন্যাস অক্ষুণ্ন রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দাউদ হারিছকে বললো– 'এটাই মোক্ষম সুযোগ। চলো, পালাই।'

রাতের অন্ধকারকে পুঁজি করে দু'জন ধীরে ধীরে নিজ নিজ ঘোড়া একদিকে সরিয়ে নিতে এবং বাহিনী থেকে আলাদা হতে থাকে। দাউদের পরিকল্পনা হলো, দূরে গিয়ে তীব্র গতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে পালিয়ে যাবে। দিনে বাহিনীগুলো ছাউনী ফেলে অবস্থান গ্রহণ করবে আর তারা তুর্কমান পৌঁছে সালাহুদ্দীন আইউবীকে আক্রমণের সংবাদ জানাবে। এভাবে সুলতান সংবাদটা একদিন আগেই পেয়ে যাবেন এবং দুশমনকে স্বাগত জানানোর আয়োজন করে ফেলবেন। দাউদের পূর্ণ বিশ্বাস, এই পরিকল্পনা তার সফল হবে। কিন্তু তার জানা ছিলো না, এতদঞ্চলের চারদিকে শত্রুপক্ষের গেরিলা গুপ্তচর ছড়িয়ে রয়েছে।

তারা ডানদিকে অনেক দূরে সরে যায়। এখন আর কোনো সমস্যা নেই মনে করে এবার তারা তুর্কমান অভিমুখে রওনা হয়। এখনও ঘোড়া হাঁকায়নি। গতি কিছুটা তীব্র করেছে মাত্র। দীর্ঘ পথ চলার পর ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সামনের বাকি পথ অতিক্রম করতে হবে অবিরাম গতিতে। তাই

ঘোড়াগুলোকে কিছুক্ষণ আরাম দেয়া আবশ্যক।

রাতের শেষ প্রহর। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। দাউদ ঘোড়া থেকে নেমে একটি টিলায় চড়ে সাইফুদ্দীনের বাহিনী যে পথে অগ্রসর হওয়ার কথা, সেদিকে তাকায়। কিন্তু দূরে ধূলি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দাউদ নিশ্চিন্ত হয় যে, তারা বাহিনী থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। এখন তারা নিরাপদ। কিন্তু এই ধারণাটা তার সঠিক নয়। কেউ তাকে দেখছে। তাকে অনুসরণ করছে। তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে।

দাউদ নিশ্চিন্ত মনে নীচে নেমে আসে। ঘোড়ায় চড়ে উভয়ে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয়। এলাকটা টিলায় ঘেরা ও বালুকাময়। দাউদ ও হারিছ দু'টি টিলার মাঝখান দিয়ে পথ চলছে। সামনে মোড়। মোড়ে পৌঁছামাত্র অকস্মাৎ সম্মুখ থেকে চারটি ঘোড়া ছুটে এসে তাদের প্রতি বর্শা তাক করে দাঁড়িয়ে যায়।

'ঘোড়া থেকে নেমে এসো।' এক আরোহী হুংকার দিয়ে বললো।

'আমরা মুসাফির।' দাউদ বললো।

'মুসাফির হলে মসুলের বাহিনী থেকে দূরে থাকতে না'– অশ্বারোহী বললো– 'পথচারীদের সঙ্গে এসব অস্ত্র থাকে না, যেগুলো তোমাদের সাথে আছে। তোমরা যারাই হয়ে থাকো, আমাদের সঙ্গে মসুল যেতেই হবে। আমরা তোমাদের ছাড়তে পারবো না। ঘোড়া ঘুরাও।'

লোকগুলো হাল্‌বের গেরিলা সেনা, যাদেরকে সন্দেহভাজন লোকদেরকে ধরে হাল্‌ব নিয়ে যাওয়ার জন্য সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তারা দাউদ ও হারিছকে ঘিরে ফেলে। দাউদ হারিছকে কানে কানে বললো– 'সময় এসে গেছে ভাই।' হারিছ তার ঘোড়ার লাগাম নাড়া দেয়। ছুটে চলার জন্য তার ঘোড়া সামনের দু'পা উপরে তোলে। ঘোড়া ছুটতে শুরু করলে হারিছ তার সামনের অশ্বারোহীর বুকে বর্শা বিদ্ধ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ততক্ষণে তার বাঁ-দিকের অশ্বারোহীর বর্শা তার কাঁধে এসে গেঁথে যায়। দাউদ অভিজ্ঞ গেরিলা সৈনিক। সে ঘোড়া হাঁকিয়ে মোড় ঘুরিয়ে একটা চক্কর কেটে এক অশ্বারোহীকে ঘায়েল করে ফেলে।

তারা চারজন। আর এরা দু'জন। জায়গাটা ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করার উপযোগী নয়। উভয় দিকে টিলা। কিছুক্ষণ ঘোড়াগুলো লম্ফঝম্ফ করতে থাকে। পরস্পর টক্কর খেতে থাকে বেশক'টি বর্শা। হারিছ ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে। দাউদও আহত হয়ে পড়েছে। দেহের দু'তিন স্থানে তার গভীর ক্ষত।

কিন্তু তার চৈতন্য ঠিক আছে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। চার অশ্বারোহীর কেউ নিহত, কেউ গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে আছে। দাউদও গুরুতর আহত।

দাউদ উঠে দাঁড়ায়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে হারিছের গ্রাম অভিমুখে রওনা হয়। হারিছের খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। দাউদ নিশ্চিত, হারিছ মারা গেছে। নিজেও শেষ পর্যন্ত বাঁচবে না বলে তার ধারণা। তার দেহঝরা রক্তে ঘোড়ার জিন ও পিঠ লাল হয়ে গেছে। তার জানা মতে এখান থেকে তুর্কমান অপেক্ষা হারিছদের বাড়ি নিকটে। হারিছের পিতাই এখন তার ভরসা। তার আশা, হারিছদের বাড়ি পর্যন্ত জীবিত পৌঁছতে পারলে বৃদ্ধকে বলবে- 'শহীদ পুত্রের আত্মার শান্তির জন্য এক্ষুণি তুর্কমান চলে যান এবং সুলতান আইউবীকে সতর্ক করুন।

দাউদ ঘোড়া হাঁকায়। কিন্তু ঘোড়া যতোবেশী নড়াচড়া করছে, তার ক্ষতস্থানগুলো থেকে ততোবেশী রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পিপাসায় তার কণ্ঠনালীটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে তার। দাউদ দোআ-কালাম পড়তে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর পর আকাশপানে মাথা তুলে উচ্চস্বরে বলছে- 'জমিন ও আসমানের মালিক! তোমার রাসূলের উসিলা করে বলছি, আমাকে আর অল্প কিছু সময়ের জন্য জীবন দান করো।'

এখন আর দাউদ ঘোড়া হাঁকাচ্ছে না, বরং ঘোড়া তাকে নিয়ে এগিয়ে চলছে। এবার দাউদের মনে হচ্ছে, তার দেহের জোড়াগুলো যেনো আলাদা হয়ে যাচ্ছে। একবার মাথাটা একদিকে হেলে গিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। দাউদ নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে।

❖ ❖ ❖

আবারো ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় দাউদ। নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু পারলো না। দাউদ তার পায়ের নীচে মাটির অস্তিত্ব অনুভব করে। তার চোখের সম্মুখে শুধুই অন্ধকার।

একসময় যখন খানিক চৈতন্য ফিরে আসে, তখন দাউদ উপলব্ধি করে এখন রাত এবং তাকে কে একজন আগলে রেখেছে। লোকটাকে শত্রু মনে করে তার থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা শুরু করে। তার কানে এক নারীকণ্ঠ প্রবেশ করে- 'দাউদ! তুমি ঘরে আছো, ভয় পেও না।' দাউদ কণ্ঠটা চিনে ফেলে- ফাওজিয়ার কণ্ঠ। চেতনাহীন অবস্থায় নিজে নিজেই সে হারিছের বাড়ি এসে

পৌঁছেছিলো। আল্লাহ তাকে পথ দেখিয়ে গন্তব্যে নিয়ে এসেছেন।

'বাপজান কোথায়?' জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দাউদের প্রথম উক্তি।

'তিনি বাইরে চলে গেছেন'– ফাওজিয়া জবাব দেয়– 'আগামীকাল কিংবা পরশু আসবেন।'

ফাওজিয়া ও তার ভাবী দাউদের ক্ষতস্থান মুছতে শুরু করে। এ সময়ে দাউদ পানি তলব করে। ফাউজিয়া পানি এনে দিলে দাউদ তা পান করে বললো– 'ফাওজিয়া! তুমি বলেছিলে পুরুষের কাজ নারীরাও করতে পারে। আমার ক্ষতস্থান ধুয়ে লাভ নেই। ভেতরে রক্ত নেই। আমি সুস্থ থাকলে যতো প্রয়োজনই হোক, তোমাদেরকে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দিতাম না। কিন্তু বিষয়টা আমার-তোমার ব্যক্তিগত নয়। তুমি সাহস করলে এবং জীবন ও সম্ভ্রমের ঝুঁকি নিলে একটি জাতীয় স্বার্থ রক্ষা পেতে পারে। অবর্ণনীয় এক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে ইসলামী দুনিয়া।'

দাউদ ফাওজিয়াকে কিভাবে তুর্কমান যেতে হবে বুঝিয়ে দেয়। তারপর হালব, হাররান ও মসুলের বাহিনীসমূহ যৌথ কমান্ডের অধীনে কিভাবে আসছে, কোন্ দিক থেকে আসছে এবং তাদের পরিকল্পনা কী, ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে বললো– 'তোমার ভাই এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে শাহাদাতবরণ করেছে।'

ফাওজিয়া প্রস্তুত হয়ে যায়। তার সঙ্গে প্রস্তুতি গ্রহণ করে হারিছের স্ত্রীও। একটি ঘোড়া নিজেদের সংরক্ষণে আছে। আর একটি আছে দাউদের। ফাওজিয়া ও তার ভাবী দাউদকে এই অবস্থায় ঘরে রেখে কিভাবে যাবে ভাবছে।

'ফাওজিয়া'– দাউদ ক্ষীণ কণ্ঠে বললো– 'আমার কাছে এসো।'

ফাওজিয়া দাউদের নিকট আসে। দাউদ তার ডান হাতটা মুঠো করে ধরে বহু কষ্টে ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা টেনে বললো– 'সত্যের পথের পথিকদের বিবাহ আকাশে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তাদের বরযাত্রা গন্তব্যে পৌঁছে কন্টকাকীর্ণ পথ বেয়ে। আমাদের বিয়ের উৎসবে আকাশে তারকার বাতি প্রজ্জ্বলিত করা হবে।'

দাউদের মাথাটা একদিকে কাত হয়ে ঢলে পড়ে। ফাওজিয়া চিৎকার দেয়– 'দাউদ!' ততক্ষণে দাউদের আত্মা ইহজগত ত্যাগ করে চলে গেছে অনন্ত শান্তিময় জান্নাতে। ফাওজিয়ার ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হয় ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ফাওজিয়াকে সবকিছু বলে-বুঝিয়ে দাউদ শাহাদাত বরণ করে। ঘরটা আল্লাহর হেফাজতে তুলে দিয়ে ফাওজিয়া ও তার ভাবী বেরিয়ে পড়ে। পিঠে জিন কষে এক ঘোড়ায় ফাওজিয়া এবং অপর ঘোড়ায় হারিছের স্ত্রী চড়ে বসে। দাউদের ঘোড়ার পিঠে চপচপে রক্তের দাগ। ঘোড়া দু'টো গ্রাম থেকে বেরিয়ে যায়। মেয়ে দু'টো আল্লাহর উপর ভরসা করে গন্তব্যপানে এগিয়ে চলে। পথ তাদের অজানা। দাউদ ফাওজিয়াকে একটি তারকার কথা বলেছিলো। সেই তারকার অনুসরণে তারা এগিয়ে যেতে থাকে।

তিন বাহিনী দিনভর অবস্থান করার পর রাতে আবার রওনা হয়। তুর্কমান এখন আর বেশি দূরে নয়। সুলতান আইউবী তুর্কমান অভিমুখে ধেয়ে আসা ঝড় সম্পর্কে বেখবর। তিনি অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন বটে; কিন্তু এবার তার শত্রুরা ভালো আয়োজন করে রেখেছে। ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন– সালাহুদ্দীন আইউবীর পক্ষে এই সাইমুমের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া বাহ্যত সম্ভব ছিলো না। তাঁর সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে পড়া নিশ্চিত ছিলো। তিনি তার সালারদের সম্মুখে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, হাল্ব, হাররান ও মসুলের যোদ্ধারা এতো দ্রুত আক্রমণ করতে সক্ষম হবে না। অথচ সাইফুদ্দীনের প্রতি আল-মালিকুস সালিহ'র পত্র তার হাতে এসে পৌঁছেছিলো।

ফাওজিয়া ও তার ভাবী ভুলেই গেছে যে, তারা নারী। পথে তারা কী কী সমস্যায় পড়তে পারে, সেই চিন্তা তাদের মাথায় নেই। ভাবনা শুধু একটাই– কখন তুর্কমান পৌঁছে সুলতান আইউবীকে সংবাদ পৌঁছাবেন, আপনার শত্রুরা ধেয়ে আসছে; আপনি প্রস্তুত থাকুন।

তারা রাতটা ঘোড়ার পিঠে কাটিয়ে দেয়। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। তারা টিলা ও বালুকাময় এলাকার কোল ঘেঁষে অগ্রসর হচ্ছে। হঠাৎ ফাওজিয়া দেখতে পায়, একটি পাথরের সঙ্গে হেলান দিয়ে এক লোক উদাস মনে বসে আছে। লোকটার পরিধানের কাপড় রক্তে লাল হয়ে আছে। ফাওজিয়া তার ভাবীকে ডেকে বললো– 'দেখ ভাবী! একজন লোক বসে আছে; জখমী মনে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের থামা যাবে না। কে বলবে, কে না কে?' তবে লোকটার পাশ দিয়েই তাদের যেতে হবে। তারা দেখতে পায়, লোকটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

ঘোড়া লোকটার নিকটে এসে পৌঁছলে ফাওজিয়া চিৎকার করে ওঠে– 'হারিছ! ভাবী!' বেঁচে আছে। তার দেহে অনেকগুলো ক্ষত।

ফাওজিয়াদের সঙ্গে পানি আছে। তারা হারিছকে পানি পান করায়। কিছুটা চৈতন্য আসলে হারিছ জিজ্ঞেস করে– 'আমি কি ঘরে? দাউদ কোথায়?'

ফাওজিয়া ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনায়। দাউদের শাহাদাতের সংবাদ জানায় এবং তারা কী কাজে কোথায় যাচ্ছে, হারিছকে অবহিত করে। হারিছ বললো– 'আমাকেও ঘোড়ায় তুলে নাও এবং সময় নষ্ট না করে তুর্কমান অভিমুখে ঘোড়া হাঁকাও।'

ফাওজিয়া ও তার ভাবী হারিছকে পাজাকোলা করে ঘোড়ার পিঠে তুলে নেয়। ফাওজিয়া তার পেছনে বসে। হারিছের দেহে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। লোকটা বেঁচে আছে শুধু আত্মার শক্তিতে। কর্তব্য এখানো শেষ হয়নি বলেই তার এই বেঁচে থাকা। ফাওজিয়া তার পিঠটা নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নিয়ে তাকে এক বাহু দ্বারা আগলে রাখে। হারিছ অস্ফুট স্বরে ডান-বাম বলে বোনকে পথনির্দেশ করছে।

সাইফুদ্দীনের কমান্ডে আইউবীর শত্রু বাহিনী তুর্কমানের কাছাকাছি পৌঁছতে আর বেশি বাকি নেই। এদিকে ফাওজিয়া, হারিছ ও হারিছের স্ত্রী এক নিরাপদ পথে তুর্কমানের দিকে এগিয়ে চলছে। ধীরে ধীরে দিগন্ত থেকে আকাশ বাদামী বর্ণ ধারণ করছে এবং এই রংটা উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। ফাওজিয়ার ভাবীর দিগন্তপানে চোখ পড়া মাত্র আঁৎকে ওঠে এবং চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে– 'ফাওজিয়া, ওদিকে চেয়ে দেখ।' হারিছ ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'কী ফাওজিয়া!'

'ধূলিঝড়।' ফাওজিয়া বললো। তার অন্তরে ভয় ঢুকে গেলো।

হারিছ এই ভূখণ্ডের এসব ধূলিঝড় সম্পর্কে অবহিত। এলাকাটা পাথুরে বটে; কিন্তু কিছু বালুকাময় অঞ্চলও আছে। ধূলিঝড় শুরু হলে টিলা ও পাথর খণ্ডগুলো বালিতে সমাধিস্ত হয়ে যায়। মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্য তা কেয়ামতের রূপ ধারণ করে। কিন্তু এইমাত্র ফাওজিয়া ও তার ভাবী যে ঝড় দেখতে পেলো, তা অত্র অঞ্চলের আরো পাঁচ-দশটি ভয়ংকর ঝড়ের একটি, যেটি ইতিহাসের পাতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। মেজর জেনারেল আকবর খান তার ইংরেজি গ্রন্থ 'গেরিলা ওয়ার ফেয়ার'-এ কয়েকজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও মুসলিম কাহিনীকারের সূত্রে লিখেছেন– 'যেদিন আল-মালিকুস সালিহ, গোমস্তগীন ও সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনী সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন, ঠিক সেসময় এমন এক ধূলিঝড় উঠেছিলো যে, নিজের নাকের আধা হাত দূরে কিছু দেখা যাচ্ছিলো

না। সুলতান আইউবীর জানা ছিলো না যে, এই ঝড়ের মাঝে আরো একটি ঝড় ধেয়ে আসছে তাঁর দিকে।'

ইতিহাসে একথাও লিখা আছে– 'এই পরিস্থিতিতে সম্মিলিত বাহিনী সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণে বিলম্ব করে, যা ছিলো মূলত প্রধান সেনানায়কের ভুল সিদ্ধান্ত। সত্যের পথের পথিকদের সাহায্য করা আল্লাহর ওয়াদা। বলা যেতে পারে, এই প্রক্রিয়ায় মহান আল্লাহ দু'টি বীরাঙ্গনা মুসলিম নারীর ঈমানী চেতনার লাজ রক্ষা করেছেন। এক বোন তার আহত মুজাহিদ ভাইকে আগলে ধরে মুজাহিদীনে ইসলামকে কাফিরদের আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য ছুটে চলছিলো। মনে তার নিজের কিংবা ভাইয়ের কোনো ভাবনা নেই। ভাবনা তার একটাই– ইসলাম ও সালতানাতে ইসলামিয়া।'

ঝড় এতো দ্রুত ধেয়ে আসে যে, কেউ আত্মসংবরণ করার সুযোগ পায়নি। সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে বড় বড় পাথরের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের উট-ঘোড়াগুলো নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। কমান্ডারদের দৃঢ় বিশ্বাস, অল্প সময়ের মধ্যে ঝড় থেমে যাবে এবং তারা বাহিনীকে সংগঠিত করে নিতে সক্ষম হবে। কিন্তু ঝড় উত্তরোত্তর তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলছে।

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবীর ছাউনি এলাকার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁবুগুলো উড়ছে। রশিবাঁধা উট-ঘোড়াগুলো প্রলয় সৃষ্টি করে ফিরছে। বালি তো আছেই, পাশাপাশি নুড়ি-কংকরও উড়ে এসে গায়ে বিদ্ধ হচ্ছে। চারদিকের আর্ত-চিৎকার এমন রূপ ধারণ করেছে, যেনো প্রেতাত্মারা চিৎকার করছে। সূর্য এখনো উদিত হয়নি। কিন্তু মনে হচ্ছে, মরুঝড় আকাশের সূর্যটাকেও উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কমান্ডারগণ চিৎকার করে ফিরছেন। সৈন্যরা উড়ন্ত তাঁবুগুলোকে সামলাতে গিয়ে নিজেরাই বেসামাল হয়ে পড়ছে।

তিন-চারজন সৈনিক একটি পাথরের আড়ালে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। ধীর-পদবিক্ষেপে অগ্রসরমান একটি ঘোড়া এসে তাদের উপর উঠে পড়ার উপক্রম হয়। সৈন্যরা এদিক-ওদিক হুমড়ি খেয়ে পড়ে চিৎকার করে ওঠে– 'ঘোড়াটাকে থামাও। হতভাগা! কোথাও আড়াল হয়ে যাও।'

ঘোড়া থেমে যায়। এক সৈনিক তার সঙ্গীদের বললো– 'কিছু বলো না, মহিলা।' অন্য একজন বললো– 'দু'জন।'

তারা ফাওজিয়া ও তার ভাবী। ঝড়ের কবলে পড়ে পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছে মনে করে সৈনিকরা তাদের ঘোড়ার বাগ ধরে ফেলে এবং একটি

পাথরের আড়ালে নিয়ে যায়।

'আমাদেরকে সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছিয়ে দিন'– চারদিকের হট্টগোলের মধ্যে চিৎকার করে ফাওজিয়া বললো– 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কোথায়? আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমাদের তাড়াতাড়ি সুলতানের নিকট নিয়ে যান। অন্যথায় সকলে মারা পড়বেন।'

সৈনিকরা ঘোড়ার উপর একজন রক্তাক্ত জখমীও দেখতে পায়। তারা লাগাম ধরে বড় কষ্টে ঘোড়াটাকে সুলতান আইউবীর তাঁবুর নিকট নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে তাঁবু নেই। উড়ে গেছে। সুলতান কোথায় আছেন, জেনে নিয়ে কমান্ডার মেয়েগুলোকে তাঁর নিকট নিয়ে যায়। সুলতান বৃহদাকার একটি পাথরের আড়ালে বসে আছেন। দু'টি মেয়েকে দেখেই সুলতান দ্রুত দাঁড়িয়ে যান।

সর্বাগ্রে হারিছকে ঘোড়া থেকে নামানো হলো। এখনো সে জীবিত। ফাওজিয়া ও তার ভাবী দ্রুত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কথা বলতে শুরু করে। ফাওজিয়া সুলতান আইউবীকে জানায়, সম্মিলিত বাহিনী আক্রমণের জন্য এসে পড়েছে। হারিছ অস্ফুট স্বরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য প্রদান করে এবং কথা বলতে বলতেই চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর ঝড় প্রশমিত হতে শুরু করে। সুলতান আইউবী তার সালারদেরকে তলব করে নির্দেশ দেন, তাঁবু গুটানোর প্রয়োজন নেই। সৈনিকদেরকে ইউনিটে ইউনিটে একত্রিত করো। কমান্ডো দলটিকে এক্ষুণি ডেকে আনো। কী ঘটতে যাচ্ছে, সুলতান সালারদের তা অবহিত করেন এবং রাতারাতি কী কী মহড়া দিতে হবে ও কী কী কাজ করতে হবে বলে দেন।

ঝড়ের তীব্রতা অনেকটা কমে গেছে। কিন্তু রাতের ঘোর আঁধারে ছেয়ে আছে প্রকৃতি। সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যরা নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক সৈনিক শুয়ে পড়েছে। এই বিশৃঙ্খলার কারণে রাতের আক্রমণ মুলতবী করা হয়েছে। পশুগুলোও এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

মধ্য রাতের পর। সাইফুদ্দীনের সৈন্যরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু সুলতান আইউবীর ক্যাম্প সম্পূর্ণ সজাগ ও কর্মতৎপর। আইউবী সাইফুদ্দীনকে স্বাগত জানানোর জন্য কী কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন, সাইফুদ্দীদের তা অজানা।

❖ ❖ ❖

ভোর হয়েছে। সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর মাঝে চরম বিশৃঙ্খলা

বিরাজ করছে। রসদ উড়ে গেছে। দিশেহারা উট-ঘোড়াগুলো সৈন্যদের পিষে মেরেছে। সবকিছু গুছিয়ে সৈন্যদের সংগঠিত করতে দিনের অর্ধেকটা কেটে গেলো। সাইফুদ্দীন সম্মুখ দিক থেকে প্রকাশ্যে সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করার জন্য তার সালারদের নির্দেশ দেন। তিনি জানেন, সুলতান আইউবী তার এই অভিযান সম্পর্কে বে-খবর।

বিকাল বেলা। সাইফুদ্দীনের বাহিনী আইউবী বাহিনীর উপর আক্রমণ করলো। ডানে-বাঁয়ে টিলা আর বড় বড় পাথর। মুহূর্তের মধ্যে অপ্রস্তুত আইউবী বাহিনী নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা। সাইফুদ্দীনের কামনাও তা-ই। কিন্তু একী! টিলা আর পাথরের আড়াল থেকে উল্টো হামলাকারীদের উপরই তীরবৃষ্টি বর্ষিত হতে শুরু করে। সম্মুখ দিক থেকে ধেয়ে আসতে শুরু করে আগুনের গোলা। দাহ্য পদার্থ ভর্তি পাতিল এসে সৈন্যদের মাঝে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আর ভেতরের তরল পদার্থগুলো ছিটিয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার উপর মিনজানীক দ্বারা নিক্ষিপ্ত অগ্নিগোলা এসে পড়ছে আর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠছে।

সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ থেমে গেছে। সাইফুদ্দীন তার বাহিনীকে পেছনে সরিয়ে নিয়ে যান এবং আক্রমণের বিন্যাস ও পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলেন। কিন্তু তার সৈন্যরা পেছনে সরে যাওয়ামাত্র পেছন দিক থেকেও তাদের উপর এমন তীব্র আক্রমণ আসে যে, তাদের পরিকল্পনা ও মনোবল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

এমনি আক্রমণ হলো বাহিনীর উভয় পার্শ্বের উপরও। সাইফুদ্দীনের কেন্দ্রীয় কমান্ড শেষ হয়ে গেছে। রাতে আক্রমণ অব্যাহত থাকে। সাইফুদ্দীন আরো পেছনে সরে আসেন। এবার শুরু হলো তীরবৃষ্টি। সুলতান আইউবীর বাহিনী সারারাত তৎপর থাকে। শেষ রাতের আলো-আঁধারিতে সুলতান একটি টিলার উপর উঠে রণাঙ্গনের পরিস্থিতি অবলোকন করেন। তার সম্মুখে এখন যুদ্ধের শেষ পর্ব। তিনি দূত মারফত তাঁর রিজার্ভ বাহিনীর নিকট নির্দেশ প্রেরণ করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ধাবমান অশ্বের ক্ষুরধ্বনিতে মাটি কেঁপে ওঠে। পদাতিক বাহিনী ডান-বাম থেকে বেরিয়ে আসে। আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ মুখরিত হয়ে ওঠে।

এই আক্রমণের ধকল সামলানোর সাধ্য সাইফুদ্দীনের নেই। তারা এখন সম্পূর্ণরূপে আইউবী বাহিনীর বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ। সম্মুখ থেকে তীব্র আক্রমণ এসে পড়ে। শুধু সাইফুদ্দীনের সৈনিকদেরই নয়, স্বয়ং তারও মনোবল ভেঙ্গে

চুরমার হয়ে গেছে। উট-গোড়াগুলো আহত সৈনিকদের পিষে মারছে। অবশেষে তারা যার যার মতো অস্ত্রসমর্পণ করতে শুরু করে।

সুলতান আইউবীর যে বাহিনী সাইফুদ্দীনের পেছনে ছিলো, তারা এগিয়ে আসছে। ডান ও বামদিক থেকে কমান্ডো সেনারা মার মার কাট কাট রবে আঘাতের পর আঘাত হানছে। সাইফুদ্দীনের বাহিনী আইউবীর পিঞ্জিরায় আবদ্ধ হয়ে গেছে।

সুলতান আইউবীর সৈন্যরা সাইফুদ্দীনের কেন্দ্রে পৌঁছে যায়। সেখানে মদের পিপা-পেয়ালা ছাড়া আর কিছুই নেই। সেখান থেকে যাদেরকে গ্রেফতার করা হলো, তারা বললো- 'আমাদের প্রধান সেনা অধিনায়ককে শেষবারের মতো একটি পাথরের আড়ালে দেখেছিলাম। তারপর থেকে আর তার কোন পাত্তা নেই।'

সুলতান আইউবী তাকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিলেন। অনেক অনুসন্ধান করা হলো। কিন্তু পাওয়া গেলো না। তিন বাহিনীর প্রধান সেনা অধিনায়ক তার সৈনিকদেরকে সুলতান আইউবীর দয়ার উপর ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন।

রাতের বেলা। ফাওজিয়া তুর্কমানের সবুজ-শ্যামলিমায় স্থাপিত একটি তাঁবুতে ভাইয়ের লাশের কাছে বসে স্বগতোক্তি করছে- 'আমি রক্তের নদী পার হয়ে এসেছি, যার উপর কোনো পুল ছিলো না। হারিছ! আমি তোমার কর্তব্য পালন করেছি।'

সুলতান আইউবী এসে তাঁবুতে প্রবেশ করেন। ফাওজিয়া জিজ্ঞেস করে- 'খবর কী সুলতান! আমার ভাইয়ের রক্ত বৃথা যায়নি তো?'

'আল্লাহ দুশমনকে পরাজয় দান করেছেন। তুমি জয়ী। তোমার জীবন স্বার্থক। তুমি... ।'

সুলতান আইউবীর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে আসে। তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করে।

জানবাজ

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিজয়ী কমান্ডারদের সম্মুখে দুশমনের অগনিত লাশ পড়ে আছে। দিশেহারা আহত উট-ঘোড়াগুলো হতাহতদের পিষে চলেছে। শত্রু শিবিরের যেসব সৈনিক পালাতে পারেনি, তারা অস্ত্র ত্যাগ করে একস্থানে জড়ো হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক ঢাল-তরবারী, ধনুক-বর্শা, তাঁবু ও অন্যান্য আসবাবপত্র দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন, যেটি তাঁর শত্রুজোটের প্রধান সেনানায়ক সাইফুদ্দীনের হেডকোয়ার্টার ও বিশ্রামাগার ছিলো। গাজী সাইফুদ্দীন তার বাহিনীর পরাজয় ও সুলতান আইউবীর জয় নিশ্চিত টের পেয়ে কাউকে কিছু না বলে কাপুরুষের ন্যায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। তার পলায়ন যেমন ছিলো গোপনীয়, তেমনি ছিলো লজ্জাজনক। হেরেমের বেশ ক'টি রূপসী মেয়ে তার সঙ্গে ছিলো, ছিল নর্তকী ও সোনাদানা। নিজ সৈন্যদের ভাতা প্রদান ও আইউবীর লোকদের ক্রয় করার জন্য তিনি এই স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহামূল্যবান মনোহরী কাপড়ের তাঁবু ও শামিয়ানার তৈরি বিশ্রামাগারটি যেনো একটি রাজ প্রাসাদ। সে যুগের যুদ্ধবাজ শাসকবর্গ এরূপ মহল ও যতোসব বিলাস সামগ্রী সঙ্গে রাখতেন। গাজী সাইফুদ্দীন তেমনই এক শাসক ছিলেন। তিনি মদের পিপা এবং রং-বেরঙের পেয়ালা-মটকাও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

সুলতান আইউবী মন পাগলকরা এই প্রাসাদটির প্রতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ সাইফুদ্দীনের পালংকটির উপর তাঁর চোখ পড়ে। পালংকের উপর সাইফুদ্দীনের তরবারীটি পড়ে আছে। পালাবার সময় তিনি তারবারীটাও নিতে ভুলে গেছেন। সুলতান আইউবী ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে তারবারীটা হাতে তুলে নেন। ধীরে খাপ থেকে তরবারীটা বের করেন। তারবারীটা ঝিকমিক করছে। সুলতান তারবারীটার প্রতি এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ পর মুখ ঘুরিয়ে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন সালারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'মুসলমানের তরবারীর উপর যখন নারী ও মদের ছায়া পড়ে,

তখন সেটি লোহার অকেজো টুকরায় পরিণত হয়ে যায়। এই তরবারীর ফিলিস্তিন জয় করার কথা ছিলো। কিন্তু খৃস্টানরা একে তাদের পাপ-পংকিলতায় চুবিয়ে কাঠের অকেজো লাঠিতে পরিণত করেছে। যে তরবারী মদ দ্বারা সিক্ত হয়, সেই তরবারী রক্ত থেকে বঞ্চিত থাকে।'

সাইফুদ্দীনের বিশ্রামাগারের পার্শ্বেই আরেকটি প্রশস্ত মনোরম তাঁবু। তার মধ্যে কতগুলো অর্ধনগ্ন রূপসী মেয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তারা তাদের অশুভ পরিণাম চিন্তায় বিভোর। তারা জানে, বিজয়ী বাহিনীর হাতে ধরা খেলে মেয়েদের কী দশা হয়! এমন চিত্তাকর্ষক মেয়েদের মুঠোয় পেলে কে না পশু হয়। কিন্তু সুলতান আইউবীর ঘোষণা শুনে তারা নির্বাক। আইউবী ঘোষণা দিলেন– 'তোমরা মুক্ত। তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো। সসম্মানে ও নিরাপদে সেখানে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।'

সুলতান আইউবীর এই অভাবিত ঘোষণায় তারা আরো সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সুলতানের এই ঘোষণাকে উপহাস মনে করে তারা অধিকতর লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের ভয়ে মুষড়ে পড়ে। সুলতান মেয়েদেরকে নিজের হেফাজতে নিয়ে যান। যুদ্ধের ময়দানে নারীর উপস্থিতিকে সুলতান সহ্য করতেন না। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমরা কতজন ছিলে? তারা জানায়, এখন যে ক'জন আছি, আরো দু'জন ছিলো। তারা এখন নিখোঁজ। তারা মুসলমান ছিলো না। তারা দু'জন সাইফুদ্দীনকে কব্জা করে রাখতো। হয়তোবা তারাও সাইফুদ্দীনের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

সেকালের যুদ্ধ-বিগ্রহে সাধারণত যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে বিজয়ী বাহিনীর সৈন্যরা পরাজিত শত্রু বাহিনীর ফেলে যাওয়া সম্পদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। পরাজিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতির বিশ্রামাগার তথা হেডকোয়ার্টারের উপর লুটিয়ে পড়তো অধিকাংশ সৈনিক। সেখানে থাকতো সম্পদের খাজানা, মদ আর নারী। এসবের দখল নিয়ে তাদের মাঝে বিবাদ-সংঘাতও বেঁধে যেতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সুলতান আইউবীর নীতি ছিলো খুবই কঠোর। কোন অফিসারের জন্যও– তার পদমর্যাদা যতোই উঁচু হোক না কেন– মালে গনীমতে হাত লাগানোর অনুমতি ছিলো না। তিনি কোনো একটি ইউনিটকে মালে গনীমত কুড়িয়ে এক জায়গায় জমা করার দায়িত্ব প্রদান করতেন। তারপর নিজ হাতে তা বণ্টন করতেন। কিন্তু তুর্কমানের যুদ্ধ শেষে সুলতান আইউবী মালে গনীমত সম্পর্কে কোনো নির্দেশ জারি করলেন না। তিনি নিজ বাহিনী এবং শত্রুপক্ষের আহতদের তুলে সেবা-চিকিৎসা এবং

যুদ্ধবন্দীদের আলাদা করার নির্দেশ প্রদান করেন।

সুলতান আইউবী অত্যন্ত কঠোরভাবে রণাঙ্গনের শৃঙ্খলা বিধান করতেন। এই যুদ্ধে তার শত্রুপক্ষ অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করেছিলো। তার কোনো কোনো ইউনিট পলায়নপর শত্রুসেনাদের ধাওয়াও করেছিলো। এই পশ্চাদ্ধাবনেও তারা শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেনি। সুলতান আইউবী ধাওয়াকারীদের ফিরিয়ে আনেন এবং ডান ও বাম পার্শ্বকে ঠিক যুদ্ধ পূর্বের অবস্থার ন্যায় প্রস্তুত রাখেন। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পরও তিনি পার্শ্ব বাহিনীকে প্রত্যাহার করেননি। তাছাড়া তিনি তাঁর রিজার্ভ বাহিনীটিকে তলব করে নিজের কমান্ডে নিয়ে নেন।

'দুশমনের মালপত্র এবং পশুপাল ইত্যাদির ব্যাপারে সুলতানের নির্দেশ কী?'– এক সালার সুলতান আইউবীকে জিজ্ঞেস করেন– 'যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের জয়ী করেছেন।'

'না, আমি এখনো এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হইনি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। আমার পাঠ এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যেও না। সবে আমরা দুশমনের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেছি মাত্র। আমাদের কোনো ইউনিট তাদের পার্শ্ব বাহিনীর উপর হামলা করেছে কি? না, করেনি। আমার সন্দেহ, উভয়টি না হলেও তাদের এক পার্শ্ব নিরাপদ আছে। তারা তিনটি ফৌজের যৌথ বাহিনী ছিলো। তাদের সালার ঈমান-বিক্রেতা হতে পারে; কিন্তু এমন আনাড়ী নয় যে, তার যেসব ইউনিট যুদ্ধে অংশ নেয়নি, তাদেরকে জবাবী হামলার জন্য ব্যবহার করবে না। তার রিজার্ভ বাহিনীও অক্ষত এবং প্রস্তুত আছে।'

'তাদের কেন্দ্র খতম হয়ে গেছে মাননীয় সুলতান!' সালার বললেন– 'তাদেরকে নির্দেশ দেয়ার মতো কেউ অবশিষ্ট নেই।'

'না থাকুক, খৃস্টানদের ভয় তো উড়িয়ে দেয়া যায় না'– সুলতান বললেন– 'যদিও আমার কাছে এই তথ্য নেই যে, খৃস্টানরা কাছে-ধারে কোথায় অবস্থান করছে। কিন্তু এই অঞ্চলটা পাহাড়ী। এখানে টিলাও আছে, বিস্তৃত সমতল ভূমিও আছে। কোথাও ঝোপ-জঙ্গলও আছে। কিছু এলাকা বালুকাময়। চোখে বেশী দূর পর্যন্ত দেখা যায় না। শত্রু আর সাপের উপর কখনো আস্থা রাখা উচিত নয়। ওরা মৃত্যুর সময়ও ছোবল মেরে যায়। সাইফুদ্দীনের সালার মুজাফফর উদ্দীনের কোনো সংবাদ আমার জানা নেই। তোমরা জানো, মুজাফফর উদ্দীন সহজে পালাবার মতো মানুষ নয়। আমি তার অপেক্ষায়

আছি। তোমরা চোখ খোলা রাখো। বাহিনীগুলোকে একত্রিত করো। মুজাফফর উদ্দীন যদি আমার প্রশিক্ষণ না ভুলে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে আমার উপর পাল্টা আক্রমণ চালাবে।'

সুলতান আইউবীর আশংকা ভিত্তিহীন ছিলো না। প্রিয় পাঠক! হামাত যুদ্ধে সাইফুদ্দীনের জনৈক সালার মুজাফফর উদ্দীন ইবনে যাইনুদ্দীনের আলোচনা পড়েছেন। মুজাফফর উদ্দীন এক সময় আইউবী বাহিনীর সালার ছিলেন এবং আইউবীর কেন্দ্রীয় পটভূমিকে সামনে রেখে সুলতান আইউবী যুদ্ধের পরিকল্পনা ঠিক করেন এবং কিভাবে রণাঙ্গনে তাতে রদবদল করেন। মুজাফফর উদ্দীন একে তো জন্মগত যোদ্ধা। অপরদিকে প্রশিক্ষণ অর্জন করেছেন সুলতান আইউবীর নিকট থেকে। সব মিলিয়ে তিনি রণাঙ্গন থেকে পিছপা হওয়ার মতো লোক নন।

মুজাফফর উদ্দীন ছিলেন সাইফুদ্দীনের নিকটাত্মীয় (খুব সম্ভব চাচাতো ভাই)। সুলতান আইউবী যখন মিশর থেকে দামেস্ক আগমন করেন এবং মুসলিম আমীরগণ তার বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান, তখন মুজাফফর উদ্দীন সুলতানকে কিছুই না বলে তার ফৌজ থেকে বের হয়ে শত্রু শিবিরে চলে যান।

তুর্কমানের এই যুদ্ধের আগে হামাত যুদ্ধে মুজাফফর উদ্দীন সুলতান আইউবীর পার্শ্বের উপর এমন তীব্র আক্রমণ করেছিলেন, যার মোকাবেলার জন্য সুলতান আইউবী পার্শ্ব বাহিনীর নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের মতে, সেদিন যদি সুলতান আইউবী নিজে সেনাপতিত্ব না করতেন, তাহলে মুজাফফর উদ্দীন যুদ্ধের গতি পাল্টে দিতেন। সুলতান আইউবী মুজাফফর উদ্দীনকে যুদ্ধবিদ্যার ওস্তাদ বলে স্বীকার করতেন। এবার তুর্কমানের গুপ্তচররা তাকে সম্মিলিত শত্রুবাহিনী সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রদান করেছে, তার মধ্যে একটি হলো, মুজাফফর উদ্দীনও এই বাহিনীতে আছেন। কিন্তু তিনি বাহিনীর কোন্ অংশের সঙ্গে আছেন, তা জানা যায়নি। সুলতান কয়েকজন যুদ্ধবন্দীকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু তারা মুজাফফর উদ্দীনকে বাহিনীতে উপস্থিত থাকার বিষয়টা সত্যায়ন করলেও কেউ বলতে পারেনি তিনি বাহিনীর কোন্ অংশে আছেন।

'হতে পারে বন্দীরা জানা সত্ত্বেও বিষয়টা গোপন রেখেছে'– সুলতান আইউবী তার সালারদের বললেন– 'মুজাফফর উদ্দীন যুদ্ধ না করে ফিরে যাবে আমি বিশ্বাস করি না। সে আমার শিষ্য। আমি তার যোগ্যতা জানি। জানি

তার স্বভাব-চরিত্রও। সে হামলা করবে। পরাজয় নিশ্চিত জানলেও করবে। তবে আমি চাই সে হামলা করুক। অন্যথায় আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী যেনো বলতে না পারে, মুজাফফর উদ্দীনও পালিয়ে গেছে'– সাইফুদ্দীনের সালার মুজাফফর উদ্দীনের কণ্ঠ। তুর্কমান থেকে দু'আড়াই মাইল দূরে ধ্বনিত হচ্ছিলো– 'আমি যুদ্ধ না করে ফিরে যাবো না।'

সুলতান আইউবী যে সময়টায় সাইফুদ্দীনের প্রাসাদোপম বিশ্রামাগারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক সে সময় সাইফুদ্দীনের নিকট সংবাদ পৌঁছে– 'সালাহুদ্দীন আইউবী কিভাবে যেনো আগেই জেনে ফেলেছেন, তার উপর হামলা আসছে। সে কারণেই আমরা তার ফাঁদে আটকা পড়েছি। এখন এখানে যুদ্ধ করা অনর্থক। ভালোয় ভালো আপনারাও ফিরে যান এবং কোনো একটি উপযুক্ত স্থানে যুদ্ধ করানোর জন্য বাহিনীগুলোকে পেছনে সরিয়ে নিন।'

'আপনার যে কোনো আদেশ-নিষেধ মান্য করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই'– মুজাফফর উদ্দীনের এক নায়েব সালার বললো– 'কিন্তু যেখানে আমাদের বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, অনেকে পালিয়ে গেছে, এমতাবস্থায় এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা পাল্টা আক্রমণ করা আমার নিকট যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না।'

'আমার কাছে এখনো যে পরিমাণ সৈন্য আছে, আমি তাদেরকে অপর্যাপ্ত মনে করি না'– মুজাফফর উদ্দীন বললেন– 'আমরা যে বাহিনী নিয়ে এসেছি, এরা তার চার ভাগের এক ভাগ। সুলতান আইউবী এর চেয়েও স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা যুদ্ধ করেন এবং সফল হয়ে থাকেন। আমি তার পার্শ্বের উপর হামলা করবো। এবার আমি তাকে সেই চাল চালতে দেবো না, যেটি তিনি হামাত-এ চেলেছিলেন। তোমরা সবাই আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত থাকো।'

'মসুলের শাসনকর্তা মহামান্য গাজী সাইফুদ্দীন তিনটি ফৌজের এতো বিপুল সৈন্য সত্ত্বেও হেরে গেছেন'– নায়েব সালার বললো– 'আমি আবারো বলবো, এই সামান্য সৈন্য দ্বারা আক্রমণ করা আর তাদেরকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেয়া এক কথা।'

'যারা যুদ্ধের ময়দানে হেরেমের নারী আর মদের মটকা সঙ্গে রাখে, তাদের কাছে তিন নয়, দশটি বাহিনী থাকলেও সেই পরিণতিই বরণ করতে হবে, যা আমাদের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের ভাগ্যে জুটেছে'– মুজাফফর উদ্দীন বললেন– 'আমি মদপান করি। কিন্তু এখানে যদি এক গ্লাস পানিও না জোটে, তবু পরোয়া করবো না। সুলতান আইউবী আমাকে ঈমান নীলামকারী ও

বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করে থাকেন। আমি তাকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছাড়বো না। আমার এই লড়াই হবে দুই সেনাপতির লড়াই। এই যুদ্ধ হবে দুই বীরের যুদ্ধ। এটি হবে দুই অসিবিদের সংঘাত। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ বাহিনীকে প্রস্তুত করো। মনে রাখতে হবে, সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দারা মাটির তলেও দেখতে পায়। তোমাদের ইউনিটগুলোকে আজ রাতে আরো গোপনে নিয়ে যাবে এবং চারদিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত গুপ্তচর ছড়িয়ে দেবে। তারা সন্দেহজনক অবস্থায় কাউকে পেলে ধরে নিয়ে আসবে।'

মুজাফফর উদ্দীন তার সৈন্যদের লুকিয়ে রাখার জন্য একটি স্থান ঠিক করে নেন। আক্রমণের জন্য তিনি কোনো দিন বা সময় নির্ধারন করেননি। তিনি তার নায়েব সালারদের বললেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবী শিয়ালের ন্যায় ধূর্ত এবং খরগোসের ন্যায় গতিশীল। আমি গুপ্তচর মারফত জানতে পেরেছি, তিনি এখনো মালে গনীমত সংগ্রহ করেননি। তার অর্থ হলো, তিনি সম্মুখে অগ্রসর হবেন না এবং আমাদের জবাবী হামলার আংশকা করছেন। আমি তাকে ভালোভাবেই জানি যে, তিনি কোন্ ধারায় চিন্তা করে থাকেন। আমি তাকে ধোঁকা দেবো যে, আমরা সবাই পালিয়ে গেছি এবং এখন আর আক্রমণের কোনো ভয় নেই। এটি হবে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার লড়াই। আমি প্রমাণ করবো, কার বিচক্ষণতা বেশি– আইউবীর না আমার। আইউবী দু'দিনের বেশি অপেক্ষা করবে না। তার মতো আমিও তার গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য আমার গুপ্তচরদের ব্যবহার করবো। যখনই তিনি গনীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন এবং তার দৃষ্টি ডান-বাম থেকে সরে যাবে, আমরা তার পার্শ্বের উপর আক্রমণ চালাবো।'

সুলতান আইউবী এই শংকাই অনুভব করছিলেন।

সুলতান আইউবী তাঁর কিছুসংখ্যক সৈন্যকে সাইফুদ্দীন বাহিনীর ডান-বাম থেকে সরিয়ে পেছনে প্রেরণ করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি কমান্ডোসেনাও রওনা করিয়েছিলেন। এরা তাঁর সেই কমান্ডো ফোর্স, যার প্রত্যেক কমান্ডার ও প্রত্যেক সৈনিক অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও দুঃসাহসী। এরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচরও। এই ফোর্স চার থেকে বারজন করে এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে দুশমনের বিপুল ক্ষতিসাধন করেছিলো। তন্মধ্যে একটি দলের সদস্য সংখ্যা ছিলো বারজন, যার মাত্র তিনজন সৈনিক আর তার কমান্ডার আন-নাসের জীবিত আছে।

আন-নাসের তার দলের সঙ্গে তুর্কমানের রণাঙ্গনে থেকেই সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর পেছনে চলে গিয়েছিলেন। তার টার্গেট হতো সাধারণত দুশমনের রসদ। এবারও তিনি তার কমান্ডোদের ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যান। তার সঙ্গে আছে সলিতাওয়ালা তীর। সামান্য দাহ্য পদার্থ, বর্শা, তরবারী ও খঞ্জর। শত্রুর রসদ এখান থেকে অনেক দূরে। আন-নাসেরের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা হলো, এই ভুখণ্ডটি না উন্মুক্ত ময়দান, না বালুকাময় প্রান্তর। বরং জায়গাটি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পার্বত্য ও টিলাময়, যার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সহজ। দিনের বেলা লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি ঘোড়া লুকিয়ে রাখা যায়। সম্মিলিত বাহিনীর রসদ– যাতে সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য ও পশুপালের জন্য শুকনা ঘাস, দানাদার খাদ্য ইত্যাদি রয়েছে– পিছনে আসছে। এই মালপত্রে তীর-ধনুক-বর্শাও আছে। আন-নাসের প্রথম রাতেই শত্রু বাহিনীর এই রসদের উপর সফল আক্রমণ পরিচালনা করেন। বিপুল পরিমাণ রসদ অগ্নিতীরে ভস্ম হয়ে গেছে।

আন-নাসের কমান্ডোদেরসহ দিনের বেলা এক স্থানে লুকিয়ে থাকে। সে দেখতে পায়, শত্রুবাহিনী খানা-খন্দক ও টিলার আড়ালে তাদের অনুসন্ধান করছে। সে তার কমান্ডোদেরকে এদিক-ওদিক উপযুক্ত উঁচু স্থানে বসিয়ে রাখে। তারা ধনুকে তীর সংযোজন করে ওঁৎ পেতে বসে থাকে। শত্রুসেনারা দূর থেকেই ফেরত চলে যায়। সূর্যাস্তের পর সে চুপি চুপি রসদ বহরের উপর দৃষ্টি রাখে।

কাফেলা একস্থানে ছাউনি ফেলে। কিন্তু এ রাত আক্রমণ করা সহজ মনে হলো না। দুশমন চারদিকে কঠোর টহল প্রহরার ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই প্রহরায় পদাতিকও আছে, অশ্বারোহীও আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন-নাসের হামলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। দুশমনের এখনো বহু রসদ অক্ষত আছে। কমান্ডো হামলার মাধ্যমে রসদ ধ্বংস একটি বিশেষ কৌশল। এ কাজের জন্য তিনি এমন বাহিনী গঠন করে রেখেছেন, যারা চেতনার দিক থেকে উন্মাদ ও উগ্র প্রকৃতির। তাদের বীরত্ব অস্বাভাবিক ও বুদ্ধিমত্ত্বা ঈর্ষণীয়। এই জানবাজদের সততা ও ঈমানী চেতনার অবস্থা হলো, তারা এতো দূরে গিয়েও দায়িত্ব পালনে জানবাজির পরাকাষ্ঠা প্রর্দশন করে থাকে। যেখানে তাদের খোঁজ নেয়ার মতো কেউ থাকে না।

আন-নাসের দিনের বেলা যেখানে লুকিয়ে ছিলো, রাতে সেখানেই ঘোড়াগুলো বেঁধে রাখে। তারপর পায়ে হেঁটে দলের সদস্যদের নিয়ে এক স্থান দিয়ে দুশমনের রসদ বহরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। মালপত্রের স্তূপ দাহ্য

পদার্থ ফেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দলের সদস্যদের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দেয়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। শত্রুসেনারা ছুটোছুটি করতে শুরু করে। আন-নাসেরের কমান্ডোরা ছুটন্ত ও পলায়নপর শত্রুসেনাদের উপর তীরবৃষ্টি শুরু করে দেয়। শত্রুসেনারা তাদের সন্ধান করতে শুরু করে। সফল অপারেশনের পর তাদের পক্ষে বেশি সময় লুকিয়ে হামলা করা সম্ভব হলো না। তারা এক একজন করে ধরা পড়তে ও শহীদ হতে শুরু করে। যে তিনজন কমান্ডো আন-নাসেরের সঙ্গে ছিলো, শুধু তারাই বেঁচে থাকে। তারা ব্যাপক ধ্বংস সাধন করে। রসদের সঙ্গে যেসব পাহারাদার ছিলো, তারা তাদেরকে ঘেরাও করে ধরার চেষ্টা করে। আন-নাসের তার এই তিন সঙ্গীকে তার থেকে আলাদা হতে দেয়নি। তারা ধীরে ধীরে কৌশলে আলো থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্ধকারে ঘোরাফেরা ও তাঁবুর আড়ালে লুকিয়ে শত্রুসেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

আন-নাসের আকশের দিকে তাকায়। আকাশে কোনো তারকা নেই। কমান্ডোসেনাদের তারকা দেখে দিক নির্ণয় করার প্রশিক্ষণ থাকে। কিন্তু আজকের আকাশটা মেঘে ছেয়ে আছে। আন-নাসের শত্রু বাহিনীর রসদের অবস্থান থেকে অনেক দূর চলে এসেছে। তবে এখনো দুশমনের প্রজ্বলমান রসদ ও আসবাবপত্রের আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। তার অপর ৯ সৈনিক বেঁচে আছে নাকি শহীদ হয়েছে, তা সে জানে না। সে মনে মনে তাদের নিরাপত্তার জন্য দু'আ করে তিন সঙ্গীকে নিয়ে যে জায়গায় দলের ঘোড়াগুলো বাঁধা আছে, অনুমান করে সেদিকে এগিয়ে চলে। তারা রাতভর হাঁটতে থাকে। দুশমনের রসদের অগ্নিশিখা এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

পথ হারিয়ে ফেলেছে আন-নাসের। তারা যে পথে হাঁটছে, এটি তাদের গন্তব্যের পথ নয়। হাঁটছে দিক-নির্দেশনাহীন। এখন তারা যে মাটিতে হাঁটছে, তার প্রকৃতি অন্য রকম। তারা যে পথে এসেছিলো, তাতে কোন গাছ-গাছালি ছিলো না। পায়ের নীচে শক্ত মাটির পরিবর্তে বালি অনুভূত হচ্ছে। পানি ও খাদ্যদ্রব্য তাদের ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা। আন-নাসের পিপাসা অনুভব করে। শরীর ক্লান্ত। তার সঙ্গীরাও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছে। চলার গতি ধীর হয়ে আসছে তাদের। আন-নাসের সেখানেই যাত্রাবিরতি দিয়ে বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। তার সঙ্গীরা এই আশায় এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয় যে, হয়তো সামনে কোথাও পানি পাওয়া যাবে। তারা আরো কিছুক্ষণ হাঁটে এবং ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে।

❖ ❖ ❖

আন-নাসের চোখ খুলে দেখতে পায়, তার সঙ্গী তিন সৈনিক অচেতন ঘুমিয়ে আছে। সূর্যটা উদায়স্থল ত্যাগ করে উপরে উঠে এসেছে। সে চারদিকে তাকায়। অনুভব করে– সে বালির সমুদ্র মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। মনটা ভেঙ্গে পড়ে আন-নাসেরের। লোকটার লালন-পালন, বড় হওয়া, যুদ্ধ করা সবই মরু অঞ্চলে হয়েছে। বালির সমুদ্রকে ভয় পাওয়ার মতো লোক নয় সে। তার ভয় পাওয়ার কারণ হলো– তার ধারণা ছিলো না, এখানে মরুদ্যান আছে। আরো একটি কারণ হলো, যতদূর পর্যন্ত চোখ যায় পানির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পিপাসায় কণ্ঠনালীতে জ্বালা অনুভব করছে আন-নাসেরের। সঙ্গীদের অবস্থাও আন্দাজ হচ্ছে তার। এখান থেকে তুর্কমান কোন্‌দিক হতে পারে সূর্য দেখে তা ঠিক করে সেদিকে তাকায়। পর্বতমালার বাঁকা একটা রেখা দেখতে পায়। কিন্তু সোজা সেদিকে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা, পথে দুশমনের ফৌজ রয়েছে।

আন-নাসের তার সঙ্গীদের জাগায়। জাগ্রত হয়ে তারা উঠে বসে। চেহারায় ভীতির ছাপ।

'প্রয়োজন হলে আমরা আরো দু'দিন না খেয়ে থাকতে পারবো'– আন-নাসের তার সঙ্গীদের বললো– 'আর এই দু'দিনে গন্তব্য পর্যন্ত পৌছতে না পারলেও পানি পর্যন্ত অবশ্যই পৌছে যাবো।'

তিন সৈনিক যার যার অভিমত ব্যক্ত করে। কিন্তু তারা চলে এসেছে বহু দূর। সঙ্গে ঘোড়া থাকলে অনেকটা সহজ হতো। নিদ্রা তাদের পরিশ্রান্ত দেহকে কিছুটা সজীবতা দান করেছে।

'সঙ্গীগণ'– আন-নাসের বললো– 'মহান আল্লাহ আমাদেরকে যে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছেন, তাকে মাথা পেতে বরণ করে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।'

'এখানে বসে থাকা তো কোনো প্রতিকার নয়'– এক সঙ্গী বললো– 'সূর্য মাথার উপর এসে পোড়াতে শুরু করার আগে আগেই রওনা হওয়া দরকার। আল্লাহ আমাদেরকে পথের দিশা দান করবেন।'

স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে দিক নির্ণয় করে তারা হাঁটতে শুরু করে। সূর্য মাথার উপর উঠে আসছে। পায়ের নীচের বালি উত্তপ্ত হয়ে ওঠছে। সামান্য দূরের বালিগুলোকে মরিচিকার ন্যায় পানি বলে মনে হচ্ছে। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা মরুভূমির নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে অবহিত এবং অভ্যস্তও। তাদের

মরিচিকাও চোখে পড়তে শুরু করে। কিন্তু মরুভূমির এই প্রতারণা সম্পর্কে অবগত থাকার সুবাদে তারা প্রতিটি মরিচিকাকে উপেক্ষা করে সম্মুখে এগিয়ে চলছে।

'বন্ধুগণ!'– আন-নাসের বললো– 'আমরা ডাকাত নই, আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। এই অবস্থায় যদি আমাদের মৃত্যু হয় তা হবে শাহাদাত। আল্লাহকে স্মরণ করে হাঁটতে থাকো।'

'যদি এমন কোন পথিক পেয়ে যাই, যার সঙ্গে পানি আছে, তাহলে ডাকাতি করতে পরোয়া করবো না।' এক সৈনিক বললো।

সবাই হেসে ওঠে। তবে এই হাসির জন্য তাদেরকে শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে।

সূর্য তাদের মাথার উপর উঠে এসেছে। উপর থেকে সূর্য আর নীচ থেকে উত্তপ্ত বালি তাদেরকে পোড়াতে শুরু করে। আন-নাসের গুন গুন করে একটি জিহাদী গান গাইতে শুরু করে। গান গাওয়া শেষ হলে সে ভিন্ন এক সুরেলা কণ্ঠে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদর রাসুলুল্লাহ' জপতে শুরু করে। হাল্কা বেগে বাতাস বইছে। চিকচিকে বালিকণা তাদের পদচিহ্নগুলো মুছে দিচ্ছে।

এবার সূর্যটা পশ্চিমাকাশের দিকে নামতে শুরু করেছে। চারজন আদম সন্তানের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ হয়ে চলছে। পা ভারি হয়ে যাচ্ছে। হাঁটার গতি কমে গেছে। ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। আদ্রতার অভাবে হা করা মুখ বন্ধ হচ্ছে না। একজনের জবান বন্ধ হয়ে গেছে; এখন আর সে কথা বলতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর আরো একজন নীরব হয়ে যায়। আন-নাসের ও তার তৃতীয় সঙ্গী এখনো অস্ফুট স্বরে আল্লাহর নাম জপ করছে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তৃতীয় সঙ্গীর কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে যায়।

'সঙ্গীগণ!'– আন-নাসের দেহের অবশিষ্ট শক্তি ব্যয় করে বললো– 'হিম্মত হারাবে না। আমরা ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান। ঈমানের শক্তিতেই আমরা বেঁচে থাকবো।'

আন-নাসের একজন একজন করে সঙ্গীদের চেহারার প্রতি তাকায়। কারো চেহারায় যেনো রক্ত নেই। সকলের চোখ কোঠরে ঢুকে গেছে।

সূর্য ডুবে গেছে। আঁধারে ছেয়ে গেছে প্রকৃতি। পদতলের উত্তপ্ত বালি ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আন-নাসের সঙ্গীদের থামতে দেয়নি। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় পথ চলা সহজ হয়। সাধারণ পথচারী হলে লোকগুলো বহু আগেই হারিয়ে যেতো। এরা সৈনিক এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো। সাধারণ মানুষের তুলনায় এদের দেহ বেশী কষ্ট-সহিষ্ণু। আরো কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আন-নাসের সঙ্গীদের যাত্রা বিরতি দিয়ে শুয়ে পড়তে বললো।

❖ ❖ ❖

আন-নাসের শেষ রাতে জাগ্রত হয়। আকাশ পরিস্কার। তারকা দেখে অনুমান করে রাত পোহাতে আর কত দেরি। একটি তারকা দেখে দিক নির্ণয় করে সঙ্গীদের জাগিয়ে তোলে। তাদের নিয়ে রওনা হয়। তাদের হাঁটার গতি ভালো। তবে পিপাসার কারণে মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

'এই মরুভূমি এতো বেশি বিস্তীর্ণ নয়'– আন-নাসের বড় কষ্টে বললো– 'আজই শেষ হয়ে যাবে। আমরা আজই পানি পর্যন্ত পৌঁছে যাবো।'

সম্মুখে পানি পাওয়া যাবে এই আশায় তারা এগুতে থাকে। রাত পোহায়ে ভোর হলো। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদিত হলো। মাইল দশেক দূরে কতগুলো খুঁটি ও মিনার চোখে পড়ে। এগুলো মাটির টিলা ও পর্বতের চূড়া। দূর থেকে খুঁটি আর মিনারের মতো দেখা যাচ্ছে। একটি গাছও চোখে পড়ছে না। পায়ের তলার মাটি এখন ফেটে চৌচির। মনে হচ্ছে, কয়েক শত বছর ধরে এই মাটি পানির ছোঁয়া পায়নি। শত শত বছরের পিপাসাকাতর মাটি মানুষের রক্ত পেলে পান করতে কুণ্ঠিত হবে না।

আন-নাসের তার সঙ্গীদের চেহারা পর্যবেক্ষণ করে। এক সঙ্গীর জিহ্বা কিছুটা বেরিয়ে এসেছে। লক্ষণটা ভয়ানক। মরু সাহারা ট্যাক্স উসুল করতে শুরু করেছে। অপর দুই সঙ্গীর বাহ্যিক অবস্থা অতোটা সঙ্গীন না হলেও স্পষ্ট যে, দশ মাইল পথ অতিক্রম করে মিনারসদৃশ টিলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আন-নাসের দলের কমান্ডার। দায়িত্ববোধের কারণেই তার হুঁশ-জ্ঞান এখানো ঠিক আছে। তার শারিরিক অবস্থা সঙ্গীদের চেয়ে ভালো নয়। সে কথা দ্বারা সঙ্গীদের সাহস বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ধীরে ধীরে সূর্য উপরে উঠছে আর মাটির উত্তাপ বাড়ছে। আন-নাসের ও তার সঙ্গীগণ পা তুলে হাঁটতে পারছে না। তারা পা হেঁচড়িয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। যে সিপাহীর জিহ্বা বেরিয়ে এসেছিলো, তার বর্শাটা হাত থেকে পড়ে যায়। তারপর সে কোমরবন্ধ থেকে তরবারীটাও খুলে ফেলে দেয়। নিজের অজ্ঞাতে এসব আচরণ করে সে। তার হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব কাজ করে যাচ্ছে। এটি মরুভূমির একটি নির্দয় ক্রিয়া যে, মানুষ যেমন ঘুমের ঘোরে অজ্ঞাতে নানা আচরণ করে থাকে, তেমনি পথভোলা পিপাসার্ত পথিকও নিজের অজান্তে দেহের বোঝা ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করে। সে কোথাও থামে না। লক্ষ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকে আর এক এক করে নিজের সহায়-সম্বল ও পাথেয় ফেলে দিতে থাকে। মরু মুসাফিররা যখন স্থানে স্থানে এরূপ বস্তু পড়ে

থাকতে দেখে, তখন তারা বুঝে ফেলে, আশ-পাশে কোথাও কোন হতভাগা আদম সন্তানের লাশ পড়ে আছে।

মরুভূমি আন-নাসেরের এক সঙ্গীকে এমনি এক অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। আন-নাসের তার বর্শা ও তারবারীটা তুলে নিয়ে তাকে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললো– 'এতো তাড়াতাড়ি পরাজয় মেনে নিও না বন্ধু। আল্লাহর সৈনিকরা জীবনদান করে, অস্ত্রত্যাগ করে না। তুমি তোমার মর্যাদাকে বালির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলো না।'

সঙ্গী অসহায় দৃষ্টিতে আন-নাসেরের প্রতি তাকায়। আন-নাসের তার প্রতি তাকিয়ে থাকে। সিপাহী হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওঠে সামনের দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল উঁচিয়ে ইশারা করে। তারপর নিজের দেহের অবশিষ্ট সবটুকু শক্তি ব্যয় করে চিৎকার করে ওঠে– 'পানি... ঐ দেখ... বাতাস... পানি পেয়ে গেছি।' লোকটি সামনের দিকে দৌড় দেয়।

সেখানে পানি ছিলো না, না মরিচিকা। ভূমি এমন যে, এরূপ ভূমিতে মরিচিকা দেখা যায় না। মরিচিকা সৃষ্টি হয় বালির চমক থেকে। লোকটির উপর সাহারার দ্বিতীয় নিষ্ঠুর আচরণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। সে দেখতে পায়, তার সম্মুখে পানির ঝিল, বাগ-বাগিচা ও অসংখ্য প্রাসাদ। আসলে কিছুই নেই। একজন অসহায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নির্মম উপহাস। সে আরো দেখতে পায়, মাইল দুয়েক দূরে একটি শহর। দলে দলে মানুষ চলাচল করছে। গায়িকা-নর্তকীরা গাইছে-নাচছে।

জনমানবহীন এই নিষ্ঠুর মরুভূমি আন-নাসেরের এই সঙ্গীকে ধোঁকা দিতে শুরু করে। মরু সাহারা লোকটির জীবন নিয়ে খেলা শুরু করে। তবে এটা সাহারার দয়াও হতে পারে যে, একজন পথিকের জীবন হরণ করার আগে তাকে সুদর্শন ও চিত্তহারী কল্পনায় ব্যস্ত করে দেয়, যাতে মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভূত না হয়।

আন-নাসেরের সঙ্গী দৌড় দেয়। যে লোকটি এতোক্ষণ পা হেঁচড়িয়ে পথ চলছিলো, সে কিনা সুস্থ-সবল মানুষের ন্যায় দৌড়াচ্ছে। কিন্তু এই দৌড় সেই প্রদীপের ন্যায়, যা নির্বাপিত হওয়ার আগে দপ করে ওঠে। আন-নাসের তার পেছন পেছন ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে। তার অপর দুই সঙ্গীর দম এখনো কিছুটা অবশিষ্ট আছে। তারাও দৌড়ে গিয়ে সঙ্গীকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। সিপাহী সঙ্গীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট করছে এবং চিৎকার করছে– 'আমাকে ঝিলের কাছে যেতে দাও।

ঐ দেখ, কতো হরিণ ঝিল থেকে পানি পান করছে।'

সঙ্গীরা তাকে ধরে রাখে। সে ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে এগিয়ে চলে। আন-নাসের তার মুখমণ্ডলের উপর একখানা কাপড় রেখে দেয়, যেনো সে কিছু দেখতে না পায়।

সূর্যটা ঠিক মাথার উপর উঠে এসেছে। এবার আরো এক সিপাহী উচ্চস্বরে বলে ওঠে– 'বাগিচায় নর্তকীরা নাচছে। চলো, নাচ দেখি, রূপ দেখি। চলো, বন্ধুগণ! ওখানে পানি পাওয়া যাবে। মানুষ আহার করছে। আমি তাদেরকে চিনি। চলো... চলো...।' বলেই সিপাহী দৌড়াতে শুরু করে।

যে সিপাহী প্রথমে অলীক দৃশ্য অবলোকন করেছিলো, সে বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত নীরব থাকে। সে কারণে সঙ্গীরা তাকে ছেড়ে দিয়েছিলে। এখন এক সঙ্গীকে দৌড়াতে দেখে সেও তার পেছন পেছন ছুটছে এবং চিৎকার করতে শুরু করে– 'নর্তকীটা অত্যন্ত রূপসী। আমি তাকে কায়রোতে দেখেছি। সেও আমাকে চিনে। আমি তার সঙ্গে খাবো। তার সঙ্গে শরবত পান করবো।'

আন-নাসেরের মাথাটা হেলে পড়েছে। মরুভূমির কষ্ট সহ্য করার মতো শক্তি তার ছিলো। কিন্তু সঙ্গীদের এই পরিণতি ও দুর্দশা সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। তাদের নিয়ন্ত্রণ করা তার সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। নিজের শারীরিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। এখন তার একজন মাত্র সঙ্গীর মস্তিষ্ক ঠিক আছে। দৈহিক শক্তি তারও শেষ হয়ে গেছে।

যে দু'সঙ্গী কল্পনার বাগিচা ও নাচ-গানের পেছনে ছুটে চলছিলো, কয়েক পা এগিয়ে তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পড়ারই কথা। দেহে তাদের আছেই বা কী। আন-নাসের ও সঙ্গী তাদেরকে বসিয়ে ধরে রাখে এবং গায়ের উপর কাপড় দিয়ে ছায়া দান করে। তাদের চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। মাথা হেলে পড়েছে।

'তোমরা আল্লাহর সৈনিক'– আন-নাসের ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে শুরু করে– 'তোমরা প্রথম কেবলা ও কা'বা গৃহের প্রহরী। তোমরা ইসলামের দুশমনের কোমর ভেঙ্গেছো। কাফিররা তোমাদের ভয়ে ভীত ও কম্পিত। তোমরা মরণজয়ী মর্দে মুমিন। এই মরুভূমি, পিপাসা ও সূর্যের উত্তাপকে তোমরা কী মনে করছো? তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হচ্ছে। জান্নাতের ফেরেশতারা তোমাদের পাহারা দিচ্ছে। তোমাদের দেহ পিপাসার্ত হলেও আত্মা পিপাসার্ত নয়। ঈমানদাররা পানির শীতলতায় নয়– ঈমানের

শতীলতায় জীবিত থাকে।'

উভয়ে এক সঙ্গে চোখ খুলে আন-নাসেরের প্রতি তাকায়। আন-নাসের হাসবার চেষ্টা করে। আবেগের আতিশয্যে সে যে বক্তব্য প্রদান করে, তা ক্রিয়া করে বসেছে। উভয় সিপাহী কল্পনার জগত থেকে বাস্তব জগতে ফিরে আসে। তারা উঠে দাঁড়ায় এবং ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করে।

সকালে রওনা হওয়ার সময় তারা টিলা-পর্বতের যে খুঁটি ও মিনার দেখেছিলো, সেগুলো নিকটে এসে গেছে। এখন সেগুলো তখনকার তুলনায় অনেক বড় দেখাচ্ছে। ওখানে পানি থাকতে পারে আশা করা যায়। থাকতে পারে সমতল ভূমি ও খানা-খন্দক। আন-নাসের তার সঙ্গীদের বললো, আমরা পানির নিকটে এসে পড়েছি এবং আজ সন্ধ্যার আগেই পানি পেয়ে যাবো। তারা টিলা-পর্বতের আরো নিকটে পৌঁছে যায়। হঠাৎ এক সিপাহী চিৎকার করে ওঠে– 'আমি আমার গ্রামে এসে পড়েছি। আমি গিয়ে সকলের জন্য খাবার রান্না করি। আমার গ্রামের মেয়েরা কূপ থেকে পানি তুলছে।' বলেই সে দৌঁড়াতে শুরু করে।

তার পেছনে অপর সিপাহীও দৌঁড়াতে শুরু করে। হঠাৎ উপুড় হয়ে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে মুঠি করে মাটি ও বালি তুলে মুখে পুরে।

আন-নাসের ও তার তৃতীয় সঙ্গী দৌড়ে গিয়ে তার মুখ থেকে মাটিগুলো বের করে ফেলে। মুখটা পরিষ্কার করে তুলে দাঁড় করায়। কিন্তু তার হাঁটার শক্তি নেই। অপর সিপাহীও পড়ে যায় এবং উপুড় হয়ে পড়ে থেকে বলতে থাকে– 'কূপ থেকে পানি পান করে নাও। আমি তোমাদের জন্য খাবার রান্না করবো।'

আন-নাসের দু'আর জন্য দু'হাত একত্রিত করে আকাশপানে তুলে ধরে বলতে শুরু করে–

'মহান আল্লাহ! আমরা তোমার নামে লড়তে ও মরতে এসেছিলাম। আমরা কোনো পাপ করিনি। আমরা দস্যু-তস্করও নই। কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করা যদি পাপের কাজ হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। হে মহান আল্লাহ! আমার জীবনটা তুমি নিয়ে নাও। আমার দেহের রক্তকে পানি বানিয়ে দাও। সে পানি পান করে আমার সঙ্গীরা বেঁচে থাকুক। তারা তোমার রাসূলের প্রথম কেবলা জবর-দখলকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমার রক্তকে পানি বানিয়ে তুমি তাদের পান করাও।'

আন-নাসেরের সঙ্গীরা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় এবং অন্ধের ন্যায় হাত

আগে বাড়িয়ে দিয়ে এমনভাবে হাঁটতে শুরু করে, যেনো তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আন-নাসের ও তার চেতনাসম্পন্ন সঙ্গীদের হাঁটতে দেখে তারাও উঠে পা টেনে টেনে এগুতে শুরু করে। হঠাৎ আন-নাসেরের চোখও ঝাপসা হয়ে আসে। অন্যদের ন্যায় সেও সবুজ-শ্যামলিমা দেখতে শুরু করে। আন-নাসের বুঝে ফেলে, মরুভূমি তাকেও ধোঁকা দিতে শুরু করেছে।

❖ ❖ ❖

আন-নাসের অনেকগুলো টিলার মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে। এই টিলাগুলো বেশ চওড়া। কোনটিই তেমন উঁচু নয়। কোথাও বালুকাময় প্রান্তরও চোখে পড়ছে।

আন-নাসের সামনে এবং তার সঙ্গী পেছনে পেছনে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে আন-নাসের হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। তারা দূর থেকে যে খুঁটি ও মিনার দেখেছিলো, সেগুলো এখন সরাসরি তার চোখের সামনে। এক স্থানে দু'টি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। তারই সন্নিকটে দু'টি মেয়ে বসে আছে। তারা উঠে দাঁড়ায়। মেয়েগুলোর বর্ণ গৌর এবং দেহের রূপ-কাঠামো আকর্ষণীয়।

আন-নাসের খানিক দূরে দাঁড়িয়ে গিয়ে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে– 'তোমরা কি দু'টি ঘোড়া আর দু'টি মেয়ে দেখতে পাচ্ছে?'

তার যে দুই সঙ্গী অলীক কল্পনার শিকার হয়েছিলো, তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। একজন বললো– 'না, কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।'

আন-নাসেরের যে সঙ্গীর মানসিক অবস্থা এখনো ঠিক আছে, সে অস্ফুট স্বরে ললো– 'হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'আল্লাহ আমাদের দয়া করুন'– আন-নাসের বললো– 'আমাদের দু'জনেরও মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমরাও অবাস্তব বস্তু দেখতে শুরু করেছি। জাহান্নামসম এই বিরানভূমিতে এমন রূপসী নারী আসতে পারে না।'

'তাদের পোশাক-আশাক যদি মরু যাযাবরদের ন্যায় হতো, তাহলে বুঝতাম, এটা কল্পনা নয়, বাস্তব'– আন-নাসেরের সঙ্গী বললো– 'চলো, সামনে গিয়ে গাছের ছায়ায় বসে পড়ি। ওরা মেয়ে নয়। এটা আমাদের মানসিক দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ।'

'কিন্তু আমার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে'– আন-নাসের বললো– 'আমি তোমাকে চিনতে পারছি। তুমি যা যা বলেছো, আমি বুঝে ফেলেছি। আমার মস্তিষ্ক এখনো নিয়ন্ত্রণে আছে।'

'আমারও হুঁশ আছে'– সঙ্গী বললো– 'আমরা কি সত্যিই মেয়ে দেখছি, নাকি ওরা জিন-পরী।'

মেয়েগুলো একইভাবে মূর্তির ন্যায় তাদের প্রতি তাকিয়ে আছে। আন-নাসের সাহসী মানুষ। সে ধীরে ধীরে মেয়েগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। মেয়েরা অদৃশ্য হলো না। তারা এখন আন-নাসেরের হাত পাঁচেক দূরে। মেয়েদের একজন অপরজনের তুলনায় বয়সে বড়। এমন রূপসী মেয়ে আন-নাসের জীবনে আর দেখেনি। মাথার ওড়নার ফাঁক দিয়ে যে ক'টি চুল কাঁধের উপর পড়ে আছে, সেগুলো সরু রেশমের ন্যায় মনে হলো। উভয় মেয়ের চোখের রংও বেশ চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর। চোখগুলো মুক্তার ন্যায় ঝিকমিক করছে।

'তোমরা সৈনিক'– বড় মেয়েটি বললো– 'তোমরা কার সৈনিক?'

'সবই বলবো'– আন-নাসের বললো– 'তার আগে বলো, তোমরা মরুভূমির ধাঁ ধাঁ নাকি জিন-পরী?'

'আমরা যাই হই না কেনো, আগে বলো তোমরা কারা এবং এদিকে কী করতে এসেছো?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে– 'আমরা মরুভূমির ধাঁ ধাঁ নই। তোমরা আমাদের দেখতে পাচ্ছো, আমরাও তোমাদের দেখছি।'

'আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর গেরিলা সৈনিক'– আন-নাসের বললো– 'পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছি। তোমরা যদি জিন-পরী না হয়ে থাকো, তাহলে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দোহাই, আমার এই সঙ্গীদের পানি পান করাও এবং তার বিনিময়ে আমার জীবন নিয়ে নাও। এটা আমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।'

'অস্ত্রগুলো আমাদের সামনে রেখে দাও'– মেয়েটি বললো– 'হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নামে প্রার্থিত বস্তু আমরা না দিয়ে পারি না। তোমার সঙ্গীদের ছায়ায় নিয়ে আসো।'

আন-নাসের তার অস্তিত্বে একটি ঢেউ খেলে গেছে বলে অনুভব করে, যেনো ঢেউটি মাথা দিয়ে প্রবেশ করে পা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধকারী জানবাজ। তার সকল গেরিলা আক্রমণ সঙ্গীদের অবাক করে তুলতো। কিন্তু এই মেয়ে দু'টোর সামনে সে কাপুরুষ হয়ে গেছে। তার মনে এমন একটা ভীতি চেপে বসেছে, যা পূর্বে কখনো অনুভব করেনি। সে জিন-পরীর গল্প শুনতো; কিন্তু কখনো জিনের মুখোমুখি হয়নি। প্রতি মুহূর্তেই তার আশংকা ছিলো, মেয়ে দু'টো এবং ঘোড়গুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে কিংবা আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলবে। তখন সে কিছুই করতে পারবে না। আন-নাসের মেয়েগুলোর সামনে অসহায় হয়ে পড়ে। সে তার সঙ্গীদের বললো– 'তোমরা ছায়ায় চলে আসো।' তাদের একজন অচেতন পড়ে ছিলো। তাকে টেনে

ছায়ায় নিয়ে আসা হলো।

'বলো, তোমরা কী করতে এসেছো?' –মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'পানি পান করাও'– আন-নাসের অনুনয়ের সাথে বললো– 'শুনেছি, জিনরা যখন-তখন যে কোনো বস্তু উপস্থিত করতে পারে।'

'ঘোড়ার সঙ্গে মশক বাঁধা আছে'– মেয়েটি বললো– 'একটি খুলে নাও।'

আন-নাসের একটি ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা মশক খুলে হাতে নেয়। মশকটি পানিতে পরিপূর্ণ। সবার আগে তার অচেতন সঙ্গীর মুখে পানির ছিটা দেয়। পানির ছোয়া পেয়ে সে চোখ খোলে এবং ধীরে ধীরে উঠে বসে। আন-নাসের মশকের মুখটা তার মুখের সঙ্গে লাগায়। সঙ্গীর সামান্য পানি পান করার পর মশক সরিয়ে নেয়। আন-নাসের তাকে বেশি পানি পান করতে দেয়নি। ভীষণ পিপাসার পর বেশি পানি পান করা ক্ষতিকর। তারপর একজন একজন করে প্রত্যেকে পানি পান করে। সবশেষে আন-নাসের নিজে পানি পান করে। তার মস্তিষ্ক পরিস্কার হয়ে গেছে। এবার তার ভাবনা হচ্ছে, এই মেয়েগুলো যদি বাস্তব না হয়ে তার কল্পনা হতো, তাহলে মস্তিষ্ক পরিস্কার হওয়ার পর এখন তারা অদৃশ্য হয়ে যেতো। কিন্তু তাতো হয়নি। মেয়েগুলো এখানো যথাস্থানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, পরিস্কার হওয়ার আগে মেয়েগুলোর ন্যায় মশকভর্তি পানিও দেখেছিলো। সেই পানি তার সঙ্গীরা এবং সে নিজে পান করে চাঙ্গা হয়ে ওঠেছে। বিষয়টা যদি অলীক অল্পনা হতো, তাহলে পানি পান করাই সম্ভব হতো না। সব মিলিয়ে আন-নাসের নিশ্চিত যে, সে যা দেখছে, বাস্তব দেখছে। সে মেয়েগুলোর প্রতি তাকায় এবং গভীরভাবে নিরিক্ষা করে। এবার তাদেরকে পূর্বের তুলনায় আরো রূপসী মনে হলো, যেনো তারা মানুষ নয়।

আন-নাসেরের নিজের উপরই নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সে অনুভব করছে, নিজের ইচ্ছায় কিছু ভাববার শক্তি তার নেই। তার সঙ্গীদের চেহারায় জীবন ফিরে এসেছে। এটা সেই যৎসামান্য পানির সুফল, যা তাদের দেহে অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু আন-নাসেরের ন্যায় তাদের উপরও ভীতি চেপে বসেছে। মেয়েগুলো চুপচাপ তাদের প্রতি তাকিয়ে আছে। বাইরের জগত আগুনে জ্বলছে। মাটি এমন অগ্নিশিখা উদগীরণ করছে, যা অনুভব করা যাচ্ছে– দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা যে স্থানটিতে বসে আছে, সেটি এই উত্তাপ থেকে নিরাপদ।

বড় মেয়েটি আন-নাসেরের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেয়। মধ্যমা ও শাহাদাত

অঙ্গুলী দ্বারা ঘোড়ার প্রতি ইংগিত করে বললো– 'ঐ থলেটা খুলে এনে সঙ্গীদের দাও।'

আন-নাসের ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা চামড়ার থলেটা এমনভাবে খুলে নিয়ে আসে, যেনো এই কাজটা সে কোনো জাদুর ক্রিয়ায় সম্পন্ন করেছে। থলেটি খুলে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। ভেতরে খেজুর ছাড়াও এমন সব খাবার রয়েছে, যা রাজা-বাদশারা খেয়ে থাকেন। আছে গোশতও। সে বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে মেয়েদের প্রতি তাকায়। বড় মেয়েটি বললো– 'খাও।'

আন-নাসের বস্তুগুলো তার সঙ্গীদের মাঝে বণ্টন করে দেয়। সকলের পেট আর পিঠ এক হয়ে ছিলো। তারা খেতে শুরু করে। মহামূল্যবান হলেও খাবার পরিমাণে কম, যা বড়জোর একজনের জন্য যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু তারা চারজনই পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। তাদের দেহ-মনে সজীবতা ফিরে আসে। এবার মেয়েগুলোর রূপ-সৌন্দর্য আগের তুলনায় আরো মনোহারী ও রহস্যময় হয়ে ওঠে।

'তোমরা আমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবে?'– আন-নাসের বড় মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে– 'জিন মানুষের তো মোকাবেলা হয় না। তোমরা আগুন আর আমরা মাটি। আল্লাহ আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা। তোমাদেরই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি বিবেচনা করে আমাদের প্রতি দয়া করো। তোমরা আমাদেরকে তুর্কমানের রাস্তায় তুলে দাও। তোমরা ইচ্ছে করলে তো মুহূর্তের মধ্যে আমাদেরকে তুর্কমান পৌঁছিয়ে দিতে পারো।'

'তোমরা কোথাও গেরিলা আক্রমণ করতে গিয়েছিলে কী?'– বড় মেয়েটি জিজ্ঞেস করে– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডো সেনারাও জিন হয়ে থাকে। বলো কোথায় গিয়েছিলে? কী করে এসেছো?'

আন-নাসের তার পুরো কার্যক্রমের বিবরণ প্রদান করে। তার বাহিনী যে বীরত্বপূর্ণ গেরিলা অভিযান পরিচালনা করে এসেছে এবং শত্রু পক্ষের কী কী ক্ষতিসাধন করেছে, সব বলে দেয়। তারপর ফেরত পথে কিভাবে পথ ভুলে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তারও বিবরণ প্রদান করে।

'তোমাদেরকে তোমাদের বাহিনীর শ্রেষ্ঠ সৈনিক বলে মনে হচ্ছে'– বড় মেয়েটি বললো– 'তোমাদের বাহিনীর সব সৈনিকই কি এ কাজ করতে পারে, যা তোমরা করেছো?'

'না'– আন-নাসের জবাব দেয়– 'আমাদেরকে তোমরা মানুষ মনে করো না। আমাদের ওস্তাদগণ আমাদেরকে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন, তা যে

কোনো সৈনিক সহ্য করতে পারে না। আমরা বনের হরিণের ন্যায় দৌড়াতে পারি। আমাদের চোখ বাজপাখির ন্যায় বহুদূর পর্যন্ত দেখতে সক্ষম এবং আমরা চিতার ন্যায় আক্রমণ করতে পারঙ্গম। আমরা কেউ চিতা দেখিনি। চিতা কী এবং কিভাবে আক্রমণ করে, ওস্তাদগণ আমাদের সেই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এই শারীরিক পারঙ্গমতা ছাড়াও আমাদের মস্তিষ্কও অন্যান্য সৈনিকের তুলনায় বেশী উন্নত ভাবনা ভাবতে পারে। শত্রুর দেশে গিয়ে কিভাবে তাদের সামরিক গোপন তথ্য বের করে আনা যায়, আমাদের ওস্তাদগণ আমাদেরকে সে বিদ্যাও শিক্ষাদান করেছেন। আমরা বেশ বদল করে ফেলি, কণ্ঠ পরিবর্তন করে ফেলি এবং অন্ধ হতে পারি। প্রয়োজন হলে আমরা চোখের অশ্রু ঝরাতে পারি এবং ধরা পড়ার আশংকা দেখা দিলে জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করি এবং বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি। আমরা বন্দী হই না– শহীদ হই।'

'আমরা যদি পরী না হতাম, তাহলে তোমরা আমাদের সঙ্গে কী আচরণ করতে?' –মেয়েটি প্রশ্ন করে।

'তোমরা বিশ্বাস করবে না'– আন-নাসের বললো– 'আমরা সেই পাথর, নারীর রূপ যাকে ভাঙ্গতে পারে না। আমি যদি নিশ্চিত হতে পারি যে, তোমরা মানুষ আর জানতে পারি, তোমরা পথ ভুলে এসেছো, তাহলে তোমাদের দু'জনকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নেবো। আমার ঈমানের ন্যায় তোমাদের মূল্যবান বিবেচনা করবো। কিন্তু তোমরা তো মানুষ নও। তোমাদের অবস্থাই বলছে, তোমরা মানুষ নও। তোমাদের ন্যায় মেয়ে এই ধরায় আসতে পারে না। তোমাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন, আমাদেরকে আশ্রয় দাও।'

'আমরা মানুষ নই'– বড় মেয়েটি বললো– 'আমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত ছিলাম। আমাদের জানা ছিলো, তোমরা পথ হারিয়ে ফেলেছো। তোমরা যদি গুনাহগার হতে, তাহলে যে বিজন মরু এলাকা অতিক্রম করে এসেছো, সেটি তোমাদের রক্ত চুষে নিতো এবং তোমাদের দেহের গোশ্‌তকে বালিতে পরিণত করে তোমাদের কংকর বানিয়ে ছাড়তো। এই মরুদ্যান কখনো পথভোলা পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করেনি। আমরা দু'জন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। তেমাদেরকে যেসব কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তা এই জন্য করতে হয়েছে, যাতে তোমরা খোদাকে ভুলে না যাও এবং তোমার অন্তর থেকে পাপের কল্পনাটুকুও বের হয়ে যায়। আমাদের ধারণা ছিলো, আমাদের ন্যায় রূপসী মেয়েদের দেখে তোমরা ক্ষুৎপিপাসার কথা

ভুলে যাবে এবং শয়তানের কব্জায় চলে যাবে।'

'তোমরা আমাদের সঙ্গ দিলে কেন?' আন-নাসের জিজ্ঞেস করে।

'আমাদেরকে তিনি প্রেরণ করেছেন, যিনি মরুভূমিতে পথভোলা নেক বান্দাদের পথের দিশা প্রদান করেন'– বড় মেয়েটি বললো– 'খোদা তোমাদের উপর যে রহমত বর্ষণ করেছেন, তোমরা তার হিসাব করতে পারবে না। তিনি আমাদের বলেছেন, মানুষ মৃত্যুর সময়ও শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। শয়তানের এই অপবিত্র কব্জা থেকে মুক্ত করার জন্য খোদা তোমাদের শাস্তিদান করেছেন। তারপর আমাদের আদেশ করেছেন, এদের সম্মুখে এসে পড়ো এবং এদেরকে আশ্রয় দান করো। আমরা জানতাম, তোমরা দুশমনকে কিভাবে এবং কী পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছো।'

'তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করলে কেনো?' আন-নাসের বললো।

'এটা দেখার জন্য যে, তুমি কতটা মিথ্যা বলো, আর কতটা সত্য'– মেয়েটি বললো– 'তুমি সত্যবাদী।'

'আমরা মিথ্যা বলি না'– আন-নাসের বললো– 'গেরিলা সৈনিকরা আল্লাহকে সাক্ষী বানিয়ে থাকে। আমরা নিজ বাহিনী ও সালারদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে থাকি, আল্লাহ আমাদের দেখছেন। আমরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারি না।' আন-নাসের নীরব হয়ে যায় এবং পরক্ষণেই বলে ওঠে– 'আচ্ছা, আমি যে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের সঙ্গে তোমরা কিরূপ আচরণ করবে, তার তো উত্তর দিলে না।'

'আমরা যে নির্দেশ লাভ করেছি, তার বিপরীত করতে পারি না'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'তোমাদের সঙ্গে আমাদের আচরণ মন্দ হবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের মুখ দিয়ে কথা সরছে না। তোমাদের চোখে ক্লান্তি নেমে এসেছে ঠিক; কিন্তু মনের ভয় তোমাদেরকে ঘুমাতে দিচ্ছে না। অন্তর থেকে সব ভীতি দূর করে ফেলো এবং ঘুমিয়ে পড়ো।'

'তারপর কী হবে?' আন-নাসের জিজ্ঞেস করে।

'খোদা যা নির্দেশ করেন'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবো না। যদি পালাবার চেষ্টা করো, তাহলে এই খুঁটিগুলোর ন্যায় খুঁটিতে পরিণত হয়ে যাবে। তোমরা দূর থেকে এই খুঁটিগুলো দেখে থাকবে। এগুলোর উপরে কোন ছাদ নেই। দেখতে এগুলো মিনারের ন্যায়। কিন্তু আসলে এগুলো মানুষ– মানুষ ছিলো। যদি তোমাদেরকে আসল ব্যাপারটা দেখাবার অনুমতি থাকতো, তাহলে

বলতাম, এর কোনো একটি মিনারের গায়ে তরবারীর আঘাত হানো, দেখতে তার দেহ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।'

ভয়ে আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের চোখ কোঠর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়। তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

'এটা হলো পৃথিবীর জাহান্নাম'– মেয়েটি বললো– 'এদিকে সে আসে, যে পথ ভুলে যায় আর আগমন ঘটে তার, যে পথভোলা পথিককে পথ দেখায়। অন্য কাউকে এ পথে দেখা যায় না। তারা হরিণের ন্যায় সুদর্শন প্রাণী কিংবা আমাদের ন্যায় সুন্দরী মেয়ের রূপে এসে পথহারা পথিকের পথের সন্ধান দিয়ে থাকে এবং এই জাহান্নামের কষ্ট থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু মানুষ এতোই অসৎ যে, তীর ছুঁড়ে হরিণকে মেরে ফেলে তার গোশ্‌ত ভক্ষণ করে আর আমাদের মতো নারীদেরকে অসহায় মনে করে ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করার চেষ্টা করে। সে ভুলে যায়, তার জীবনের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। এখন আর তার কোনো অন্যায় করা উচিত নয়। সে মেয়েদের প্রলোভন দেখায়, আমার সঙ্গে আসো; আমি তোমাকে বিয়ে করবো আর তুমি আমার হেরেমের রাণী হবে। এই মিনার আর খুঁটিগুলো এমনই মানুষ ছিলো। তবে তোমাদেরকে তাদের পরিণতি বরণ করতে হবে না। তোমরা শুয়ে পড়ো। আমাদের দেখে যদি তোমাদের মনে পাপ প্রবণতা জেগে উঠে, তাহলে সেই কামনাকেও ঘুম পাড়িয়ে রাখো। অন্যথায় তোমাদেরও সেই পরিণতি বরণ করতে হবে, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো। মানুষের একটা দুর্বলতা যে, তারা পিতা-মাতার যে আনন্দের মাধ্যমে জন্মলাভ করে, তারই মোহে মোহাবিষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের এই দুর্বলতা বহু সম্প্রদায়ের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত মুছে দিয়েছে।'

মেয়েটির বলার ভঙ্গিতে যাদুর ক্রিয়া। তাকে এই জগতের মেয়ে বলে মনেই হচ্ছে না। তার বুকে আছে এক পবিত্র বার্তা। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা অভিভূত হয়ে পড়ে। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মেয়েটির বক্তব্য শুনতে থাকে। কিছুক্ষণ পর তারা ঝিমুতে শুরু করে এবং একজন একজন করে মাটিতে শুয়ে পড়ে।

আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটির প্রতি তাকায়। দু'জনই মুচকি হাসতে থাকে। তারা প্রশান্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

আন-নাসের যেভাবে তার মিশনে সাফল্য অর্জন করেছে, তেমনি তার বাহিনীও তাদের অভিযানে এক আক্রমণেই সফল হয়েছে। কিন্তু সেই সংবাদ

আন-নাসেরের জানা নেই। সুলতান আইউবী সম্মিলিত বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিলেন। বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সাইফুদ্দীন রণাঙ্গন থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছেন। সুলতান আইউবী এখন তার এক সালার মুজাফফর উদ্দীনের অপেক্ষা করছেন। তাঁর আংশকা মুজাফফর উদ্দীন যদি রণাঙ্গনে থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই সে হামলা চালাবে। বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ তার সঙ্গে রয়েছে। সম্মিলিত বাহিনীর এই অংশটি যুদ্ধে অংশ নেয়ার সুযোগই পায়নি। এরা পরাজিত বাহিনীর অক্ষত রিজার্ভ বাহিনী। সুলতান আইউবী তাদের উপস্থিতির সংবাদ নিশ্চিতভাবে জানতেন না। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার আলোকে অনুভব করছিলেন, এখনো সমস্যা রয়েছে। তিনি তার গোয়েন্দাদেরকে রণাঙ্গনের চারদিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যাতে কোথাও কোনো ফৌজের সন্ধান পেলে যেনো সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবহিত করা হয়।

রণাঙ্গন থেকে দু'-আড়াই মাইল দূরে বন ও টিলা পরিবেষ্টিত সমতল ভূমি। সেখানকার তাঁবুতে বসে মুজাফফর উদ্দীন সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। বেশ কর্মব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন তিনি। ইত্যবসরে নায়েব সালার এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করে।

'নতুন কোনো খবর আছে?' মুজাফফর উদ্দীন জিজ্ঞেস করে।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনীতে কোন পরিবর্তন আসেনি'– নায়েব সালার বললো– 'বিস্তারিত এর থেকে শুনুন। এ সবকিছু দেখে এসেছে।'

গুপ্তচর বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী এখনো আমাদের পালিয়ে যাওয়া বাহিনীর পরিত্যক্ত সামানপত্র আহরণ করেনি। শুধু তাদের নিহত ও আহতদের তুলে নিয়েছে। তাদের লাশের সঙ্গে আমাদের লাশগুলোও ভিন্ন ভিন্ন কবরে দাফন করছে।'

'মৃতদের নয়– জীবিতদের সংবাদ বলো'– মুজাফফর উদ্দীন বললেন– 'আইউবী কি তার বাহিনীতে কোনো রদবদল করেছেন? তার ডান বাহু সেখানেই আছে, নাকি এদিক-ওদিক হয়ে গেছে?'

'মহামান্য সালার!'– গুপ্তচর বললো– 'আমি সাধারণ সৈনিক নই। আমি আপনাকে যে রিপোর্ট প্রদান করছি, তা কিছু একটা বুঝে-শুনেই দিচ্ছি। আপনাকে সন্তুষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি আপনার অসন্তোষকেও ভয় করি না। আমার উদ্দেশ্য ঠিক আপনারই ন্যায় যে, সুলতান আইউবীর

বিজয়কে পরাজয়ে পরিণত করতে হবে। আপনি খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে আছেন বলে মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়িই করতে হবে। তবে আপাতত অভিযান পরিচালনা থেকে বিরত থাকুন। আমি যা বলছি, বলতে দিন। আমি জানি, আপনার দৃষ্টি সুলতান আইউবীর ডান পার্শ্বের উপর নিবদ্ধ। আপনার এই টার্গেট সঠিক। কিন্তু এই ডান পার্শ্বের উপর হামলা চালালে আইউবী তার অন্যান্য অংশগুলোকে কিভাবে কাজে লাগাবে, আমি তাও পর্যবেক্ষণ করে দেখে এসেছি।'

'তিনি আমাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবেন'– মুজাফফর উদ্দীন বললেন– 'ঘেরাও বিস্তৃত রাখবেন। আমাদেরকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরে ধীরে ধীরে ঘেরাও ছোট করে ফেলবেন। আমি তার কৌশল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি।'

সালাহুদ্দীন আইউবী যে ইউনিটগুলো দ্বারা আমাদের কাল্‌বের উপর আক্রমণ করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তাদেরকে গুটিয়ে নিয়ে সম্মুখের বাহিনীর এক ক্রোশ দূরে প্রস্তুত রেখেছেন। আপনি ঠিকই ধরেছেন যে, আইউবী আমাদের আক্রমণকারী বাহিনীকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবেন। সুলতান আইউবীর ডান বাহু যে স্থানটিতে অবস্থিত, তার থেকে এক-দেড় ক্রোশ পেছনে আমাদের ও আইউবীর সৈন্যদের জন্য কবর খনন করা হয়েছে। তার সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার হবে– দেড় হাজার গর্ত। আপনি তো জানেন, কবরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা কতটুকু হয়ে থাকে। আপনি এমন একদিক থেকে হামলা করবেন, যাতে আইউবীর বাহিনী পিছনে সরে যেতে বাধ্য হয়। আপনি তাদেরকে কবরগুলোর নিকটে নিয়ে যাবেন। হাতাহাতি লড়াই করার পরিবর্তে কবরের নিকট চলে যেতে বাধ্য করবেন। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, ঘোড়া উন্মুক্ত কবরে কিভাবে নিক্ষিপ্ত হবে।'

'আইউবীর ডান বাহুর শক্তি কতটুকু এবং কী প্রকৃতির?' মুজাফফর উদ্দীন জিজ্ঞেস করে।

'অন্তত এক হাজার অশ্বারোহী এবং দেড় হাজার পদাতিক'– গুপ্তচর কমান্ডার উত্তর দেয়– 'এই বাহিনী প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। আপনি তাদেরকে তাদের অজান্তে হামলা করতে পারবেন না।' সে মুজাফফর উদ্দীনের সম্মুখস্থ নকশাটির এক স্থানে আঙ্গুল রেখে বললো– 'এই হলো দুশমনের (আইউবীর) ডান বাহু। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে এর বিস্তৃতি আটশ কদম। তার সম্মুখের জমি খানাখন্দকে পরিপূর্ণ। ডানের এলাকা সমতল ও পরিচ্ছন্ন।

আক্রমণের জন্য এই পথটি উপযুক্ত মনে হয়। কিন্তু হামলা করতে হবে সম্মুখ থেকে। তাহলে দুশমন পেছনে সরে যেতে বাধ্য হবে।'

'আমার আক্রমণ সামনের পরিত্যক্ত রাস্তা থেকেও হবে, ডানদিকে থেকে পরিচ্ছন্ন রাস্তা থেকেও'– মুজাফফর উদ্দীন বললেন– 'আমি কবরের গর্ত এবং মাটির স্তূপকেই কাজে লাগাবো।' তিনি তার নায়েব সালারদের বললেন– 'যে কোনো স্থানে কাউকে পেলে ধরে নিয়ে আসবে। এই অঞ্চল এখন যুদ্ধকবলিত। এদিক থেকে কোনো পথিক পথ অতিক্রম করবে না। এই পথে সে-ই পা রাখবে, যে কোনো না কোনো পক্ষের গুপ্তচর।'

'দু-জন পথিক। বোধ হয় তারা জানে না, এই অঞ্চলটা এখন যুদ্ধকবলিত। একজন উটের পিঠে সাওয়ার পাকা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ। উটের উপর কিছু মালপত্রও বোঝাই করা। অপরজনের হাতে উটের লাগাম। দু'জনেরই পরনে সাদাসিধে পোশাক। তারা সেই পথে অতিক্রম করছে, যেখান থেকে মুজাফফর উদ্দীনের লুকিয়ে থাকা সৈন্যদের দেখা যাচ্ছে। এক সিপাহী তাদের ডাক দেয়। তারা থামেনি। তাদের গতি আরো তীব্র হতে থাকে। মুজাফফর বাহিনীর এক অশ্বারোহী তাদের পিছু নিলে তারা দাঁড়িয়ে যায়। অশ্বারোহী তাদেরকে তার সঙ্গে যেতে বলে।

'আমরা পথিক'– যুবক বললো– 'আপনাদের তো আমরা কোনো ক্ষতি করছি না। আমাদের যেতে দিন।'

'এই পথে যেই যাবে, তাকেই ধরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আছে।' অশ্বারোহী বললো এবং তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো।

ধৃতদের একটি তাঁবুর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে তাঁবুতে সংবাদ দেয়া হলো। এক কমান্ডার বেরিয়ে এসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে– তোমরা কোথা থেকে এসেছো? তাদের উত্তরে কমান্ডার নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। কিন্তু তাদের বলা হলো, তোমাদেরকে সম্মুখে যেতে দেয়া হবে না। তোমাদেরকে বন্দী করবো না, সম্মানের সঙ্গে রাখা হবে। তবে কতদিন পর্যন্ত এখানে রাখা হবে– এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলো না।

এরাই প্রথম পথচারী, যাদেরকে মুজাফফর উদ্দীনের নির্দেশে আটক করা হলো। তাদেরকে দু'জন সিপাহীর হাতে তুলে দেয়া হলো। তারা তাদের তাঁবুতে অবস্থান করবে।

মধ্যরাত। ধৃত পথিকদের পাহারাদার সিপাহীদ্বয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ জেগে আছে। তাঁবুতে কোন আলো নেই। বৃদ্ধ নাক ডাকার

শব্দ পেয়ে বুঝে ফেলে সিপাহী ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তার সঙ্গীকে চিমটি মারে। দু'জন শুয়ে শুয়েই দরজার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দরজার নিকট পৌঁছেই তারা দাঁড়িয়ে যায় এবং বেরিয়ে পড়ে। বাইরে পিনপতন নীরবতা। তারা পালাতে শুরু করে। তাঁবু থেকে খানিক দূরে পৌঁছে বৃদ্ধ তার সঙ্গীকে বললো– 'তুমি আমার থেকে আলাদা হয়ে যাও এবং অন্য এক দিক দিয়ে ছাউনি এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও।'

দু'জন আলাদা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিলো, সমগ্র ক্যাম্পই ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু এই ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। প্রহরী জেগে আছে। এক প্রহরী অন্ধকারে ছায়ার নড়াচড়া দেখে কিছু না বলে ছায়ার পিছু ছুটতে শুরু করে।

লোকটি বৃদ্ধ পথিক। প্রহরীকে দেখে সে একস্থানে লুকিয়ে যায়। প্রহরী এগিয়ে এসে তাকে খুঁজতে শুরু করে। সেই জায়গায় কিছু মালামাল ছিলো। বৃদ্ধ তারই আড়ালে লুকিয়ে থাকে। পরে অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ে।

তেমনি অপর এক প্রহরী বৃদ্ধের সঙ্গীকে দেখে ফেলে। গোয়েন্দাদের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখার এবং গ্রেফতার করার কঠোর নির্দেশ মুজাফফর উদ্দীনের। তিনি জানেন, সুলতান আইউবীর গুপ্তচররা অত্যন্ত চৌকস ও তীব্র গতিসম্পন্ন। তাই মুজাফফর উদ্দীনের এই প্রহরীদ্বয় কর্তব্য পালনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। উভয়ে চুপচাপ আপন আপন শিকার ধরার জন্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধের সঙ্গীও চুপ হয়ে আছে। এদিকে বৃদ্ধ এক প্রহরীর সঙ্গে কানামাছি খেলে বেড়াচ্ছে। খানিক পর বৃদ্ধ অপর এক জায়গায় লুকিয়ে যায়। প্রহরী তার পেছন পেছন আসছে। বোকা প্রহরী তার বৃদ্ধ শিকারকে ফেলে সামনে এগিয়ে যায়। বৃদ্ধ খঞ্জর হাতে নেয়। নিজের মুক্তির জন্য খঞ্জরাঘাতে প্রহরীকে খতম করার পরিকল্পনা করে। সে উঠে দাঁড়ায়। আঘাত হেনে পালাবে কোন্ পথে ভাবছে মাত্র। ঠিক এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি তার নিকটে এসে দাঁড়িয়ে যায়। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বৃদ্ধ খঞ্জরটা তারই হৃদপিণ্ডে সেঁধে দেয়। পরক্ষণেই দ্বিতীয় আঘাত হানে। লোকটি ক্ষীণ একটি শব্দ করেই নীরব হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

বৃদ্ধ সেখান থেকে পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু অকস্মাৎ কে একজন পেছন থেকে তাকে ঝাঁপটে ধরে। বৃদ্ধ নিজেকে ছাড়াবার জন্য সজোরে এমন ঝটকা টান মারে যে, লোকটি পড়ে যায়। নিজে দ্রুত পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু

দৌঁড়াতে গিয়ে কি একটা বস্তুর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। বৃদ্ধ যাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে এসেছে, সে উঠে দাঁড়ায়। সে দ্রুত ছুটে এসে আবারো বৃদ্ধকে ঝাঁপটে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক-চিৎকার শুরু করে দেয়। সাথে সাথে কয়েকটি প্রদীপ জ্বলে ওঠে। তিন-চারজন প্রহরী ছুটে আসে। তারা প্রদীপের আলোতে দেখতে পায়, তাদের শিকার একজন শশ্রুমণ্ডিত বয়োঃবৃদ্ধ। কিন্তু তাদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লোকটি এমন শক্তি প্রদর্শন করছে, যা এই বয়সে তার মধ্যে থাকার কথা নয়। প্রহরীদের কবল থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়নি। ধস্তাধস্তির ফলে তার মুখে সাদা দাড়ি উপড়ে যায়। সকলে দেখতে পায় তার মুখমণ্ডলে খোঁচা খোঁচা কালো দাড়ি। লোকটি বলিষ্ঠ নওজোয়ান। সাদা দাড়ি কৃত্রিম। শুভ্র শশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ এখন টগবগে যুবক।

এই যুবক যে স্থানে খঞ্জরের আঘাতে এক প্রহরীকে হত্যা করে এসেছে, ধরে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রদীপের আলোতে সবাই দেখলো, নিহত লোকটি মুজাফফর উদ্দীনের প্রহরী নয়– হত্যাকারী যুবকেরই সঙ্গী। মুখোশধারী বৃদ্ধ প্রহরী মনে করে তারই সঙ্গীকে খুন করে ফেলেছে। তারা দু'জন আলাদা আলাদাভাবে ক্যাম্প থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু প্রহরীরা তাদেরকে দেখে ফেলেছে। প্রহরীদের ধাওয়া থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় ঘটনাক্রমে একত্র হয়ে গিয়েছিলো। বৃদ্ধ তারই সঙ্গীকে প্রহরী মনে করে খঞ্জর দ্বারা আঘাত হানে। পরপর দু'টি আঘাতে যুবক প্রাণ হারায়।

লাশের অনুসন্ধান নেয়া হলো। তার পোশাকের ভেতর থেকে খঞ্জর বেরিয়ে আসে। তাদের উটের পিঠে যে বোঝাটি ছিলো, সেটি খোলা হলো। তাতে কোন মালপত্র নেই। বস্তার ভেতরে ঘাস ভরে রাখা আছে।

ধৃত ব্যক্তিকে এক নায়েব সালারের তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। নায়েব সালার ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তিনি লোকটিকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো কথা বের হচ্ছে না। তার মুখের কৃত্রিম সাদা দাড়িগুলো নায়েব সালারকে দেখানো হলো। এ ব্যাপারেও সে কোনো মন্তব্য করলো না। কিন্তু এটা তো একটা জ্বলন্ত প্রমাণ, যা সে অস্বীকার করতে পারে না। তাকে বলা হলো, তুমি স্বীকার করো– তুমি এবং তোমার সঙ্গী সুলতান আইউবীর গুপ্তচর। কিন্তু এই অভিযোগ স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায় সে। তাকে বেদম প্রহার করা হলো। তাঁকে অস্থির করে তোলা হলো। তারপরও সে স্বীকার করলো না সে গুপ্তচর। রাত কেটে যায়। সকালে তাকে মুজাফফর উদ্দীনের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো এবং তাকে রাতের ঘটনা

শোনানো হলো। তার কৃত্রিম দাড়ি এবং সামানপত্রও মুজাফফর উদ্দীনের সম্মুখে রাখা হলো।

'কার শিষ্য?'— মুজাফফর উদ্দীন জিজ্ঞেস করেন— 'আলী বিন সুফিয়ানের, নাকি হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর?'

'আমি এদের একজনকেও চিনি না।' ধৃত ব্যক্তি জবাব দেয়।

'আমি দু'জনকেই জানি'— মুজাফফর উদ্দীন বললেন— 'আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শিষ্য। ওস্তাদ তার শিষ্যকে ধোঁকা দিতে পারে না।'

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকেও চিনি না, আপনি কে তাও জানি না।' ধৃত ব্যক্তি জবাব দেয়।

'শোনো হতভাগ্য বন্ধু!'— মুজাফফর উদ্দীন তার কাঁধে হাত রেখে বললেন— 'আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করবো না। আমি এ কথাও বলবো না, তুমি অযোগ্য বা অকর্ম। তুমি বেশ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছো। ধরা পড়া কোনো দোষের নয়। তোমার জন্য দুর্ভাগ্য যে, তোমার সঙ্গী তোমারই হাতে খুন হলো। তুমি আমাকে শুধু এটুকু বলো, এ পথে তোমার আর কোনো সঙ্গী ছিলো কিনা এবং সালাহুদ্দীন আইউবীকে সংবাদ দিয়েছে কিনা যে, এখানে ফৌজ আছে? আর বলো, তোমাদের ফৌজের বিন্যাস কিরূপ এবং বাহিনী কোথায় কোথায় আছে? তুমি আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। আমি তোমাদের কুরআনের নামে ওয়াদা দিচ্ছি, যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্র তোমাকে মুক্তি দেবো। আর সে পর্যন্ত তোমাকে সম্মানের সাথে রাখবো।'

'আপনার শপথে আমার কোনো আস্থা নেই'— ধৃত ব্যক্তি জবাব দেয়— 'কারণ, আপনি কুরআন থেকে সরে এসেছেন।'

'কেনো, আমি কি মুসলমান নই?' মুজাফফর উদ্দীন ধৈর্যের সাথে জিজ্ঞেস করেন।

'আপনি মুসলমান নিশ্চয়ই'— ধৃত ব্যক্তি জবাব দেয়— 'তবে আপনি কুরআনের নয়, ক্রুশের অফাদার।'

'তুমি আমাকে অপমান করছো'— মুজাফফর উদ্দীন বললেন— 'কিন্তু একটি শর্তে আমি এই অপমান সয়ে নেবো যে, আমি যা জানতে চেয়েছি, বলে দাও। তোমার জীবন এখন আমার হাতে।'

'আল্লাহর হাত থেকে আপনি আমার জীবন ছিনিয়ে নিতে পারবেন না'— ধৃত ব্যক্তি বললো— 'আপনি তো জানেন, আমাদের প্রত্যেক সৈন্য নিজেদের জীবন আল্লাহর হাতে তুলে দিয়ে যুদ্ধ করে। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি,

আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচর এবং আমার সঙ্গীও গুপ্তচর ছিলো। আপনার আর কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না। আমি জীবিত আছি। আপনি আমার গায়ের চামড়া তুলে ফেলুন। তারপরও আমার মুখ থেকে আপনার কাঙ্খিত প্রশ্নগুলোর উত্তর বের হবে না। আমি আপনাকে এও বলে রাখছি, পরাজয় আপনারই কপালে লিবিবদ্ধ হয়ে আছে।'

'লোকটার পায়ের সঙ্গে রশি বেঁধে ঐ গাছটার সঙ্গে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখো।' মুজাফফর উদ্দীন একটি গাছের দিকে ইশারা করে নির্দেশ দিয়ে আপন তাঁবুতে ফিরে যান।

'তারা দু-জন তো এখনো আসলো না'– হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলছিলেন– 'ওদের তো ধরা পড়ার কোন আশংকা ছিলো না। এখানে আমাদের গুপ্তচরদের ধরার মতো কারা আছে। তাদের বেশি দূরেও তো যাওয়ার কথা ছিলো না।'

'হয়তো বা তারা ধরা পড়ে গেছে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যখন তারা সকালে গিয়ে সন্ধ্যার পরও এসে পৌঁছলো না, তো তারা ধরাই পড়ে গেছে। তাদের না আসাই প্রমাণ করে, এখানে ধরার মতো লোক আছে। রাতে আরো কিছু লোক পাঠিয়ে দাও। তারা আরো খানিক দূরে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসুক।'

সুলতান আইউবী ও হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সেই দুই গুপ্তচরের কথাই বলছিলেন। আইউবী সবসময় তার গোয়েন্দা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেছেন এবং এই ব্যবস্থারই দিক-নির্দেশনায় দুশমনকে নাকাকি-চুবানি খাইয়েছেন। কিন্তু এবার তার সেই ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে চলেছে। কারণ হচ্ছে, এখানকার যুদ্ধে তার প্রতিপক্ষ তারই শিষ্য মুজাফফর উদ্দীন। গত রাতে তুর্কমানের কিছু দূরে এক বিজন এলাকায় আইউবীর এক গোয়েন্দার লাশ পাওয়া গেছে। তার পাজরে তীর গাঁথা ছিলো। মুজাফফর উদ্দীন তার নায়েব সালারদের বলেছিলেন– 'তোমরা যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারো, তাহলে তিনি অন্ধ ও বধির হয়ে যাবেন। তারপর তোমরা তাকে পরাজিত করার কথা ভাবতে পারবে।'

এখন আবার তার দু'জন গোয়েন্দা নিখোঁজ হয়ে গেলো। এ দু'টি ঘটনাকে সুলতান অবহেলা করতে পারেন না। তার নির্দেশে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ ছয়জন কমান্ডো গোয়েন্দা রওনা করিয়ে দেন।

রাতের শেষ প্রহর। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ফজরের আযানের প্রথম ধ্বনি 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিত হওয়ামাত্র সুলতান আইউবীর চোখ খুলে যায়। তিনি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসেন। খাদেম প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁর তাঁবুর সম্মুখে রেখে দেয়। ওদিক থেকে এক আরোহী ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে আসে। লোকটি সুলতানের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে ঘোড়া থেকে অবতরণ করে বললো- 'সুলতানের মর্যাদা বুলন্দ হোক। আপনার বাহিনীর ডান পার্শ্ব যে স্থানে অবস্থান করছে, তার সম্মুখে অন্য কোনো বাহিনীর পদচারণা লক্ষ্য করা গেছে। খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য দু'জন লোক এগিয়ে গিয়েছিলো। তারা তথ্য নিয়ে এসেছে যে, বাহিনী আসছে।'

সুলতান আইউবী তার কেন্দ্রীয় কমান্ডের সালারদের নাম উল্লেখ করে বললেন, ওদেরকে ডেকে আনো। তিনি তায়াম্মুম করেন। তার কাছে অজু করার মতো সময় নেই। তারপর জায়নামায বিছানো ছাড়াই কেবলামুখী হয়ে সেখানেই নামায আদায় করেন। শেষে সংক্ষিপ্ত দু'আ করে ঘোড়া তলব করেন।

'এই বাহিনী মুজাফফর উদ্দীন ছাড়া আর কারো হতে পারে না'- সুলতান আইউবী তার সালারদের বললেন- 'এরা খৃস্টান হতে পারে না। এই তথ্য যদি সত্য না হয় যে, দুশমন আমাদের ডান পার্শ্বের বাহিনীর সম্মুখ দিক থেকে আসছে, তাহলে হামলাটা হবে দু'তরফা। আমাদের কোনো ইউনিটকে পিছু হটতে দেয়া যাবে না। পেছনে দেড় হাজার কবরের গর্ত। এখানো সব লাশ দাফন করা হয়নি। অন্যথায় এইসব গর্ত আমাদের অশ্বারোহীদের কবরে পরিণত হবে।'

সুলতান আইউবী ঘোড়ায় আরোহন করেন। তার রক্ষী বাহিনীর বারজন সেনা তার পেছনে রওনা দেয়। তারাও অশ্বারোহী। তিনি আধা ডজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূতও সঙ্গে নিয়ে নেন। সাথে আছে দু'জন সালারও। ঘোড়া হাঁকিয়ে তিনি এমন একটি টিলার উপর আরোহন করেন, যেখান থেকে তাঁর বাহিনীর ডান পার্শ্বের সম্মুখের এলাকা ও তার বাহিনীকে দেখা যায়। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করলে তিনি টিলার উপর থেকে অবতরণ করে ডান পার্শ্বের বাহিনীগুলোর কমান্ডারদের নির্দেশ দেন- 'আরোহীদেরকে ঘোড়ায় আরোহন করাও। পদাতিকদের মধ্যে যারা তীরান্দাজ, তাদেরকে সম্মুখস্থ অঞ্চলের খানা-খন্দকে ও উঁচু পাথরের আড়ালে গিয়ে মোর্চা তৈরি করতে বলো।'

'এখন থেকে ডান পার্শ্বের সবক'টা ইউনিটের সর্বোচ্চ কমান্ড আমার হাতে থাকবে'– সুলতান আইউবী তার কমান্ডার ও নায়েব সালারদের বললেন– 'যার যার দূতকে সঙ্গে রাখো এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলো।'

মুজাফফর উদ্দীনের বাহিনী এখানো এতো নিকটে এসে পৌঁছায়নি যে, তারা সুলতান আইউবীর বাহিনীর তৎপরতা দেখতে পাবে।

মুজাফফর উদ্দীনের অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ করে। কিন্তু যেইমাত্র তার প্রথম অশ্বারোহী ইউনিটটি সুলতান আইউবীর বাহিনীর সম্মুখস্থ এলাকায় এসে পৌঁছে, সঙ্গে সঙ্গে তার সেনানিবাস লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এলাকাটা অসংখ্য খাদ আর স্তূপের ন্যায় পাথর খণ্ডে পরিপূর্ণ। এসব খানা-খন্দকেই সুলতান আইউবীর তীরান্দাজরা বসে আছে। মুজাফফর উদ্দীনের বাহিনী এসে পৌঁছামাত্র উপর দিয়ে অতিক্রমকারী ধাবমান ঘোড়ার উপর তীর ছুঁড়তে শুরু করে। তীরের আঘাত খেয়ে আরোহীরা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে আরম্ভ করে। যখনই যে ঘোড়ার গায়ে তীর বিদ্ধ হচ্ছে, সেটি বেশামাল হয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করে। সাধারণত এমনটি যে কোনো যুদ্ধেই হয়ে থাকে। মুজাফফর উদ্দীনের জন্য এই পরিস্থিতি বিস্ময়কর কোনো ঘটনা নয়। তার অস্থিরতার কারণ হচ্ছে, তার আশা ছিলো, তিনি সুলতান আইউবীর অজান্তে ও অলক্ষ্যে হামলা করবেন। কিন্তু তার সেই আকাঙ্খার বিপরীতে আইউবীর ডান বাহুর সৈন্যরা সচেতন এবং মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত। এই সংঘাতে সুলতান আইউবীর অসংখ্য তীরান্দাজ ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা গেছে। সৈন্যদের এই ত্যাগের বিনিময়ে সুলতান আইউবীর উপকার এই হলো যে, মুজাফফর উদ্দীনের আক্রমণের তীব্রতা শেষ হয়ে গেছে। এরপর তিনি স্থির হয়ে লড়াই করতে পারবেন। মুজাফফর উদ্দীন যে আশা নিয়ে ময়দানে এসেছিলো, তা পূর্ণ হবে না। তার আশা ছিলো তিনি সুলতান আইউবীর উপর অতর্কিত হামলা চালাবেন এবং আইউবীকে তার কৌশলের ফাঁদে ফেলে পরাস্ত করবেন। কিন্তু তিনি যতোই কুশলী হোন, আইউবী তাঁর ওস্তাদ। ওস্তাদের বিদ্যার কাছে ছাত্রের বিদ্যা হার মানতে বাধ্য। সুলতান আইউবীর নিকট আসার পর মুজাফফর উদ্দীনের বিদ্যা ও কৌশল প্রথমবারের মতো হার মানতে বাধ্য হয়।

সুলতান আইউবীর কিছুসংখ্যক তীরান্দাজ মুজাফফর উদ্দীনের ঘোড়ার পদতলে পড়ে জীবন কুরবান করে দেয়। তাদের এই কুরবানীতে সুলতান

আইউবী লাভবান হন। মুজাফফর উদ্দীনের আক্রমণকারী বাহিনী কিছুসংখ্যক ঘোড়া ও তাদের আরোহীদের নিহত ফেলে সম্মুখে এগিয়ে যায়। সম্মুখে সুলতান আইউবী স্বয়ং। আক্রমণকারীদের বিস্তার দেখে সে অনুপাতে নিজ সৈন্যদের নির্দেশ প্রদান করেন। আক্রমণকারী বাহিনী নিকটে এসে পৌঁছলে সুলতান আইউবীর বাম বাহুর অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের ঘোড়াগুলোকে বামদিকে ঘুরিয়ে ছুটতে শুরু করে। ডান বাহুর অশ্বারোহী সৈন্যরাও তা-ই করে। এখন আক্রমণকারীদের সম্মুখে কোনো প্রতিপক্ষ নেই। তাদের প্রতিপক্ষ ডান ও বামদিকে পালিয়ে গেছে।

আক্রমণকারীদের কিছু ঘোড়া ডানদিকে মোড় নেয়। কিছু বামদিকে। অধিকাংশ সৈন্য নাক বরাবর চলে আসে। এখন আক্রমণকারী বাহিনীর পার্শ্বে আইউবীর সৈন্যদের সম্মুখে তারা প্রবলবেগে ঘোড়া হাঁকায় এবং উভয় দিক থেকে ক্ষীপ্র গতিতে হামলা করে বসে। আক্রমণটা এতোই তীব্র ও কার্যকর প্রমাণিত হয় যে, তাদের একটি বর্শার আঘাতও ব্যর্থ হয়নি। আক্রমণকারীরা তো সামনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। পার্শ্ব বাহিনীকে হেফাজত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সামনের দিকে চলে যেতে পারলেই তারা নিষ্কৃতি পায়। সামনে দেড় হাজার কবরের গর্ত। আক্রমণকারীদের পেছনে পেছনে সুলতান আইউবীর অশ্বারোহী বাহিনী ধেয়ে আসছে। পেছনের ধাওয়া খেয়ে আক্রমণকারীদের ঘোড়া উন্মুক্ত কবরগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করে।

মুজাফফর উদ্দীন ভয় পাওয়ার মতো সেনাপতি নন। প্রথম আক্রমণটা স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা করিয়ে তিনি রণাঙ্গনের ভাবটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। পরিস্থিতিটা বুঝে এবার তিনি সৈন্যের স্রোত ছেড়ে দেন। সুলতান আইউবীর সৈন্যরা খোড়া কবরগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছে। তারা সুলতান আইউবীর দ্বিতীয় নির্দেশ বাস্তবায়ন শুরু করলো বলে, অমনি মুজাফফর উদ্দীনের দ্বিতীয় ইউনিটটি তাদের মাথার উপর এসে পড়ে। তারা আত্মসংবরণ করতেই শত্রু বাহিনীর পেছন দিক থেকে প্রবল বেগে হামলা করে বসে। এই আক্রমণে সুলতান আইউবীর সৈন্যদের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। কয়েকজন অশ্বারোহী সামনের দিকে পালিয়ে যায় এবং তাদের ঘোড়াগুলো কবরের গর্তে পড়ে যায়। পরক্ষণেই মুজাফফর উদ্দীন ডানদিক থেকেও আক্রমণ করে বসে।

এই পরিস্থিতি সুলতান আইউবীকে পেরেশান করে তোলে। তিনি এই

নির্দেশসহ দূত পাঠিয়ে দেন যে, রিজার্ভ বাহিনী যেনো পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালায়। ডান বাহুর বিন্যাস বেকার হয়ে পড়ে। মুজাফফর উদ্দীন লড়াই করছে আইউবীরই শেখানো কৌশল অনুপাতে। তবে তার দুর্বলতা হলো, পেছন থেকে তার সাহায্যের কোন ব্যবস্থা নেই। সুলতান আইউবী দূতদের মাধ্যমে তার কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদেরকে ডান ও বাম দিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন। যখন তাঁর রিজার্ভ বাহিনী পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে, মুজাফফর উদ্দীন বেকায়দায় পড়ে যান। এবার তার হেডকোয়ার্টারই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু তারপরও তিনি পালাবার চিন্তা করেননি।

ঐতিহাসিকদের মতে, বিকাল পর্যন্ত উভয় বাহিনীর যে লড়াই অব্যাহত থাকে, তা ছিলো অত্যন্ত তীব্র ও অতিশয় রক্তক্ষয়ী। কমান্ড সুলতান আইউবীর হাতে ছিলো। অন্যথায় ফলাফল ভিন্ন রকম হতো। এই যুদ্ধে মুজাফফর উদ্দীন যে দক্ষতা ও সাহসিকতার প্রমাণ দেন, তাতে সুলতান আইউবী তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তবে গুরুর কাছে শিষ্য হার মানতে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সুলতান আইউবী তার একটি বিশেষ অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা আক্রমণ করান। তাতে মুজাফফর উদ্দীনের অবস্থান অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। টিকতে না পেরে তিনি পেছনে সরে যান। তার বহু সৈন্য সুলতান আইউবীর হাতে বন্দী হয়। মুজাফফর উদ্দীনের সামরিক উপদেষ্টা ফখরুদ্দীনও বন্দী হয়।

ফখরুদ্দীন সাধারণ কোনো লোক নয়। সাইফুদ্দীনের মন্ত্রী ছিলো। তুর্কমানের যুদ্ধে সাইফুদ্দীন পালিয়ে গেলে ফখরুদ্দীন মুজাফফর উদ্দীনের নিকট চলে যায় এবং সুলতান আইউবীর উপর হামলা করার জন্য তাকে প্ররোচিত করে।

ঘটনাটা ৫৭১ হিজরী মোতাবেক ১১৭৪ সালের। এই যুদ্ধে মুজাফফর উদ্দীন পরাজয়বরণ করেন এবং সুলতান আইউবী তাঁর মুসলমান দুশমনদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান আইউবীরও এতো বেশি ক্ষতি সাধিত হয়েছিলো যে, পরবর্তী দুই মাস পর্যন্ত তিনি তুর্কমান থেকে নড়ার শক্তি পাননি। তাঁর ডান বাহু নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো, যেনো তাঁর নিজের বাহু অবশ হয়ে গেছে। তাঁর নিকট নতুন ভর্তি আসছিলো। কিন্তু এখনই তাদের নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলো না। তিনি সেদিনই দামেস্ক ও মিশর দূত প্রেরণ করে নতুন সৈন্য তলব করেন। ক্ষতিটা যদি এতো বেশি না হতো, তাহলে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হালব, মসুল ও

হাররানের উপর আক্রমণ করে তাঁর যেসব মুসলমান দুশমন **ফিলিস্তিনের** পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিলো, তাদেরকে হয়তো সুপথে ফিরিয়ে আনতেন, নতুবা খতম করে দিতেন।

'এটা আমার বিজয় নয়'– যুদ্ধের পর সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের উদ্দেশে বললেন– 'এটা খৃষ্টানদের বিজয়।' তারা আমাকে দুর্বল করতে চাচ্ছিলো। এই লক্ষ্যে তারা সফল হয়েছে। তারা আমাদের অগ্রযাত্রার গতি শ্লথ করে ফিলিস্তিনের উপর তাদের কব্জা আরো দীর্ঘতর করে নিলো। আমাদের এই মুসলমান ভাইয়েরা কবে বুঝবে যে, কাফেররা তাদের বন্ধু হতে পারে না এবং তাদের বন্ধুত্বের আড়ালেও শত্রুতা লুকায়িত থাকে। ইতিহাস লেখকরা আমাদের অনাগত বংশধরদের আমাদের এই পারস্পারিক সংঘাতকে কোন্ ভাষায় বুঝাবে, তা আমার জানা নেই।'

আসিয়াত ও তুর্কমানের মধ্যবর্তী সেই নরকসম এলাকায়, যেখানে সুলতান আইউবীর চারজন কমান্ডো সেনা পথ ভুলে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিলো, সেখানে এখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। কমান্ডার আন-নাসের চোখ খোলে। সে শোয়া থেকে উঠে বসে। মেয়ে দু'টো জেগে আছে। এবার আন-নাসের-এর মনে ভয় ধরে যায়। মেয়েরা তাকে অভয়বাণী শুনিয়েছিলো। তবু সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

'ওদেরকে জাগাও'– বড় মেয়েটি বললো– 'আমাদেরকে বহু দূর যেতে হবে।'

'আমাদেরকে পথে তুলে দিয়ে যাবে তো?' আন-নাসের জিজ্ঞেস করে।

'তোমরা সবাই আমাদের সঙ্গে যাবে'– মেয়েটি জবাব দেয়– 'আমাদের ছাড়া তোমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না।'

আন-নাসের তার সঙ্গীদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটিকে কি যেন বললো। সে উঠে অপর একটি ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা থলে থেকে কি যেনো বের করে। তারপর পানির মশক খুলে আনে। মশকের মুখ খুলে থলের বস্তুগুলো মশকের মধ্যে ফেলে দেয়। তারপর নাড়া দিয়ে মশকটি আন-নাসেরের হাতে দিয়ে বললো– 'পানি পান করে নাও; গন্তব্যে পৌঁছার আগে পানি না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা পানি পান করে। বড় মেয়েটি তাদের প্রত্যেককে কিছু খাবার খেতে দেয়। পরে মেয়েরা থলে থেকে মশকটিকে ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে রাখে। সূর্য নীচের দিকে নামতে থাকে।

'তোমরা এই স্থানটিকে জাহান্নাম বলেছিলে'– আন-নাসের উচ্চস্বরে বলে ওঠে– 'আমি তো এখানে সবুজ-শ্যামলিমা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা এতো তাড়াতাড়ি আমাদেরকে এখানে কিভাবে পৌঁছিয়ে দিলে?'

আন-নাসেরের তিন সঙ্গী বিস্মিত নয়নে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করছে।

'তোমরাও কি সবুজ-শ্যামলিমা দেখতে পাচ্ছ?' বড় মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'আমরা সবুজের মাঝে বসে আছি'– একজন বললো।

'তোমরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে না তো? তোমরা তো পরী!' অপর একজন বললো।

'না'– মেয়েটি মুচকি হেসে বললো– 'আমরা তোমাদেরকে এর চেয়েও সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।'

বড় মেয়েটি আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের তার সম্মুখে পাশাপাশি বসিয়ে দু'হাত দু'জনের কাঁধের উপর রেখে বললো– 'আমার চোখে দৃষ্টিপাত করো।'

ছোট মেয়েটিও আন-নাসেরের অপর সঙ্গীদেরকে অনরূপ সামনাসামনি বসিয়ে নিজের হাত দু'টো তাদের কাঁধে রেখে তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে বললো। সুলতান আইউবীর চার কমান্ডোর কানে বড় মেয়েটির সুরেলা কণ্ঠ প্রবেশ করতে শুরু করে– 'এটি তোমাদের জান্নাত। এই ফুলগুলোর রং দেখো। এর সৌরভ শুকে দেখো। ফুলের মাঝে উড়ন্ত পাখিগুলোকে দেখো। তোমাদের পায়ের নীচে মখমলের ন্যায় ঘাস। কূপ দেখো। কূপগুলোর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানি দেখো।'

মেয়েটির কণ্ঠ চার কমান্ডোর বিবেক, চোখ ও সমস্ত অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। আন-নাসের পরে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা প্রধান হাসান ইব্‌নে আব্দুল্লার নিকট ঘটনার যে বিবরণ প্রদান করেছিলো, তাতে সে বলেছিলো, মেয়ে দু'টোর চোখগুলোকে পানির স্বচ্ছ কূপ মনে হতে লাগলো। সঙ্গে তাদের কাঁধের উপর ছড়ানো রেশমকোমল চুলগুলো চিত্তাকর্ষক ফুলের পাপড়িতে পরিণত হয়ে যায়। আমাদের মনে হচ্ছিলো, আমরা এমন একটি বাগিচায় বসে আছি, যার সৌন্দর্য ও ফুলের রঙের বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। সেখানে বালি ও মাটির লম্বা লম্বা টিলা ছিলো না। ছিলো না মরু অঞ্চল। সর্বত্র গাছ-গাছালি আর সবুজের সমারোহ। পায়ের নীচে মখমলসম ঘাসের ফরাশ আর রং-বেরঙের পাখ-পাখালির কিচির-মিচির শব্দ।

আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা মখমলসম যে ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে চলছিলো, সেগুলো ছিলো মূলত বালি। কোথাও কোথাও শক্ত মাটি। তারা সব ক'জন গুন গুন করে একটি গান গেয়ে চলছে। মেয়ে দু'টো তাদের কয়েক পা দূরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের গতি তুর্কমান নয়, যেখানে সুলতান আইউবীর ফৌজ অবস্থান করছে এবং সেটি আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের গন্তব্য। তাদের গতি আসিয়াতের সেই দুর্গ, যেখানে হাশিশিদের নেতা শেখ সান্নান অবস্থান করছে। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা জানে না, তারা কোন্দিকে যাচ্ছে। বরং পথ চলছে কিনা, তাদের সেই অনুভূতিটাই ভোতা হয়ে গেছে। তাদের পেছনে পেছনে সেই মেয়ে দু'টো আপসে কথা বলছে। সেই কথার শব্দ কমান্ডোদের কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। সূর্য ডুবে গেছে।

'তুমি বলছো, রাতে কোথাও অবস্থান করবে না'– ছোট মেয়েটি বড় মেয়েকে বললো– 'লোকগুলো কি সারারাত হাঁটতে পারবে?'

'তুমি পানিতে মিশিয়ে তাদেরকে যে পরিমাণ হাশিশ পান করিয়েছো, তার ক্রিয়া আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবে'– বড় মেয়েটি বললো– 'আর আমি তাদেরকে যা খাইয়েছি, তা তুমি দেখেছো। এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আশা করি, সূর্যোদয়ের আগে আগেই আমরা আসিয়ান পৌঁছে যাবো।'

'আমি তো ওদেরকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম'– ছোট মেয়েটি বললো– 'তোমার কৃতিত্ব যে, তুমি তাদেরকে আয়ত্ত্ব করে ফেলেছো এবং তাদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছো, আমরা পরী। মুসলমানরা জিন-পরী বিশ্বাস করে।'

'এটা ছিলো বুদ্ধির খেলা'– বড় মেয়েটি বললো– 'আমি তাদের মানসিক অবস্থাটা আয়ত্ত্ব করে ফেলেছিলাম। তাদের চেহারা ও চালচলন দেখে আমি বুঝে ফেলেছিলাম, ওরা সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈনিক এবং পথ ভুলে গেছে। আমি এও বুঝে ফেলেছিলাম যে, আমাদেরকে দেখে তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। যদি আমরা ভয় পেয়ে যেতাম এবং নারীর ন্যায় কাপুরুষতা প্রদর্শন করতাম, তাহলে উল্টো তারা আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করতো, যা আমরা জীবনেও ভুলতে পারতাম না। এই বিজন অঞ্চলে কোনো পুরুষ যদি আমাদের ন্যায় মেয়েদের হাতে পেয়ে যায়, তাহলে তারা আমাদের সঙ্গে বোন-কন্যার চোখে দেখবে, এমন আশা করা যায় না। আমি তাদের দৈহিক অবস্থা দেখেছি। তারপরও কৌশল ঠিক করেছি, মুসলমানদের মধ্যে তো এই দুর্বলতা আছে যে, জিনের ব্যাপারে তারা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাই আমি বুদ্ধি

করে জিন সেজেছি। এই নরকে আমাদের ন্যায় রূপসী মেয়েদের উপস্থিতিকে তাদের বিবেক মেনে নিতে পারে না। তারা আমাদেরকে হয়তো কাল্পনিক বলে মনে করছে, নয়তো জিন-পরী ভাবছে। আমি তাদের সঙ্গে যে ধারায় কথা বলেছি, তাতে তারা নিশ্চিতভাবে বুঝে নিয়েছে– আমরা পরী। মুসলমান আবেগপ্রবণ জাতি। এটা তাদের দুর্বলতা। বিষয়টা আমার জানা ছিলো। তোমাকে এখনো অনেক কিছু শেখাতে হবে। তাড়াতাড়ি শিখে ফেলো। আমি সাইফুদ্দীনের ন্যায় সুচতুর লোকটাকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচিয়ে ছেড়েছি। এরা তো সৈনিক।'

'জানি না আমি কেনো এই বিদ্যায় সফল হতে পারছি না'– ছোট মেয়েটি বললো– 'আমার অন্তর আমাকে সঙ্গ দেয় না। তোমার মতো কৃতিত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা তো কম করছি না। কিন্তু হৃদয় থেকে আওয়াজ আসে, এটা প্রতারণা।'

'তাহলে তুমি পুরুষদের হাতের খেলনা-ই হয়ে থাকবে'– বড় মেয়েটি বললো– 'তুমি এই প্রথমবার বাইরে বের হয়েছো। আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি সফল হচ্ছো না। এমন হলে তোমাকে পুরুষদের গণিকা হয়েই থাকতে হবে। এভাবে তুমি ক্রুশের কোন সেবা করতে পারবে না। নিজের শরীরটাকে তুমি সময়ের অনেক আগে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলবে আর এই পুরুষরা তোমাকে বাইরে ছুঁড়ে মারবে। আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমরা মুসলিম আমীর ও শাসকদের বিনোদনের উপকরণ হয়ে থাকবো। একদিন না একদিন আমাদেরকে জাদু হয়ে তাদের বিবেকের উপর জয়ী হতেই হবে। এই চার সৈনিকের মাঝে তুমি যে কুসংস্কার দেখেছো, তা আমাদের খৃস্টান গুরু এবং ইহুদীরা তাদের মাঝে জন্ম দিয়েছে। তুমি দেখেছো, আমি কতো তাড়াতাড়ি তাদেরকে আমার হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছি। আমি তাদেরকে একটি কথা বলছিলাম। কথাটা আমাকে আমার ওস্তাদ শিক্ষা দিয়েছেন। তাহলো; মানুষ একটি আনন্দের সৃষ্টি। আর সবসময় তারা সেই আনন্দ ভোগ করার প্রত্যাশী থাকে। আবার তারা এই কামনাকে দমন করারও চেষ্টা করে থাকে। আমাদের মিশন হলো মুসলমানদের মাঝে এই ভোগলিপ্সা জাগিয়ে তোলা। এটাই মানুষের সেই দুর্বলতা, যা তাকে ধ্বংসের দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেয়। তোমার কি সেই রাতের কথা মনে নেই, যে রাতে সাইফুদ্দীন আমাদের উপস্থিতিতে তার এক সালারকে বলেছিলেন– আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করা যায় কিনা ভাবছি। আমি সেই রাতেই তার মস্তিষ্ক

থেকে এই ভাবনা বের করে দিয়েছিলাম।'

'আসিয়াত পৌঁছে আমাকেও এই ওস্তাদী শিখিয়ে দিও'– ছোট মেয়েটি বললো- 'এই কাজগুলো করতে আমার কেমন যেনো অনীহা লাগছে। আমি মুসলমান শাসকদের খেলনা হয়ে আছি। তুমি তো চালাকি করে আঁচল বাঁচিয়ে রাখছো; কিন্তু আমি পারছি না। অনেক সময় মনে চিন্তা আসে, পালিয়ে কোথাও চলে যাই। কোন পথও পাই না, আমার কোন আশ্রয়ও নেই।'

'সবই শিখতে পারবে'– বড় মেয়েটি বললো– 'তোমাকে আমার সঙ্গে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। আমি তোমার দুর্বলতাগুলো বুঝতে পেরেছি। এসব দূর হয়ে যাবে।'

আন-নাসের তার সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে চলছে। মেয়েরা ঘোড়া নিয়ে তাদের সামনে চলে যায়, যাতে তারা পথ হারিয়ে না ফেলে। তারা সমকণ্ঠে গান গেয়ে চলছে। বালি, মাটি ও পাথর তাদের জন্য ঘাস হয়ে আছে।

'ওদেরকে অন্য কোন পথে তুলে দেয়া প্রয়োজন ছিলো'– ছোট মেয়েটি বললো– 'ওদেরকে অসিয়াত নিয়ে কী করবে?'

'আমাদের গুরু শেখ সান্নানের জন্য এর চেয়ে উত্তম উপহার আর কিছু হতে পারে না'– বড় মেয়েটি জবাব দেয়– 'এরা সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডোসেনা এবং গুপ্তচর। আইউবীর একজন গুপ্তচর ধরে তার মস্তিষ্ক ধোলাই করতে পারলে বুঝতে হবে, তুমি তাঁর বাহিনীর এক হাজার সৈনিককে বেকার করে দিয়েছো। আইউবীর একজন গুপ্তচর গেরিলা সৈন্য আমাদের ঊর্ধ্বতন একজন সেনা অফিসারের সমান, বরং তার চেয়েও মূল্যবান। তারা দৈহিক দিকে থেকে অস্বাভাবিক শক্তিশালী ও সহনশীল। আবার মানসিক দিক থেকেও পাহাড়ের ন্যায় অটল। নিজের কর্তব্যকে তারা জীবনের চেয়েও মূল্যবান মনে করে থাকে। এই চার সৈনিক অভিযান পরিচালনা এবং ক্লান্তির পরও মরু অঞ্চলে যে বিপদ ও ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করেছে, তা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের সৈন্যদের মাঝে এই চেতনা ও ক্ষমতা নেই। সুলতান আইউবীর এই চার সৈনিককে আমি শেখ সান্নানের হাতে তুলে দেবো। তুমি সম্ভবত জানো না, সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার জন্য কয়েকবার চেষ্টা চালানো হয়েছিলো। কিন্তু একটি অভিযানও সফল হয়নি। এই চার ব্যক্তিকে হাশিশ ও ওস্তাদীর মাধ্যমে আইউবীকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত করা যেতে পারে। এরা আইউবীর নিজস্ব কমান্ডো। এরা সহজে আইউবী পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে।'

'আচ্ছা, আমরা সাইফুদ্দীন, গোমস্তগীন ও অন্যান্যদেরকে যেভাবে কাবু করেছি, সালাহুদ্দীন আইউবীকে কি সেই প্রক্রিয়ায় কাবু করা যায় না?' ছোট মেয়েটি প্রশ্ন করে।

'না'– বড় মেয়েটি জবাব দেয়– 'যে ব্যক্তি জগতের সুখ-ভোগ ত্যাগ করে একটি পবিত্র লক্ষ্য অর্জনে আত্মনিয়োগ করেছে, আমাদের ন্যায় রূপসী মেয়ে আর সোনার স্তূপ কোনকিছুই তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। আইউবী এক স্ত্রীর প্রবক্তা। নুরুদ্দীন জঙ্গীর এই একটি সমস্যা ছিলো যে, রাজা হয়েও তিনি ঘরে একজন মাত্র স্ত্রী রেখেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তারই অনুরক্ত ছিলেন। এই সমস্যাটা সালাহুদ্দীন আইউবীর মধ্যেও বিদ্যমান। বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু এই পাথরটাকে গলানো যায়নি। অথচ আইউবীকে হত্যা না করে আমাদের ফিলিস্তিনে দখল বজায় রাখা সম্ভব নয়।'

'সেই পুরুষই আমার কাছে ভালো লাগে, যে এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে'– ছোট মেয়েটি বললো– 'আমি ক্রুশের পুজারী। ক্রুশের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানা থাকা সত্ত্বেও আমি মাঝে-মধ্যে ভাবি, আমি এমন একজন পুরুষের হৃদয়ে স্থান করে নেই, যে আমার দেহ-মন ও আত্মার অংশ হয়ে থাকবে।'

'আবেগ ত্যাগ করো'– বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বললো– 'ক্রুশের মহান মিশন বাস্তবায়নে নিবেদিত হয়ে কাজ করো। ক্রুশ হাতে নিয়ে যে শপথ করে এসেছো, সে কথা স্মরণ করো। আমি জানি, তুমি টগবগে এক তরুণী। এই বয়সে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন কাজ। কিন্তু ক্রুশ আমাদের থেকে এই কুরবানীই কামনা করছে।'

রহস্যময় এই কাফেলাটি এগিয়ে চলছে। আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা মেয়েদের ঘোড়ার পেছন পেছন হাঁটছে। তারা কখনো সমস্বরে গান গাইছে, কখনো গুন গুন করছে। আবার কখনোবা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। রাত যতো গভীর হচ্ছে, তাদের গন্তব্যও কাছে চলে আসছে।

এরা সেই গোত্রের মেয়ে, যাদের একাধিক কাহিনী আপনারা পেছনে পাঠ করে এসেছেন। ইহুদী-খৃস্টানরা সুন্দরী কিশোরী-তরুণীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা বিনষ্ট, চরিত্র ধ্বংস এবং শত্রুকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করার কলাকৌশল শিক্ষা দিতো। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে শত্রুর চিন্তা-চেতনার উপর কিভাবে প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে, সেই প্রশিক্ষণ তাদের কৈশোরেই প্রদান করা হতো। তাদের মাঝে

চঞ্চলতা ও বেহায়াপনা সৃষ্টি করা হতো। তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে নীতি-নৈতিকতা ও লাজ-শরম কিছুই অবশিষ্ট রাখা হতো না। ইহুদীরা যেহেতু মুসলমানদেরকে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করতো, সে জন্যে তারা তাদের কন্যাদেরকে এ কাজের জন্য খৃস্টানদের হাতে তুলে দিতো। খৃস্টানরা নিজেদের কন্যাদেরকে ব্যবহার করতো। তারা তাদের শাসিত অঞ্চলগুলোতে মুসলমানদের কাফেলার উপর আক্রমণ করতো এবং কোন রূপসী-কিশোরী কন্যা পেলে তাকে তুলে নিয়ে আসতো এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মিশনের জন্য প্রস্তুত করতো।

এই মেয়ে দু'জনকে খৃস্টানরা কিছুদিন আগে মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেছিলো। সাইফুদ্দীন সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন। খৃস্টানরা এ মেয়ে দু'জনকে তিনটি মিশন দিয়ে প্রেরণ করে। প্রথমত, তারা খৃস্টানদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করবে। দ্বিতীয়ত, সাইফুদ্দীন যাতে সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করার ভাবনা ভাবতে না পারে, সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখবে। তৃতীয় মিশন ছিলো, যেসব মুসলিম আমীর সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে গিয়েছিলো, তাদের মাঝে পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করে রাখা। এ কাজগুলো শুধু এ দু'টো মেয়ের উপরই ন্যাস্ত করা হয়নি, সেখানকার গোটা খৃস্টান মিশনারীই এ কাজে নিয়োজিত ছিলো। তারা বেশ ক'জন মুসলমানের ঈমান ক্রয় করে ফেলেছে। এখন সেসব মুসলমান তাদেরই হয়ে কাজ করছে।

সাইফুদ্দীন যখন সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে তুর্কমানে সুলতান আইউবীর উপর আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন, তখন রাজা-বাদশাদের রীতি অনুযায়ী তিনি তার হেরেমের বাছা বাছা মেয়ে এবং গায়িকা-নর্তকীদের রণাঙ্গনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই রূপসী মেয়ে দু'জনও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সাইফুদ্দীন এদেরকে নিষ্পাপ মনে করতেন। কিন্তু বড় মেয়েটি প্রেতাত্মার ন্যায় সাইফুদ্দীনের শিরায় শিরায় মিশে গিয়েছিলো। হেরেমের অন্যান্য মেয়েদেরকে সে তার দাসী বানিয়ে রেখেছিলো।

সাইফুদ্দীন জঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করে নিয়েছিলো। এক সময় সেখানে মরুঝড় হয়, যার বিবরণ আপনারা উপরে পাঠ করে এসেছেন। এই ঝড়ের মধ্যে ফাওজিয়া নাম্নী এক মেয়ে আপন ভাইয়ের মৃতদেহ ঘোড়ার পিঠে করে সুলতান আইউবীর নিকট পৌছে দিয়েছিলো এবং সংবাদ প্রদান করেছিলো যে, তিনটি বাহিনী একজোট হয়ে তাঁর উপর আক্রমণ করতে এসে পড়েছে।

সুলতান আইউবী দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সাইফুদ্দীনের বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসেন। অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়ে সাইফুদ্দীনের বহু সৈন্য প্রাণ হারায়। এই একতরফা লড়াইয়ে রণাঙ্গন ছিলো সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে। সাইফুদ্দীন তার সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ড সামলাতে ব্যর্থ হন। যখন তার ময়দান ছেড়ে পালাবার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন এই মেয়ে দু'টো তার সঙ্গে ছিলো। খৃস্টানদের কয়েকজন মুসলমান এজেন্ট সাইফুদ্দীনের ফৌজের উচ্চপদে সমাসীন ছিলো। এই মেয়ে দু'টোর সঙ্গে তাদের ভালো যোগাযোগ ছিলো। মেয়েরা তাদেরকে খবরাখবর জানাতো আর তারা সেসব সংবাদ খৃস্টানদের নিকট পৌঁছে দিতো।

তারা যখন দেখলো, যুদ্ধ পরিস্থিতি এমন এক রূপ ধারণ করেছে যে, সম্মিলিত বাহিনীকে পিছপা হওয়া ব্যতীত কোন উপায় নেই, তখনই তারা মেয়ে দু'টোকে ওখান থেকে নিয়ে কেটে পড়ার পরিকল্পনা আঁটে। খৃস্টানদের এই মেয়ে দু'জন খুবই মূল্যবান। সাইফুদ্দীন যুদ্ধের ময়দানে ছুটে বেড়াচ্ছেন। হেরেমের মেয়েরা তার বিশ্রামাগারের একটি তাঁবুতে এসে জড়ো হয়। এই খৃস্টান মেয়ে দু'টো এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের লোকেরা এসে পড়েছে। তাদেরকে দু'টি ঘোড়া দেয়া হলো। ঘোড়ার-জিনের সঙ্গে পানির চারটি মশক ও খাবারের দু'তিনটি থলে বেঁধে দেয়া হলো। খঞ্জরও দেয়া হলো। কিন্তু তাদের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হচ্ছে হাশিশ আর অনুরূপ এমন একটি নেশাকর দ্রব্য, যার কোনো স্বাদ নেই। এই বস্তুটা কাউকে তার অজান্তে পান করানো ...ল সে টেরই পায় না যে, পানি বা শরবতের সঙ্গে তাকে অন্য কিছু পান করানো হয়েছে। এই নেশাকর পদার্থ দু'টো তাদের সঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে কোনো পুরুষের সঙ্গ ছাড়া সফর করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত যদি পথে কারো হাতে পড়ে যায়, তাহলে অজান্তে এসব পান করিয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলবে।

রাতের বেলা। রণাঙ্গনে ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। দু'ব্যক্তি মেয়ে দু'টোকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে ছুটতে শুরু করে। তুর্কমান পেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত লোকগুলো তাদের সঙ্গে যায়। তারপর মেয়েদেরকে পথ বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে আসে। মেয়েদের গন্তব্য অসিয়ানের দুর্গ। বড় মেয়েটি অত্যন্ত বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও সাহসী। ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সে যাত্রা শুরু করে। ভোর নাগাদ তারা সবুজ-শ্যামল অঞ্চল ত্যাগ করে বেশ দূরে চলে যায় এবং উক্ত অঞ্চলের নরক বলে পরিচিত ভূখণ্ডে এসে পৌঁছে। মেয়েদের জানা আছে, এ

স্থানে পৌঁছে তরুলতাহীন পাথুরে পথ অতিক্রম করতে হবে। অঞ্চলটা ভীতিকর এবং উত্তপ্ত চুলোর ন্যায় গরম। সূর্য মাথার উপর উঠে এলে তারা পার্বত্য এলাকায় এসে পৌঁছে। তারা একটি টিলার আড়ালে অবস্থান নিয়ে পানাহার করে বিশ্রাম করতে থাকে। ঐ সময় তারা আন-নাসেরকে তার তিন সঙ্গীসহ আসতে দেখে।

তাদেরকে দেখেই বড় মেয়েটি বুঝে ফেলে, তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কেমন। মেয়েটির তার বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে শুরু করে, যার ফলে আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা তাদেরকে কাল্পনিক বস্তু কিংবা পরী বলে বিশ্বাস করে ফেলে। মেয়েটির প্রতিটি পদক্ষেপই শতভাগ সফল হয়। প্রথমে সে লোকগুলোকে পানি ও কাবাব খাওয়ায়। তারপর হাশিশ এবং অন্য নেশাকর দ্রব্যটি পান করায়। লোকগুলোকে নেশা পান করিয়ে তারা ফুল, সবুজ-শ্যামলিমা, পাখ-পাখালি ও মখমলসম ঘাসের উল্লেখ করেছিলো, তা লোকগুলোর মস্তিষ্কে জান্নাতের কল্পনা জাগ্রত করে দেয়। হাশিশ পান করিয়ে মানুষের মন-মস্তিষ্কে সুদর্শন কল্পনা সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা হাসান ইবনে সাব্বাহর আবিষ্কৃত পদ্ধতি। শত বছর পরে শেখ সান্নান এখন তার স্থলাভিষিক্ত। এই চক্রটিকে এখন হাশিশি কিংবা ফেদায়ী বলা হয়। বড় মেয়েটির এ বিদ্যার প্রশিক্ষণ আছে।

মেয়েটি আন-নাসের ও তার সঙ্গীদেরকে আয়ত্তে নিয়ে একটি লক্ষ্য তো এই অর্জন করতে চাচ্ছিলো যে, লোকগুলো তাদের প্রতি হাত বাড়াবে না কিংবা অপহরণ করে নিয়ে যাবে না। দ্বিতীয়ত, যদি প্রমাণিত হয় যে, এরা সুলতান আইউবীর গুপ্তচর কিংবা কমান্ডো সেনা, তাহলে কৌশলে তাদেরকে নিয়ে শেখ সান্নানের হাতে তুলে দেবে। এদের দ্বারা তার কোনো না কোনো উপকার আসতে পারে। সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে হাররানের স্বাধীন শাসক গোমস্তগীন আসিয়ান দুর্গে শেখ সান্নানের সঙ্গে সাক্ষাতও করে গেছেন।

❖ ❖ ❖

তুর্কমানে মুজাফফর উদ্দীনের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁর সালারদের বললেন– 'এবার যুদ্ধ শেষ হলো।' তিনি মালে গনীমত সংগ্রহ করার নির্দেশ প্রদান করেন। শত্রু বাহিনীর ফেলে যাওয়া বিপুল পরিমাণ সম্পদ। সাইফুদ্দীনের ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করা হলো বিপুল সোনা ও নগদ অর্থ। শত্রু বাহিনীর সৈন্যদের লাশের দেহ থেকেও নগদ অর্থ,

সোনার আংটি ইত্যাদি সম্পদ পাওয়া যায়। অন্যান্য মালপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের কোনো হিসাব ছিলো না। সালাহুদ্দীন আইউবী যুদ্ধের কাজে আসতে পারে এমন সব মালপত্র সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন। একাংশ মালামাল দামেস্ক এবং সেসব এলাকায় গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দেয়ার আদেশ প্রদান করেন, যেগুলো মিশর ও সিরিয়ার সাম্রাজ্যের আওতায় এসে গেছে। অপর এক অংশ মাদ্রাসা নিজামুল মুল্‌ককে প্রদান করেন। ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ লিন পোলের বর্ণনা মতে– সালাহুদ্দীন আইউবী উক্ত মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, ইতিহাসে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সালাহুদ্দীন আইউবী তুর্কমানের গনীমত থেকে নিজে কোনো ভাগ নেননি।

এবার বন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা। বন্দীরা সকলেই মুসলমান। সালাহুদ্দীন আইউবী তাদেরকে একত্রিত করে বললেন– 'তোমরা মুসলমান এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিলে। তোমাদের পরাজয়ের কারণ হচ্ছে, তোমাদের শাসনকর্তা তোমাদের ধর্মের ঘৃণ্যতম শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তার হাত শক্ত করছে। তোমাদের দুনিয়াও নষ্ট হলো, আখেরাতও বরবাদ হলো। এখন তোমাদের সামনে পাপ স্খলনের একমাত্র পথ হচ্ছে, তোমরা ইসলামের সৈনিক হয়ে যাও এবং নিজেদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করো।'

সালাহুদ্দীন আইউবীর এই ভাষণটি ছিলো অত্যন্ত তেজস্বী ও আবেগপ্রবণ। বন্দীদের সমাবেশের মধ্য থেকে শত কণ্ঠে আকাশ কাঁপানো 'নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারিত হতে শুরু করে। তারা সমস্বরে সালাহুদ্দীন আইউবীর আনুগত্যের ঘোষণা দিতে আরম্ভ করে। এভাবে আইউবীর বাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক ও কমান্ডারের সংখ্যা বেড়ে গেলো। তথাপি সুলতান অগ্রযাত্রা মুলতবি রাখেন। বাহিনীর নববিন্যাস আবশ্যক। তিনি দামেস্ক ও কায়রো থেকেও সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। সেখানেই আহতদের চিকিৎসা সেবা চলছে। যুদ্ধে জয়ী হলেও মুজাফফর উদ্দীনের এই আক্রমণ সালাহুদ্দীন আইউবীকে বেশ বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

আসিয়াত দুর্গ ছিলো বর্তমানকার লেবাননের সীমান্ত এলাকায়। মিশরী ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ফরীদ আবূ হাদীদের বর্ণনা মোতাবেক আসিয়াত দুর্গ ছিলো হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ঘাতক চক্র হাশিশিদের কেন্দ্র ও আস্তানা। সেখানে হাসান ইব্‌নে সাব্বাহ'র স্থলাভিষিক্ত শেখ সান্নানের রাজত্ব ছিলো। দুর্গে তার একটি বাহিনীও রাখা ছিলো। দুর্গটা ছিলো বেশ বড়সড়। তার

থেকে দূরে দূরে ছোট আরো তিন-চারটি দুর্গ ছিলো। এই দুর্গগুলোও ছিলো শেখ সান্নানের হাশিশীদের দখলে। খৃস্টানরা তাদেরকে এই দুর্গগুলো দিয়ে রেখেছিলো। খৃস্টানরা এই হাশিশীদের মুসলিম নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা এবং মুসলিম জাতির চরিত্র ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করতো। কিন্তু তাদেরই একটি দল শেষ পর্যন্ত ভাড়াটিয়া খুনী চক্রে পরিণত হয়ে যায়। তারা কতিপয় খৃস্টান নেতৃবর্গকেও হত্যা করেছিলো। বিনিময় পেলেই তারা যে কাউকে খুন করতে প্রস্তুত হয়ে যেতো। সালাহুদ্দীন আইউবীর আমলে খৃস্টানরা তাদেরকে এতো বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে যে, কতগুলো দুর্গ পর্যন্ত তাদেরকে দিয়ে দেয়। তাদের মাধ্যমে খৃস্টানরা সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহুদ্দীন আইউবীকে খুন করাবার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যু সম্পর্কে মেজর জেনারেল আকবর খান কোনো কোনো ঐতিহাসিকের সূত্রে লিখেছেন– এটি ছিলো হাশিশীদের কর্ম। হাশিশীরা তাকে গোপনে কি যেনো খাইয়েছিলো, যার ক্রিয়ায় দিন কয়েক পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তারা এখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামছে। হাশিশীরা খৃস্টানদের হাতে খেলছে।

সকাল বেলা। সূর্য এখনো উদিত হয়নি। আন-নাসের ও তার তিন সঙ্গী খৃস্টান মেয়ে দু'টির সঙ্গে আসিয়াত দুর্গের ফটকের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। বড় মেয়েটি একটি সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করে। ক্ষণিক পর দুর্গের দরজা খুলে যায়। শেখ সান্নান সব বিচারেই রাজা। একজন রাজার সব ক্ষমতাই তার আছে। তার চলন-বলন, ভাবগতি ও শান-শওকত রাজকীয়। লোকটার এই অনুভূতিটুকুও নেই যে, সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। বড় মেয়েটি যখন তাকে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলো এবং সাইফুদ্দীনের শোচনীয় পরাজয়ের বিস্তারিত শোনাচ্ছিলো, তখনো তার লোলুপ দৃষ্টি ছোট মেয়েটির উপর নিবদ্ধ ছিলো।

'এদিকে আসো'– শেখ সান্নান বড় মেয়েটি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে ছোট মেয়েটিকে কাছে ডেকে বললো– 'তুমি প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি রূপসী। তুমি আমার কাছে এসে বসো।' শেখ সান্নান মেয়েটির বাহু ধরে টেনে এনে নিজের গা-ঘেঁষে বসায় এবং তার মাথায় হাত দিয়ে আঙ্গুল দ্বারা চুলে বিলি কাটতে শুরু করে। বললো- 'তুমি অনেক ক্লান্ত। আজ আমার কাছে বিশ্রাম করবে।'

মেয়েটি শেখ সান্নানকে এই প্রথমবারের মতো দেখলো। সে লোকটাকে ঘুরে-ফিরে দেখতে থাকে। একবার তার প্রতি, আবার তার সঙ্গী মেয়েটির

প্রতি তাকাতে থাকে। মুখে তার বিরক্তির ছাপ। যেনো বৃদ্ধের এই আচরণ তার ভালো লাগছে না। মেয়েটি লাফ দিয়ে বৃদ্ধের নিকট থেকে সরে যায়। শেখ সান্নান আবারো মেয়েটির বাহু ধরে টেনে কাছে নিয়ে আসে, যেনো সরে গিয়ে সে তাকে অপমান করেছে। সে বড় মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বললো– 'মেয়েটিকে বোধ হয় আমাদের রীতি শিক্ষা দেয়া হয়নি। আমাদের অপমান করা কতো বড় অপরাধ!'

'আমি আপনার দাসী নই'– ছোট মেয়েটি উত্তেজিত কণ্ঠে বললো– 'এটা আমার কর্তব্য নয় যে, কেউ আমাকে নিয়ে টানা-হেঁছড়া করতে চাইলেই আমি নিজেকে সপে দেবো।' মেয়েটির উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। সে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললো– 'আমি ক্রুশের গোলাম, আমি হাশিশীদের কেনা দাসী নয়।'

বড় মেয়েটি তাকে ধমক দিয়ে চুপ হতে বললো। কিন্তু মেয়েটি চুপ হলো না। বলতে লাগলো– 'এই লোকটি আমাকে মুসলমানদের হেরেমে দেখেনি। আমি দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি করিনি। আমি তোমার সঙ্গে থেকে সাইফুদ্দীন ও তার পরামর্শকদের বিবেক-বুদ্ধির উপর পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছি। তাই বলে এটা আমার দায়িত্ব নয় যে, আমি এই বুড়োর সাথে রাত কাটাবো।'

'তুমি যদি এতো রূপসী না হতে, তাহলে আমি তোমার এই গোস্তাখি ক্ষমা করতাম না'– শেখ সান্নান বললো এবং বড় মেয়েটিকে উপদেশের ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলো– 'একে নিয়ে গিয়ে আসিয়াত দুর্গের আদব-কায়দা শিখিয়ে দাও।'

বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটিকে বাইরে বের করে রেখে পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করে শেখ সান্নানকে বললো– 'আপনার অসন্তুষ্টি যথার্থ। কিন্তু আমরা বসদের অনুমতি ব্যতীত যে কারো আদেশ পালন করতে পারি না। আমি যেহেতু আপনাকে জানি এবং এই দুর্গে আগেও এসেছি, সেজন্য আপনার কাজে আসতে পারে এমন চার ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছি। আপনাকে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। মেয়েটি শেখ সান্নানকে আন-নাসের ও তার সঙ্গীদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে।

'আমি এদের দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করবো'– শেখ সান্নান বললো– 'কিন্তু ঐ মেয়েটাকে আমি অবশ্যই আমার কক্ষে রাখবো।'

'এ বিষয়টা আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন'– বড় মেয়েটি বললো– 'ওতো আর পালাতে পারবে না। আমি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আপনার কাছে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করবো।'

❖ ❖ ❖

শেখ সান্নানের দু'জন সহযোগী আন-নাসের ও তার সঙ্গীদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। লোকগুলো নেশা অবস্থায় ছিলো বটে; কিন্তু সারাটা রাত পায়ে হেঁটে এখানে এসে পৌঁছেছে। তাদেরকে একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। টলটলায়মান পরিশ্রান্ত লোকগুলো ধপাস করে খাটের উপর পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে। ওদিকে মেয়ে দু'টোও রাতে এক মুহূর্ত ঘুমোতে পারেনি। তারাও একটি কক্ষে শুয়ে পড়ে।

দুপুরের পর আন-নাসেরের চোখ খোলে। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে তার সঙ্গীরা এখানো ঘুমিয়ে আছে। সে আশ-পাশটা চেনার চেষ্টা করে। এটি একটি কক্ষ। কক্ষে পালংক আছে। আন-নাসেরের তিন সঙ্গী পালংকের উপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সবুজ-শ্যামলিমা, রং-বেরঙের ফুল, পাখ-পাখালি ও মখমলসম সবুজ ঘাসের কথা মনে পড়ে তার। মেয়েদের কথাও স্মরণে আসে। বিষয়গুলো তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। মরুভূমির সফরের কথা তার বাস্তবের ন্যায় স্মরণ আছে। কিন্তু দু'টো মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলী তার কাছে স্বপ্ন কিংবা কল্পনা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন সে কোথায়? এই প্রশ্ন তাকে বিব্রত ও বিচলিত করতে শুরু করে।

আন-নাসের তার সঙ্গীদের জাগালো না। নিজে বসা থেকে উঠে দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। এটি একটি দুর্গ। সৈনিকরা চলাফেরা করছে দেখতে পায়। এটা কোন্ বাহিনীর দুর্গ? আন-নাসের বিষয়টা কাউকে জিজ্ঞেস করা সমীচীন মনে করলো না। দুর্গটা দুশমনেরও হতে পারে। তাহলে কি আমি সঙ্গীদেরসহ বন্দী হয়েছি? কিন্তু এই কক্ষটা তো কয়েদখানার প্রকোষ্ঠ নয়। আন-নাসের গুপ্তচর ও গেরিলা সৈনিক। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই সে বিষয়টার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো। ধীরে ধীরে সে আশংকা অনুভব করতে লাগলো। এবার দরজা থেকে সরে পালংকের উপর গিয়ে বসলো। বাইরে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেলো। সাথে সাথে সে ঘুমের ভান করে নাক ডাকতে শুরু করলো।

দু'ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করে।

'এখনো ঘুমিয়ে আছে।' একজন অপরজনকে বললো।

'ঘুমিয়েই থাকতে দাও'– দ্বিতীয়জন বললো– 'মনে হচ্ছে, একটু বেশি খাওয়ানো হয়েছে। আচ্ছা, এদের ব্যাপারে কি কিছু বলা হয়েছে?'

'খৃস্টান মেয়ে দু'টি ফাঁদে ফেলে এদেরকে নিয়ে এসেছে'– প্রথমজন উত্তর

দেয়– 'এরা সালাহুদ্দীন আইউবীর কমান্ডো গুপ্তচর। অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। এদেরকে প্রস্তুত করতে হবে।'

তারা চলে যায়।

আন-নাসের বুঝে ফেলে, তারা প্রতারণার শিকার এবং শত্রুর হাতে বন্দী। এবার তাকে জানতে হবে, এটি কোন্ দুর্গ, কোন অঞ্চলে অবস্থিত এবং কী উদ্দেশ্যে তাদেরকে এখানে আনা হয়েছে। তার জানা আছে, কোনো দুর্গ থেকে পলায়ন করা শুধু কঠিনই নয়– অসম্ভব।

ছোট মেয়েটি কিছুক্ষণ ঘুমিয়েই জেগে ওঠে। কক্ষের জানালাটা খুলে জানালার কাছে বসে বাইরের দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটি সফরের সময় বড় মেয়েটির কাছে তার আবেগের কথা প্রকাশ করেছিলো। সবে তরুণী। এখনো পরিপক্ক হয়নি। সমবয়সী অন্য পাঁচটি মেয়ের ন্যায় এখনো সে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এই প্রথমবারের মতো সে ময়দানে এসেছে। সঙ্গের বড় মেয়েটি অভিজ্ঞ। সে অনুভব করছে, ছোট মেয়েটি সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পারছে না। পুরুষদেরকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচানোর যোগ্যতা-মানসিকতা কোনটিই এখনো তার আয়ত্ত্ব হয়নি। বাঘা বাঘা সালার ও সাইফুদ্দীন তাকে খেলনা বানিয়ে রেখেছিলো। এখন সে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে কঠিন ও কষ্টদায়ক সফর করে এসে এখানে পৌঁছেছে। সারা রাত সফর করেছে; অথচ এসে পৌঁছামাত্র শেখ সান্নানের মতো বৃদ্ধের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে এবং তিনি যা বলবেন শুনতে হবে!

একথা সত্য যে, মেয়েটিকে শৈশব থেকেই এই নোংরা জীবনধারার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু যৌবনে পদার্পন করার পর যখন তার চোখ ফোটে এবং নিজের চোখে দেখতে ও নিজের মাথায় ভাবতে শিখে, তখন দীর্ঘ প্রশিক্ষণের ক্রিয়া এলোমেলো হয়ে যায়। যে মানুষগুলোকে ফাঁসিয়ে রাখতে এবং খৃস্টানদের জালে আটকে রাখতে তাকে প্রস্তুত করা হয়েছিলো, তাদের প্রতি তার মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয় এবং নিজের এই পেশাটিকে হীন ভাবতে শুরু করেছে। জানালার কাছে বসে মেয়েটি নানা তিক্ত কল্পনায় ডুবে আছে। তার চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে আসে। কিন্তু সে চোখের সামনে না কোনো আশ্রয় দেখতে পাচ্ছে, না পালাবার পথ পাচ্ছে।

বড় মেয়েটির ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ খুলে দেখতে পায়, তার সঙ্গী ছোট মেয়েটি জানালার কাছে বসে আছে। সেও উঠে তার পাশে গিয়ে বসে। চোখে অশ্রু দেখে বললো– 'প্রথম প্রথম এমনটা হয়ে থাকে। আমরা যা কিছু করছি

বিলাসিতার জন্য করছি না, করছি ক্রুশের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশের রাজত্ব কায়েম করা। আমাদের সৈনিকরা তাদের অঙ্গনে লড়াই করছে। আমাদেরকে আমাদের অঙ্গনে লড়তে হবে। মনটাকে বড় বানাও। দেহের চিন্তা বাদ দাও, আত্মাটা পবিত্র থাকলেই হলো। তোমার আত্মা পবিত্র।'

'আচ্ছা, আমাদের যেভাবে ব্যবহার করা হয়, মুসলিম মেয়েদেরকে সেভাবে ব্যবহার করা হয় না কেন?'– ছোট মেয়েটি জিজ্ঞেস করে– 'আমাদের বাদশাহ এবং তাদের সৈন্যরা মুসলমানদের ন্যায় লড়াই করে না কেনো? মুসলমানদেরকে তারা চোরের ন্যায় খুন করে কেনো? খৃস্টান বাহিনী সালাহুদ্দীন আইউবীর এই চার কমান্ডোর ন্যায় কমান্ডো তৈরি করে না কেনো? তার কারণ একটাই– আমাদের জাতি কাপুরুষ। যারা চুপি চুপি আক্রমণ করে, তারা কাপুরুষ না তো কী?'

ছোট মেয়েটির বক্তব্য ও প্রশ্নবাণে বড় মেয়েটি চমকে ওঠে বললো– 'এমন কথা অন্য কারো সামনে বলবে না। অন্যথায় খুন হয়ে যাবে। এ মুহূর্তে আমরা শেখ সান্নানের কাছে রয়েছি। তার দ্বারা আমাদের অনেক কাজ নিতে হবে। তাকে নারাজ করা যাবে না।'

'লোকটার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেছে'– ছোট মেয়েটি বললো– 'ইনি তো কোন রাষ্ট্রের সম্রাট নন, ভাড়াটিয়া খুনীদের লিডার মাত্র। আমি তাকে আমার দেহ স্পর্শ করার যোগ্য মনে করি না।'

বড় মেয়েটি দীর্ঘ কথোপকথনের পর বড় কষ্টে ছোট মেয়েটিকে সম্মত করতে সক্ষম হয় যে– সে শেখ সান্নানের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলবে ও সদ্ব্যবহার করবে।

সে মেয়েটিকে পরামর্শ দেয়– 'তুমি তাকে প্রলোভন দেখিয়ে সময় পার করে দেবে। তুমি তো আমার কৌশল দেখেছো। আমি মুসলিম রাজাদেরকে মুঠোয় নিয়ে তাদের গোমরা করতে জানি। শেখ সান্নানকে আমি কোন ব্যক্তিত্বই মনে করি না।'

'তুমি কি আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারো?' ছোট মেয়েটি বললো।

'চেষ্টা করবো'– বড় মেয়েটি বললো– 'আগে আমাদের সংবাদ পৌঁছাতে হবে যে, আমরা এখানে আছি।'

এমন সময় দু'জন লোক কক্ষে প্রবেশ করে। তারা মেয়েদেরকে তাদের

নিয়ে আসা লোকগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। লোকগুলো কারা, কোথা থেকে কিভাবে এবং কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে? বড় মেয়েটি তার বিবরণ দেয়।

'তারা কী অবস্থায় আছে?' বড় মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'এখনো ঘুমিয়ে আছে।' একজন জবাব দেয়।

'তাদেরকে কি কারাগারে আটকে রাখবে?' ছোট মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'কারাগারে নিক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই'– লোকটি জবাব দেয়– 'এখান থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়?'

'আমরা কি তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি?' ছোট মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

'অবশ্যই পারবে'– লোকটি জবাব দেয়– 'তারা তোমাদের শিকার। যাও, দেখা করো। তোমরা তাদের কাছে যাও, তাদেরকে তোমাদের জালে আটকে রাখো।'

কিছুক্ষণ পর ছোট মেয়েটি বড় মেয়েটির নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আন-নাসের ও তার সঙ্গীরা যে কক্ষে ঘুমিয়ে আছে, সেখানে চলে যায়। আন-নাসের মূলত সজাগ। মেয়েটিকে দেখে সে উঠে বসে এবং জিজ্ঞেস করে– 'আমাদেরকে কোথায় নিয়ে এসেছো? বলো, তোমরা কারা? তোমাদের মিশন কি? এটা কোন্ জায়গা?'

মেয়েটি গভীর দৃষ্টিতে আন-নাসেরের প্রতি তাকায়। মনটা তার আবেগাপ্লুত। আন-নাসেরকে কানে কানে জিজ্ঞেস করে– 'পালাতে চাও?'

'তোমাকে বলবো না আমি কী করতে চাই'– আন-নাসের জবাব দেয়– 'আমার যা করণীয় করে দেখাবো।'

মেয়েটি আন-নাসেরের আরো কাছে এসে বললো– 'আমি জিন নই, মানুষ। তুমি আমার উপর আস্থা রাখতে পারো।'

আন-নাসের রোষ কষায়িত লোচনে মেয়েটির প্রতি তাকায়। মেয়েটি তার পার্শ্বে পালংকের উপর বসে পড়ে।

[পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত]

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে ফেলে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

ঈমানদীপ্ত দাস্তান